মানবচিত্র।

জীবন-সংগ্রাম, সংসার-চিত্র প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত।

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Printed by J. N. Dey at the
BANI PRESS.
63, Nimtola Ghat Street, Calcutta.
1911.

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা

স্নেহোপহার।

প্রাণের আত্মজ,—হৃদয়ের ধন—স্বর্গের অস্ফুটন্ত—অমূল্য—দুষ্প্রাপ্য—স্বর্গীয় কুসুম, যে কুসুম সংসারে আসিয়া অসময়ে,—অল্প দিনেই শুকাইয়া—ঝরিয়া—স্বর্গীয় বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া—যেখানে শোক, তাপ, জ্বালা ও পীড়ার যাতনা নাই,—অন্তিম সময়ের ভীষণ ভয়াবহ শ্বাস-প্রশ্বাস নাই—সেই পরলোকে কচি কচি হাত—মৃদু মৃদু হাসি লইয়া পুণ্য আত্মা ও পুণ্যবান সূক্ষ্ম-দেহীগণের সঙ্গে ব্রহ্মের আরাধনায় রত আছে—আমার সেই স্নেহের পুত্তলি—নয়নের মণি,—মণিধনের টুকটুকে কোমল হস্তে,—অগাধ অফুরন্ত পিতৃ-স্নেহ মাখাইয়া ভীষণ—শোকাবহ—জ্বালা-ময়ী স্মৃতিচিহ্নরূপে এই পুস্তকখানি পুত্র-শোকাতুর হতভাগ্য পিতা কর্ত্তৃক অর্পিত হইল।

আমার স্বপ্ন

বাবা মণিধন!

তুমি বই বড়ই ভালবাসিতে, পুস্তক হাতে পাইলে শীঘ্র তাহা ছাড়িতে চাহিতে না, তাই আকাশের দিকে চাহিয়া—পরলোকের ছবি মনে মনে কল্পনা করিয়া "মানবচিত্র"খানি তোমার হস্তে তুলিয়া দিতেছি।

জানি না, পরলোক আছে কি না—যদি থাকে, তবে হয় ত আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হইয়া, আবার তোমায় বুকে চাপিয়া ধরিতে পাইব। পরলোক আছে, এই বিশ্বাস ও আশা হৃদয়ে লইয়া শূন্যহৃদয়ে সংসারের অকিঞ্চিৎকর ক্ষণস্থায়ী খেলাঘর গুটাইয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

মণিধন! তুমি যে আমার অগ্রে চলিয়া যাইবে, তাহা স্বপ্নেও কখন মনে করি নাই, তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি, অটুট স্বাস্থ্য এবং বিখ্যাত জ্যোতিষিগণের গণনায় তোমার জন্মকাল হইতে অনেক দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিতে ছিলাম। কে জানে, তোমার কোষ্ঠীর অভাবনীয় সুগ্রহগুলি আমার অদৃষ্টগুণে কুগ্রহরূপ ধারণ করিয়া এই হতভাগ্য

পিতার রোগ, শোক, তাপদগ্ধ জীর্ণ শীর্ণ বক্ষপঞ্জর হইতে ভীষণ কালের সহায়তায় তোমায় ছিন্ন করিয়া লইয়া আমার অসহনীয় শোক ও অশান্তি-অনলে দগ্ধ করিবে।

মণি! যে সময়ে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, সেই ১৩১৫ সালের ২২শে ভাদ্র সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ২৭ মিঃ কি সুখ ও আহ্লাদের সময়। আনন্দকোলাহল ও শঙ্খ-ধ্বনির সহিত আমার হৃদয় কি এক অব্যক্ত আশা ও স্বর্গীয় আনন্দে নৃত্য করিতেছিল। সে আনন্দ লেখনী বা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না—কেহ কখন প্রকাশ করিতে পারে না! যখন তোমার রোগ-শয্যার পার্শ্বে অহোরাত্র আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়াছিলাম, তখনও আমার হৃদয়ে আশা ও আনন্দের তরঙ্গ হেলিয়া দুলিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু কে জানে, এই আশা ও আনন্দ ১৩১৭ সালের ২রা পৌষ শনিবার কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ তিথির রজনী ৯ ঘটিকার সময় এত শীঘ্র—মুহূর্ত্তের মধ্যে চিরতরে শুকাইয়া যাইবে।

জানি না, কি কাল নিউমোনিয়া রোগ তোমায় আক্রমণ করিল! সহরের শ্রেষ্ঠ—অদ্বিতীয়—বিখ্যাত ইংরাজ ও বাঙ্গালি ডাক্তারগণের চিকিৎসা চেষ্টা জানি না কেন ব্যর্থ হইল? আমাদের অজস্র ক্ষমতাতিরিক্ত অর্থ ব্যয়, জানি না, কেন তোমার পীড়ার আক্রমণকে তিল

মাত্রও বাধা দিতে পারিল না। বাবা! এতদিনে বুঝি-লাম,—তুমিই আমায় বুঝাইয়া গেলে যে, মানুষের ক্ষমতা কিছুই নাই! তুমি অহরহঃ আধ আধ ভাষায় আমার কানে কানে বার বার বলিতেছ, মানুষের ক্ষমতা সেই অসীম ক্ষমতার কাছে অতি অকিঞ্চিৎকর।

তোমার সেই নিউমোনিয়ার ঘর্ঘর শ্বাস-প্রশ্বাস প্রতি নিমিষে আমায় যেন শুনাইতেছে, ছার—অতি ছার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের চিকিৎসা! তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ মানুষের চিকিৎসা-গর্ব্ব! যে শক্তিবশে জগৎ চলিতেছে,—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা নিয়মিত কার্য্য করিতেছে, সেই শক্তি-গুণেই মানব জীবিত থাকে, আবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। তোমরা এই অসীম শক্তিকে "নেচার" বলিতে হয় বল, "ভগবান" বলিতে হয় বল, "গড" বলিতে হয় বল, "মা আনন্দময়ী" বলিতে হয়, মুক্তকণ্ঠে বল, "ক্রাইষ্ট", "যোভ", "আল্লা" যাহা বলিতে হয় বল,—এই একটি শক্তির বিরুদ্ধে কাহার সাধ্য আছে, তিলমাত্র কার্য্য করিতে পারে? কেন তবে মানুষ ভণ্ড চিকিৎসক সাজিয়া এই অসীম শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যায়? কেন তবে আমার ন্যায় হতভাগ্যগণ এই শক্তির প্রতি বিশ্বাস না করিয়া অকিঞ্চিৎ-কর, ক্ষুদ্র চিকিৎসা-বিদ্যার গর্ব্বে গর্ব্বিত মানুষের শরণাপন্ন হয়? কেন সেই অসীম শক্তির নিকট মস্তক নত করিয়া

মানুষ বলে না, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক প্রভো!" কেন তবে মানুষ ভক্তি অশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া বলে না, "যিনি জীবন দিয়াছেন, তিনিই রাখিতে পারেন," মানুষের জীবন দিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং জীবন রক্ষা করিবার একান্ত ক্ষমতাভাব!

মণি! তুমি যোগভ্রষ্ট হইয়া আমাদের গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলে! শিশুকালে সেরূপ জ্ঞান, সুখ, শান্তি ও হর্ষ প্রকৃতই মানবশিশুতে বিরল! তুমি যখন যেটি লইতে "বা'য়না" করিয়াছ, অজস্র অর্থ আমাদের হাতে আসিয়াছে, অলক্ষিতে তোমার সকল সাধ কে যেন পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। তোমার জন্মমাত্রে আমাদের অর্থলাভ এবং তোমার সূতিকা-গৃহে ষষ্ঠী পূজার দিন অর্থাগমেই বুঝিয়াছিলাম, তোমার প্রতি ভগবানের কি করুণামাখা দৃষ্টি!

তুমি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আমায় নূতন পথ দেখাইয়া গিয়াছ! পুত্র হইয়া পিতার মহৎ কার্য্য সাধন সুপুত্র ব্যতীত কে করিতে পারে? তোমাকে হারাইয়া আমি পাগলের ন্যায় ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়াছিলাম,—হৃদয়ের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ভাবিলাম, এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না! আত্মঘাতী হইয়া এ যন্ত্রণার অবসান করি! আত্মহত্যা মহাপাপ, সে কার্য্যেও অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি

হইল না! অহরহঃ হৃদয়ের যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে লাগিলাম। এমন সময় তুমি যেন আমায় সেই স্বর্গীয়ভাবে মৃদু মৃদু হাসিয়া আধ আধ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলে,—

"বাবা! তুমি কি আমায় ভালবাসার মত হৃদয় দিয়া ভালবাসিতে?"

আমি বলিলাম, "বাবা মণি! কি করিয়া জানাইব তোমাকে কত ভালবাসি? জগতে এমন কেহ নাই যে, পুত্রস্নেহের গভীরত্বের তুলনা করিতে পারে! এই স্নেহ-ভালবাসার গভীরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জনকেরও ক্ষমতা-ভাব! সমুদ্র যেরূপ অতল সমুদ্রবারি বক্ষে অহরহঃ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু জানে না, কত অগাধ জলরাশি সে বুকে ধারণ করিয়া আছে;—পুত্রের পিতাও তদ্রূপ পুত্র-স্নেহের গভীরত্ব তুলনা করিতে পারে না! সে সেই স্নেহসমুদ্রের দিকে যতই চাহিয়া থাকে, দেখে, কেবল সীমাহীন, অতল অনন্ত স্নেহবারি! আমরা ভাবিতে পারি না—এ ভালবাসার সীমা কোথায়,—পরিণাম কি? আমাদের সীমাহীন ভালবাসা ও স্নেহে তোমাকে অহরহঃ ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার সেই কমনীয় মুখখানির মৃদু মৃদু স্বর্গীয় হাসিরাশি দেখিয়া ভাবিতাম, আমরা স্বর্গের আনন্দরাশির মধ্যে ডুবিয়া আছি। কে জানিত যে, এই আনন্দের

অবসাদে এত শীঘ্র অশান্তির অনল-শিখায় আমাদিগকে অহরহঃ দগ্ধ হইতে হইবে ?"

মণি যেন আমায় কাঁদ কাঁদ ভাবে সেই হাসিমাখা মুখটি মলিন করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল,—

"বাবা ! এতই যদি ভালবাসিতে তবে আত্মা ত্যাগ করিয়া যাইবার পর দেহটা শ্মশানে ভস্ম করিতে দিলে কেন ?"

প্রশ্ন শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম ! আমার যেন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল ! ভাবিলাম, সত্যই ত ! আমি কি মণিকে ভালবাসিতাম,—না—মণির আত্মাকে ভাল-বাসিতাম ? যদি মণিকে ভালবাসি, তবে তাহার সেই কচি কচি হস্তপদ, সেই হাসিমাখা মুখ, সেই ভ্রমরকৃষ্ণ সুন্দর কেশ, সেই কমনীয় দেহের সকলই ত ছিল, তবে তাহাকে শ্মশানে ভস্ম করিতে গেলাম কেন ? ভগবানের অংশ আত্মা না থাকায় মণির বাক্‌শক্তি ছিল না, ইহা ব্যতীত মণির হস্ত, পদ, নাসিকা, জিহ্বা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলই ত ছিল। ইহাই এখন স্থির বুঝিলাম যে, মণির সেই কমনীয় দেহটাকে ভালবাসিতাম না ! ভালবাসি-তাম, তাহার সেই আত্মাকে ! আত্মা অভাবেই মণির জন্য এই শোক-যন্ত্রণা ! এইবার ভাবিলাম, আত্মার বিনাশ নাই, তবে মণির জন্য শোক দুঃখ কি ?

মণি আবার একদিন আমাকে নূতন চিন্তা-স্রোতে ভাসাইয়া দিল। মণির জন্ম হইতে এমনই আসক্তি ও মোহ-বন্ধনে জড়াইয়াছিলাম যে, ভাবি নাই, সংসারে কোন্ জিনিষটা সত্য, কোন্‌টাই বা মিথ্যা? ভাবি নাই—কোন্‌টা নিত্য পদার্থ, কোন্‌টাই বা অনিত্য! ভাবি নাই—জীবনের কর্ত্তব্য কি, ভাবি নাই—আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, আবার কোথায় যাইব? মণির জন্ম হইতে কেবল অর্থ ও পুত্র-পরিজন লইয়া এমনই আসক্তিতে মজিয়াছিলাম যে, অন্য চিন্তা করিবার অবসর পাই নাই। ইহকাল, পরকাল, ধর্ম্ম, ভগবান সকলই বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল। মণি এক দিন যেন আমার কানে কানে বলিয়া গেল,—

"বাবা! কেন আমার জন্য শোকে অধীর হইতেছেন? শোক দুঃখ করিবার কিছুই নাই! ধ্বংস সকলেরই আছে। আমার দেহের ধ্বংস যে দিন হউক একদিন হইত। জগতে যাহা কিছু দেখিতেছেন, পলে পলে রূপান্তরিত হইতেছে,—সেই এক শক্তির বলে আমিও রূপান্তরিত হইয়াছি। জগতের একটি ধূলিকণা হইতে উচ্চ বৃহৎ জীব জন্তু, নদ নদী, তড়াগ পলে পলে সকলেরই রূপান্তরিত হইতেছে, ও হইবে। মানুষ কেন আসে, কেন যায়,—জগতে কোন্ অজানিত শক্তির বলে

নিত্য এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, যদি বুঝিয়া শোক দুঃখের পরিবর্ত্তে অপার আনন্দলাভ করিতে চান্, ব্যাকুলহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে সেই সত্য সনাতন পরম ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করুন।"

এই দিন হইতে কে যেন আমায় এক নূতন মনোরম চিন্তারাজ্যে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সমস্ত দিবা প্রাণানন্দকর নূতন চিন্তায় অতিবাহিত হইল। মণির সেই ১৩১৫ সালের ২২শে ভাদ্র সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ২৭ মিনিটে জন্ম, ১৩১৭ সালের ২রা পৌষ রাত্রি ৯ ঘটিকায় মৃত্যুর কথা লইয়া আবার নূতন চিন্তায় উপনীত হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, মণির জন্মের জন্য আমি কখন ভগবানের নিকট ভুলিয়াও প্রার্থনা করি নাই, অন্য পক্ষে মণিকে বাঁচাইবার জন্য ভগবানের চরণে মাথা কুটিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। ভগবান কেন মণিকে পাঠাইয়াছিলেন, আবার আমাদের এত কাতর ক্রন্দনেও তিনি মণিকে রাখিলেন না কেন? এই চিন্তায় অধীর হইয়া গভীর রজনীতে শয্যাগ্রহণ করিলাম। কে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিবে? প্রশ্নের কোনই মীমাংসা করিতে না পারিয়া শয্যায় ছটফট্ করিতে লাগিলাম। ব্যাকুলতাপূর্ণ হৃদয় হইতে বার বার প্রশ্ন উঠিতে লাগিল,—"ভগবান মণিকে কেন দিয়াছিলেন?—আবার কেনই বা লইলেন?"

চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে এই প্রশ্নের ঘাত-প্রতিঘাতে আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

নিদ্রাঘোরে এক অচিন্তিত অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলাম। শরীর কণ্টকিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। স্বপ্নে দেখিলাম, এক দিব্যকান্তি সুপুরুষ আত্মজ মণির কচি কচি হাত দুটি ধরিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সেই মহাপুরুষের রূপের বর্ণনা লেখনী-সাহায্যে হইতে পারে না! বাক্যও তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতে সম্পূর্ণ অসক্ত! মহাপুরুষের সেই দিব্যকান্তি দেহ এতসূক্ষ্ম যে, তাঁহার অগম্যস্থান এই ত্রিভুবনে কোথাও নাই! দেখিয়াই বোধ হয় যে, তিনি অগাধ—অনন্ত জলধীতলে, সাগরের উর্ম্মিমালায়, ধূলিকণার ন্যায় বায়ুর সহিত আকাশে, গিরিরাজের শীর্ষচূড়ায়, অনল ও অনিলে, পাপী তাপীর হৃদয় মাঝারে, পুষ্পরেণুর অভ্যন্তরে, গিরিগুহা মধ্যস্থ তপস্বীর তপভূমিতে, জরায়ু মধ্যস্থ ভ্রূণের রক্তকণিকার মধ্যে, বিজন অরণ্যবাসী ঋষিগণের হোমাগ্নির মাঝে, লতা ও ফল ফুলের অভ্যন্তরে, চক্ষের নিমিষে তিনি সর্ব্বস্থানে বিচরণ করিতে পারেন। সেই বিরাট বপু সূক্ষ্মদেহীকে দেখিলেই মনে হয়, জগতে তাঁহার অগম্য বা অজ্ঞেয় কিছুই নাই! তিনি যে কে,—মানব কি দেবতা, সন্ন্যাসী কি যোগী, অথবা পরলোকের সূক্ষ্মদেহধারী আত্মা কি না, অজ্ঞানান্ধ ক্ষুদ্র মানব আমি

কি করিয়া বুঝিব? তিনি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র—অতি সূক্ষ্ম—আবার মনে হইতেছে, তিনি এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড যেন নখাগ্রে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি ফলে, ফুলে, মূলে, পুষ্পের নির্য্যাসে রহিয়াছেন—আবার একই ক্ষণে,—একই সময়ে এই অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। আবার তখনই মনে হইতেছে, অণু পরমাণুতে ও আমার হৃদয়ে এবং সর্ব্বজীবের আত্মায় তিনি বিরাজমান! যে চিন্তা ও প্রশ্ন লইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলাম, মহাপুরুষকে দেখিয়া সেই চিন্তা ও প্রশ্ন মনোমধ্যে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল,—

"ভগবান, "মণি"ধনকে কেন দিয়াছিলেন, আবার কেনই বা হৃদয় হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া বক্ষপঞ্জর ভগ্ন করিয়া দিলেন? জগতের সর্ব্বত্র সকল সংসারেই এইরূপ ভীষণ শোকাবহ ব্যাপার দেখিতে পাই! জগতে কেন এই বৈষম্যভাব?"

এই চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র সেই মহাপুরুষকে আর দেখিতে পাইলাম না! দেখিলাম,—সেই মহাপুরুষের অভাবে মণির টুক্‌টুকে হাসিমাখা ওষ্ঠ দুটি বিবর্ণ ভাব ধারণ করিয়াছে! আনন্দভরা, নির্ম্মল চক্ষু দুটি জলভারাক্রান্ত! মণি কাঁদকাঁদমুখে, আধ আধ ভাষায় বলিতে লাগিল,—

"বাবা! ভগবান আমাকে কেন দিয়াছিলেন, আবার কেনই বা লইলেন?" এই প্রশ্নের উত্তর মানুষের নিকট পাইবেন না! যদি এরূপ প্রশ্নের উত্তর মানবের নিকট শুনিবার আশা করিয়া থাকেন, সে উত্তর নিশ্চয়ই ভ্রমপূর্ণ। আপনিও বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, বিদ্যাভিমানী, থিওসফিষ্ট, শাস্ত্রব্যবসায়ী, সন্ন্যাসী, যোগী, ব্রহ্মচারী, স্বধর্ম্মী ও বিধর্ম্মী পণ্ডিতদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহাতে কি ফল হইয়াছে? আপনি শান্তিলাভ করিতে পারিয়াছেন কি? কেহ বলিয়াছেন, মানুষ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, আবার ইহ-জন্মের কর্ম্মফল সঙ্গে করিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করে। এই কর্ম্মফল অনুসারে দেহী স্বয়ং এবং তাহার পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ইহাঁদের মত এই যে, কর্ম্মফলের সমতা অনুসারে ভাই, ভগ্নী ও পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের নিকট মানুষ জন্মগ্রহণ করে, কারণ তাহাদের ভাগ্য বা কর্ম্মফল সকলেরই সমান। ইহাদের আবার কাহার মত—মানুষ নীচ হইতে উচ্চকুলে, আবার উচ্চ হইতে নীচ-কুলে কর্ম্মফল অনুসারে জন্মগ্রহণ করে। কোটী কোটী জন্ম মানুষ এই প্রকারে ঘুরিতেছে। ইহারা এরূপ বলেন না যে, মানুষ এইরূপে চিরকাল জন্ম হইতে মরণ এবং

মরণ হইতে জন্মকে আলিঙ্গন করিয়া কেবল ঘুরিয়াই মরিবে। তাঁহারা বলেন, একদিন না একদিন মানুষ সত্য পথ দেখিতে পাইবে, তাঁহাদের পূর্ণ বিবেক জ্ঞানের উদয় হইবে এবং পরম ব্রহ্মের দর্শন লাভ ঘটিবে।

আর এক শ্রেণীর জ্ঞানিগণ বলেন, মানুষ মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া "পরলোক" বা ভিন্ন জগতে গমন করে। এই সূক্ষ্ম দেহীদের কর্ম্মানুসারে শ্রেণী বিভাগ আছে। মোটামুটি ইহাই বুঝিতে হয় যে, যেরূপ মনোভাব লইয়া সংসারে জীবিত ছিল,—অথবা জীবনে যে যেরূপ কার্য্য করিয়া গিয়াছে, পরলোকেও তাহারা তদ্রূপ মনোভাব লইয়া বিচরণ করে! জীবিতকালে যাহার যেরূপ কামনা ছিল, পরলোকেও সে সেই সমস্ত কামনাকে ত্যাগ করিতে পারে না। যাহারা সংসারে সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছে, আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য বোধে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, পরলোকে তাহারা তদ্রূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করে। এই সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর সূক্ষ্মদেহীগণ নিম্ন শ্রেণীর সূক্ষ্মদেহী-দিগকে ভাল করিবার জন্য সতত চেষ্টা করিয়া থাকেন। সকলকেই প্রেমভক্তি শিক্ষা দিয়া পরমব্রহ্মের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। ইহারা জগৎবাসী জীবকেও সতত নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হন। ইহাঁ-

দের পরলোকের কার্য্য ঈশ্বরাধনা ও পরোপকার। ইহাঁরা আরও বলেন যে, জীব সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়াও সু বা কু মনোভাবের জন্য তদ্রূপ কার্য্য করিয়া পরলোকেও সুখ বা কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পায় না। অসৎ কামনা পরলোকেও তাহাদের মনে উদিত হইয়া এই কামনার বস্তু ভোগ করিবার জন্য তাহারা অশেষ যন্ত্রণা পাইয়া থাকে। পাপীর সূক্ষ্ম শরীর ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয় কিন্তু সম্মুখে মনোরম ও উপাদেয় খাদ্য বস্তু দেখিতে পাইয়াও তাহারা আহার করিতে পারে না। যাহারা চিরজীবন ধর্ম্ম-বিগর্হিত ইন্দ্রিয়-সেবায় রত ছিল, এবং রূপসী রমণীদের জন্য যাহারা সর্ব্বক্ষণ কুকামনা হৃদয়ে পোষণ করিত, তাহাদেরও পরলোকে এইরূপ ভয়াবহ যন্ত্রণা হইয়া থাকে। কামনার বস্তু সম্মুখে পাইয়াও তাহারা অব্যক্ত যাতনা ভোগ করিতে থাকে এবং পরিত্রাহী রবে চিৎকার করে। এই যাতনার তীব্রতা ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারে না অথবা কল্পনা করিতে যাওয়া আরও কঠিন!

এইরূপ আরও কত জন জন্ম, মরণ ও কর্ম্মফল সম্বন্ধে কত প্রকার কথা বলিয়াছেন। নানাশাস্ত্রের নানাবিধ মত দেখিয়া এবং পণ্ডিতগণের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিয়া "কোন্ পথ অবলম্বন করিব" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কতলোক

ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র কয়টা গণা দিন অতিবাহিত করিয়া ফেলিয়াছে। জীবনের প্রকৃত কার্য্য তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই। সত্য কি, ইহা কেহই বুঝিতে বা জানিতে পারে না—অথবা জানিবার মানবের ক্ষমতা নাই। জন্ম, মৃত্যু, পরলোক প্রভৃতি জটীল ও কঠিন বিষয়গুলি জানিবার ও বুঝিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া ক্ষুদ্র মানবের নিকট অভিহিত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজের কার্য্য কি হইতেছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। কারণ মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধি কতটুকু? সেই অসীম জ্ঞানবিশিষ্ট ব্রহ্মের কণিকা মাত্র জ্ঞানরশ্মি মানবমণ্ডলী লাভ করিয়াই মানব নিজেকেই ধন্য মনে করিতেছে।

যাঁহাকে জানিলে, যাঁহাকে দেখিলে, যাঁহাকে পাইলে মানব সকলই পাইতে পারে, তাহাই শ্রেষ্ঠপথ। যিনি জন্ম, মৃত্যু, ইহলোক, পরোলোক সৃজন করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই জন্ম-মৃত্যু-রহস্য মানব-চক্ষের উপর দেখিতে পাইয়া আত্মহারা হইবে! ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া মানব যখন অন্নের সম্মুখে আহার করিবার জন্য উপবেশন করে, তখন যদি মানুষ অন্নের থাল সম্মুখে রাখিয়া চিন্তা করিতে বসে, "কি চাউলের অন্ন," "কিরূপে জল, চাউল ও অগ্নির সহযোগে অন্ন প্রস্তুত হইল",

"ব্যঞ্জনগুলিতে কি কি উপাদান আছে", "কোন্ দ্রব্যে শরীরের কোন্ কোন ক্ষয় অংশের পূরণ হইবে" তাহা হইলে কি তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে? হইতে পারে তিনি জ্ঞানী ও অনুসন্ধিৎসু কিন্তু তাঁহার ক্ষুধা ও অশান্তির যন্ত্রণায় সমস্ত চেষ্টাই পণ্ড হইয়া যাইবে। তাঁহাকে সময়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেই হইবে, বৃথা তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গিয়া ক্ষুধার যাতনায় অশান্তি-অনলে দগ্ধ হইয়া মরিলাম। কিছুই জানিবার আবশ্যক নাই, পরম ব্রহ্মের উপাসনায় রত হউন,—"কেন তিনি আমাকে পাঠাইয়াছিলেন, আবার কেন লইলেন?" এই রহস্য স্পষ্ট ভাবে চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে! ভগবানের সৃষ্টি ও জন্ম-মৃত্যু-রহস্য অবগত হইয়া বিমল আনন্দে হৃদয় উথলিয়া নৃত্য করিতে থাকিবে! নীরস কর্কশ জ্ঞানীদের জন্ম, মৃত্যু ও পরকালের কথা শ্রবণ করিতে আর ইচ্ছা হইবে না!

ঠিক এইরূপ সময়ে প্রেমভক্তি-পরিপূরিত অমিয়মাখা সুরে স্বর্গের দুন্দুভিধ্বনির সহিত স্বর মিশাইয়া কে যেন গাহিতে লাগিল—

"বল দেখি ভাই, কি হয় মলে এই বাদানুবাদ—"

মণির মুখকমল-নিঃসৃত আধ আধ ভাষায় অমিয়-মাখা ভগবৎ বিশ্বাসের কথাগুলি শুনিয়া হৃদয় আনন্দে

উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর—সাধক যোগী মা আনন্দময়ীর ভক্ত সন্তান রামপ্রসাদের "জীবনের পর পারের" সঙ্গীতধ্বনি হৃদয়ের স্তরে স্তরে ঝঙ্কার দিয়া কোন অজানিত শান্তিময় রাজ্যে আমাকে যেন ভাসাইয়া লইয়া গেল! আহা, সে কি শান্তি—কি আরাম! কল্পনা করিতেও হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে!

বহুক্ষণ আমি বিভোর হইয়া রহিলাম। আমার হৃদয়ের ধন মণি আমার এই আনন্দ ও শান্তিপূর্ণ ভাব দেখিয়া এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বুঝি এইবার পলাইয়া যায়। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "মণি! আর তোমায় ছাড়িব না, যখন দেখা পাইয়াছি, আর কাহার সাধ্য, আমার বক্ষঃস্থল হইতে তোমায় কাড়িয়া লয়?"

মণি আবার সেই স্বর্গীয় ভাবে মৃদু মৃদু হাসিয়া কাছে দাঁড়াইল। বলিল,—"বাবা! বৃথা চেষ্টা! মানুষের সাধ্য নাই যে, আমাদিগকে এখন ধরিয়া রাখে। আমাকে আর কোথায় পাইবেন?"

আমি বলিলাম, "কেন, বৃথা চেষ্টা কেন মণি? মানুষ চেষ্টা করিলে কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে না?"

"অসাধ্য কেন, যাহা সাধ্য তাহাও করিতে পারে

না—যদি সেই অনন্ত শক্তি সাহায্য না করে? এই যে আমাকে বাঁচাইবার জন্য এত চেষ্টা করিলেন, কৈ, জীবনটা ত দেহের মধ্যে রাখিতে পারিলেন না? এত চেষ্টা ও সতর্কতাতেও সকলের অলক্ষিতে জীবন বাহির হইয়া গেল! মণির সব ফুরাইল। কেবল দেহটী পড়িয়া রহিল! মানুষ যদি মানুষকে বাঁচাইতে পারিত, তবে মানুষের চেষ্টা ও সামর্থ্য সেই অনন্ত শক্তির বাহিরে বলিয়া স্বীকার করিতাম।"

"তবে কি মানুষের চেষ্টায় কিছুই হয় না?"

মানুষ কি জানে এবং কি লইয়া চেষ্টা করিবে? সেই অনন্ত শক্তি ছাড়া জগতে আর কি আছে? মানুষ ক্ষুদ্র বিজ্ঞানের গর্ব্ব করে, বিজ্ঞান যে সেই অনন্ত শক্তির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বালুকাকণার লক্ষাংশের এক অংশও নহে। যদি সেই শক্তি না থাকিত, তবে মানুষ একটি অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে পারিত না! যদি পলকের জন্য সর্ব্বশক্তিমান একটি বালুকাকণার লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী অংশের ক্ষমতাটুকু হরণ করিয়া লন, কল্পনা করিয়া দেখুন, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কি অবস্থা হইবে? শুধু মানবের ক্ষুদ্র বিজ্ঞান নহে, মানব নাম লুপ্ত হইয়া যাইবে, চন্দ্র, সূর্য্য আকাশ ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে! অন্ধকার ও আলোক জগৎ হইতে লুপ্ত হইবে! জগতটা কি অবস্থায় উপনীত,

হইবে, তাহা ক্ষুদ্র মানবের কল্পনারও অতীত! ছার বিজ্ঞান,—ছার মানব-বুদ্ধি,—ছার মানবের ক্ষমতা গর্ব্ব! একটি দূর্ব্বাদলের মূলদেশে কি শক্তি নিহিত আছে, কি বস্তু হইতে দূর্ব্বাদলটী উৎপন্ন, সহস্র বৎসর কেন—লক্ষ লক্ষ বৎসর—চেষ্টা করিলেও মানুষ বুঝিতে পারিবে না, তখন আর মানব ক্ষুদ্র বিজ্ঞানের কি গর্ব্ব করিবে? সেই অনন্ত শক্তি মানব-দেহে যতটুকু আছে, ততটুকু লইয়াই মানব নাড়াচাড়া করিতেছে, তাহার অধিক শক্তি মানব কোথায় পাইবে? পীড়িত মানবকে মৃত্যু-স্রোত হইতে ফিরাইবার জন্য চিকিৎসকরূপী মানব ঔষধ লইয়া নাড়াচাড়া করে! মৃত্যুরূপী কাল ভ্রূকুটি করিয়া হাসিতে থাকে! অহংজ্ঞানে আত্মহারা চিকিৎসক নানা ভঙ্গিতে হস্ত পদ সঞ্চালন করিতে থাকে! ভাবে না, সেই ক্ষুদ্র শক্তি কোন্ অনন্ত শক্তি হইতে সে লাভ করিয়াছে? তাহার ক্ষুদ্র শক্তির সাধ্য কি যে, মানব-জীবন ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান চেষ্টায় সে রক্ষা করিতে পারে? চিকিৎসকের মানব-জীবন রক্ষা করা বা পীড়া-রোগ্য করা দূরের কথা, সেই অনন্ত শক্তি সাহায্য না করিলে চিকিৎসকের একটু হস্ত কম্পিত করিবারও শক্তি থাকিবে না,—চক্ষের পলক পড়িবে না,—তাঁহার ক্ষুদ্র বিবেচনা-শক্তি তিরোহিত হইয়া যাইবে। কিন্তু—

শ্রেষ্ঠ—জ্ঞানাভিমানী চিকিৎসক একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্বাসপ্রশ্বাস যখন ঘন ঘন প্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখন মৃত্যুরূপ অমৃত আনিয়া দিয়া কোন্ শক্তি তোমাকে ভীষণ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবে? মণির বাক্যরোধ হইয়া গেল। বিকট মুখ-ভঙ্গিতে মুখ গহ্বর হইতে জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল। "জল জল" শব্দ করিতে লাগিল। হায়! এ যে মণির সেই মৃত্যু-যন্ত্রণা! মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই অন্তিম শ্বাস! মুখে জল দিলাম। মণি আমার চক্ষু মুদিয়া রহিল। মণি বলিত, "আমার ছব", আজ মণির সঙ্গে আমারও সব সুখ শান্তি ফুরাইয়া গেল! সহধর্ম্মিণী চীৎকার করিয়া আসিয়া তাহার নাড়ী-ছেঁড়া ধন মণির বক্ষঃস্থলে আঁছাড় খাইয়া পড়িল। মণির জগতের মধ্যে একমাত্র প্রিয় কাকা চীৎকার করিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল! মণির সেই অন্তিম সময়ের শেষ দৃশ্য স্বপ্নে সজীববৎ দৃষ্ট করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। চীৎকারে নিদ্রা দূরে পলাইল। নিদ্রাভঙ্গে দেখি, আমি শয্যার উপর শয়ন করিয়া আছি, অশ্রুবারিতে আমার উপাধান ও বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম যে, আমি নিদ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। ভাবিলাম, সব স্বপ্ন! সংসার স্বপ্ন! জীবন স্বপ্ন! মৃত্যু স্বপ্ন! সন্তান

স্বপ্ন! তুমি আমি সব স্বপ্ন! নিদ্রার ঘোর কাটিলেই বুঝিব, এই জগতে যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই স্বপ্ন! সত্য কেবল সেই পরম ব্রহ্ম। মানব এই স্বপ্নরাজ্য ত্যাগ করিয়া জাগ্রত সত্যরাজ্যে যাইবার কবে চেষ্টা করিবে? সেখানে স্বপ্ন নাই—সব সত্য! পরম ব্রহ্মের শীতল আশ্রয়ে চল ভাই প্রাণারাম শান্তিতে বাস করি। হায়! কবে আমরা সেই সত্য রাজ্যে যাইবার জন্য এই স্বপ্ন-রাজ্যের যাবতীয় আসক্তি কমাইতে পারিব? কবে আমরা বুঝিব যে, এই জগৎ সংসার প্রকৃতই একটি প্রকাণ্ড স্বপ্নরাজ্য!

গ্রন্থকার।

মানব-চিত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দেই কাটিয়া গেল। এতটা সুখ বাল্যজীবনে বোধ হয় অনেকের ভাগ্যেই ঘটে নাই। পিতৃদেব যদিও সঙ্গতিশালী লোক ছিলেন না, তত্রাচ আমার সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য ব্যয় করিতে তিনি কখন কুণ্ঠিত হইতেন না। পুত্রের প্রতি পিতা-মাতার এরূপ অত্যধিক স্নেহ, যত্ন, সংসারে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলের পিতা-মাতাই প্রাণাধিক পুত্রকে হৃদয়ের স্নেহ-যত্নে লালন-পালন করে, কিন্তু আমার জনক-জননীর এই স্নেহের পশ্চাতে এক আশঙ্কা বিদ্যমান থাকায়, সর্ব্বক্ষণ স্নেহধারায় আমাকে ডুবাইয়া রাখিতেন। আমি ভূমিষ্ঠ হইলে পিতা-মাতার আশঙ্কা এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, সাত কুড়া কড়ির বিনিময়ে ধাত্রী মাতার ক্রোড় হইতে আমাকে কিনিয়া লইয়া সূতিকা-গৃহেই আমার নাম রাখিলেন,

"সাতকড়ি।" সূতিকা-গৃহ হইতেই আমি সাতকড়ি বা সাতু নামে সকলের নিকট পরিচিত হইয়া জনক-জননীর অত্যধিক স্নেহ-যত্নে, দিন দিন শশীকলার ন্যায় বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলাম।

আমার প্রতি জনক-জননীর এতটা সতর্ক-দৃষ্টি, স্নেহাধিক্য এবং আশঙ্কার বিশেষ কারণ ছিল। আমার জন্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে পিতা-মাতার আর একটি সন্তান জন্ম-গ্রহণ করে। সেই সন্তানরত্নটি কয়েক মাসমাত্র জীবিত থাকিয়াই জনক-জননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। দুই তিন বৎসরের মধ্যে আর সন্তানাদি না হওয়ায়, জনক-জননী বিশেষ জননী-দেবী সর্ব্বক্ষণ ম্রিয়মানা হইয়া থাকিতেন; পুনর্ব্বার সন্তানের মুখ-দর্শনের জন্য দিন দিন এতই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন যে, সন্ন্যাসী, ফকির, জড়ি, মাদুলী এবং দৈবকার্য্যে মাতাঠাকুরাণী জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া, ক্রমশঃ আমার পিতৃদেব এই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

পিতৃদেবের বার বার নিষেধ সত্ত্বেও জননী পুত্র-মুখ দর্শনের প্রবল আশা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কখন পিতৃদেবকে মিনতি করিয়া, বুঝাইয়া, কখন পিতৃদেবের অজ্ঞাতে জননী পূর্ব্বের ন্যায়ই অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন।

পিতৃদেব যেন এই সব ব্যাপার দেখিয়াও দেখেন না, এই ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। একদিন এক রোজা আসিয়া আমাদের গৃহে উপস্থিত হইল। শীঘ্রই মাতাঠাকুরাণীর ক্রোড়ে পুত্ররত্ন শোভা পাইবে, এইরূপ দৃঢ়তার সহিত আশা দিয়া রোজা মাতাঠাকুরাণীর নিকট আশার অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিল। রোজা মহাশয় যে অতি-দুর্ল্লভ মূল্যবান ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন, তাহার অনুপান অর্দ্ধছটাক "কাঁচা ওলের রস।" মাতাঠাকুরাণী একদিন এই অনুপান সহ ঔষধ সেবন করিয়া যন্ত্রণায় মৃতার ন্যায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পিতৃদেব জননীর দুরাবস্থা দেখিয়া এরূপ ভণ্ড ওঝা সন্ন্যাসী আমাদের গৃহে যাহাতে আর না আসে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

জননীর দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুজলের মধ্য দিয়া আরও কয়েক মাস অতীত হইয়া গেল। পিতৃদেবও যে শান্তিতে ছিলেন না, তাঁহার বিষাদমাখা মুখচ্ছবি দেখিলেই বুঝা যাইত। শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, শিবপূজা, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ—কিছুতেই কিছু হইল না, এখন কেবল তিনি জননীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে নীরবে তপ্ত শ্বাস মিশাইয়া বিমনা হইয়া থাকিতেন।

একদিন জননী ব্যাকুল-চিত্তে পিতৃদেবকে অনুরোধ করিলেন, "সালেপুর পঞ্চানন্দের" মানস করিয়া অনেকেই

পুত্রমুখ দর্শন করিয়াছেন শুনিয়াছি; আমিও একবার শেষ চেষ্টা—তাঁহার মানস করিয়া দেখি, আপনি অনুমতি করুন।" পিতৃদেব আমার জননীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কোন আপত্তি করিলেন না।

কিসে কি হইল জানি না, সালেপুরের পঞ্চানন্দের মানস করিবার কিছুদিন পরেই আমার—শ্রীমান্ সাতকড়ি শর্ম্মার জন্মগ্রহণ হইল। জননী পুত্র-মুখ দর্শনের জন্য কতটা ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহার "মানসের" কথা শুনিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন। জননীর মানসের কথায় অনেকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে। জননী সালে-পুরের পঞ্চানন্দের নিকট মানস করিয়াছিলেন, "বাবা পঞ্চানন্দের কৃপায় যদি সন্তান হইয়া জীবিত থাকে, তবে তাহার পঞ্চম বর্ষ বয়সের সময়ে বাবাকে ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া একবিংশতিবার বক্ষের রক্তধারা দান করিব।" জননী যথাসময়ে অর্থাৎ আমি পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলে, একবিংশতিবার বক্ষের রক্তধারা দান করিয়া পঞ্চানন্দের মানসিক শোধ করিয়াছিলেন। মানসিক শোধ করিবার পর চিকিৎসকগণ জননীর জীবনে একপ্রকার হতাশ হইয়া পড়িলেন, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ কিছুদিন শয্যা গ্রহণ করিবার পর পরমারাধ্যা জননী আমার বাঁচিয়া উঠিলেন।

জনক জননী সর্ব্বক্ষণ শঙ্কিত প্রাণে আমার দিকে চাহিয়া থাকিতেন, পাছে আমার "মন্দ" হয়। অপরের কুদৃষ্টি আমার উপর পড়িবার ভয়ে আমার বামপদে জননী একগাছি লোহা দিয়া রাখিয়াছিলেন। "মরা হাজা" ছেলে হইলে লোকে তখন এইরূপ লোহা পরাইয়া দিত। বর্ত্তমান সভ্যতার দিনে এ নিয়ম এখনও প্রচলিত আছে কি না জানি না। আমি জনক-জননীর কতটা "আদুরে" ছেলে ছিলাম, এখন হয়ত আপনারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার পিতৃদেব অতি অমায়িক, পবিত্রচেতা, ধার্ম্মিক, সরলহৃদয়, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। ত্রিসন্ধ্যা ও পূজা আহ্নিক না করিয়া তিনি কখন জল গ্রহণ করিতেন না। পরাধীন চাকরিকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন; চাকরিজীবিকে তিনি ঘৃণা না করিলেও শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। আমার পিতৃদেব বড়ই ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। প্রত্যেক কার্য্যেই তিনি মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা উপলব্ধি করিয়া প্রশান্ত-চিত্তে দিন যাপন করিতেন। সাংসারিক বা বৈষয়িক কার্য্যানুরোধে যে দিন তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া ভিন্ন গ্রামে যাইতেন, সে দিন মার্ত্তণ্ডদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িলেও কোথাও জল গ্রহণ করিতেন না। দিবা অবসান হইয়া গেলেও গৃহ-দেবতার পূজা, সন্ধ্যা বন্দনাদি না করিয়া কখনই অন্ন জল মুখে দিতেন না। আমাদের গ্রামে আমার পিতৃদেবের ন্যায় পরোপকারী ব্যক্তি আর দ্বিতীয় ছিল না। অর্থের দ্বারা সকলের সকল সময় উপকার করিতে না পারিলেও সামর্থ্যের দ্বারা কখন কাহার উপকার করিতে বিরত

হইতেন না। আমার পিতৃদেব কৃষিকার্য্যকে বড়ই ভাল বাসিতেন, কৃষিকার্য্যই তাঁহার জীবনের অবলম্বন ছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন, অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্যে কোন না কোন সময়ে কপটতা ও মিথ্যার ছায়া স্পর্শ করিয়া ব্যবসায়ীকে নিরয়গামী করিতে পারে, কিন্তু কৃষিকার্য্য পবিত্র ব্যবসা। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি, এমন কি, ইন্দুরটি পর্য্যন্ত ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যাদি ভোগ করিলে পর তবে গৃহস্থের গৃহে সঞ্চিত হয়।

"বাণিজ্যের ধনে, চাষের এক কোণে" এই নীতি-বাক্যে তিনি বিশ্বাসবান ছিলেন। পিতৃদেবের শতাধিক বিঘা জমিতে চাষ-আবাদ হইত। পাঁচজন কৃষাণ, আট দশটি লাঙ্গলের গরু সর্ব্বক্ষণ পিতৃদেবের কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত থাকিত। গৃহে সাত আটটি গাভী তাহাদের হৃষ্টপুষ্ট দেহ লইয়া অজস্রধারে দুগ্ধ দান করিত। চাষের ধানের অন্ন, গাভীর দুগ্ধ, পুষ্করিণীর মৎস্য, পিতৃদেবের কোনই অভাব ছিল না। ইহা ব্যতীত তিনি চিকিৎসা-ব্যবসা করিতেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। চিকিৎসা-ব্যবসায়েও তাঁহার আয় অল্প ছিল না।

আমার উপর পিতৃদেবের স্নেহ-মমতা কতখানি ছিল, তাহা ভাষায় লিখিয়া বুঝাইবার নহে! সেই গভীর স্নেহের সহিত জগতের কিছুরই তুলনা হয় না। আমাকে

চক্ষের অন্তরালে রাখিয়া, তিনি কখনও কোথাও থাকিতে পারিতেন না। কার্য্যানুরোধে মাঝে মাঝে তাঁহাকে কলিকাতা আসিতে হইত, কিন্তু দুই দিনের অধিক কখন তিন রাত্রি কলিকাতায় অতিবাহিত করিতেন না। যখনই তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা দুই এক দিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেন, তখনই তিনি আকুল প্রাণে—অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিতেন, "সাতকড়ির জন্য আমার প্রাণ হু হু করিতেছে, তাহার মুখটি না দেখিলে জগতে আমার কিছুই ভাল লাগে না, তোমরা আমাকে আর এক দণ্ডও এখানে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিও না।"

আমাকে চক্ষের অন্তরালে রাখিতে পিতৃদেব কখন স্বীকৃত হইতেন না, এই জন্য জননী আমার জন্মের পর হইতে তাঁহার পিত্রালয়ে যাইতে পান নাই। একবার আমার মাতুল "রামদাস" আসিয়া পিতাকে অনুরোধ উপরোধ করিয়া আমাকে ও মাকে কয়েক দিনের জন্য তাঁহাদের বাটীতে লইয়া যাইবার সম্মতি পাইলেন। আমার মাতুলালয় আমাদের গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দূর বলুণ্ডি গ্রামে। আমরা এক শুভদিনে শুভক্ষণে মাতুলালয়ে চলিয়া গেলাম। যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল, বাবা একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আমাকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া বাবার মনে শান্তি

নাই। মধ্যাহ্নকালে তিনি আহারে বসিলেন, আহার করিতে পারিলেন না। পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা! তুমি যে কিছুই আহার করিলে না?" বাবা বলিলেন, "মুখে কিছুই ভাল লাগিল না দিদি।" পিসিমা বুঝিলেন, কেন বাবা আহার করিতে পারিলেন না।

এই দিন সন্ধ্যার পর বাবা নিয়মিত সময় অপেক্ষা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দেবগৃহে ধ্যানযোগে রত থাকিলেন। বহুক্ষণ পরে দেবগৃহ হইতে বাহির হইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিলেন, "প্রসন্ন!" বাবাকে কাতর স্বরে ডাকিতে শুনিয়া পিসিমা দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন, "কেন দাদা?" বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সাতকড়ি আজ কয়দিন হ'ল তার মামার বাড়ী গেছে?" পিসিমা আশ্চর্য্য হইয়া উত্তর করিলেন, "ক'দিন কি?—আজ যে প্রাতঃকালে গিয়াছে!" বাবা বলিলেন, "আমার গৃহ অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে, মনে হইতেছে, "শক্রঘ্ন" আমার কত দিন ঘরে নাই, কালই ছেলেকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দাও।"

বাবা কখন কখন আমাকে আদর করিয়া "সাতু" বা "সাতকড়ির" পরিবর্ত্তে "শক্রঘ্ন" বলিয়া ডাকিতেন।

পরদিন প্রাতে পিতৃদেব স্বয়ং আমার মাতুলালয়ে গিয়া আমাকে বুকে চাপিয়া বারবার মুখ চুম্বন করিলেন।

সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সেদিন বাবা আমার মাতুলালয়েই রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন বাবার সঙ্গে আমরা গৃহে আসিলাম;—আমি গৃহে আসাতে দুই দিনের পর বাবার মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আমাকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বাবার প্রাণপণ চেষ্টা ও আকুলতার কথা মনে পড়িলে, আজও হৃদয় কাঁপাইয়া অজস্রধারে অশ্রুবারি নির্গত হয়। কি করিলে আমি ভালরূপ লেখা-পড়া শিখিতে পারিব, কিরূপে আমি "দশ জনের এক জন" হইব, এই চিন্তা বাবা অহরহঃ করিতেন। বিদ্যা, ধন, সুখ, সৌভাগ্য পূর্ব্ব-জন্মের অদৃষ্ট-সাপেক্ষ, এই কথা যাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয়, তাঁহারা যদি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনী পাঠ করেন, তবে অদৃষ্ট ও পূর্ব্বজন্মে তাঁহারা বিশ্বাসবান হইবেন। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, কিছুরই ক্রটী হয় নাই। পাঁচ বৎসর পরে যেটি প্রয়োজন হইবে, পিতৃদেব তৎ-পূর্ব্বেই গৃহে স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। কালি, কলম, কাগজ, বাঙ্গালা ইংরাজি পুস্তক, খাতা, রুল, পালকের কলম, কঞ্চির কলম, ষ্টিলপেন ব্লটিং ডেক্স প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিল না। এক কথায় বলিতে গেলে, বিদ্যাশিক্ষার সমস্ত সুবিধা-সুযোগ স্বত্ত্বেও আমি মূর্খ ব্যতীত পণ্ডিত হইতে পারিলাম না!

ইহাতেই কি মনে হয় না, পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফল বা অদৃষ্টের নিকট পুরুষকার ভাসিয়া যায়?

পঞ্চম বৎসর বয়সের সময় আমার হাতে খড়ি হইল। হাতে খড়ির দিন বাবার উৎসাহ ও আহ্লাদের সীমা ছিল না। প্রাতঃকাল হইতে বাবার গুরুদেব মলয়পুরের শিরোমণি মহাশয় আসিয়া পূজা, জপ, তপ কত কি করিতে লাগিলেন, বাবার আত্মীয়-বান্ধবগণ নিমন্ত্রিত হইলেন। সরাটীর গগন রায় গুরুমহাশয়কে নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে দিয়া বাবা উৎসাহভরে পুত্রের ভাবী সুখের চিত্র কল্পনা করিয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে গগন রায় বাবার চণ্ডীমণ্ডপেই পাঠশালা খুলিয়া বসিলেন।

পূর্ণ পাঁচ বৎসরকাল গুরুমহাশয়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিলাম। এই পাঁচ বৎসরে মা সরস্বতী দেবী কতদূর কৃপা করিলেন, সে পরিচয় আমার মধ্যজীবনে আপনারা জানিবেন। আমি যে সকলের নাম লিখিতে পারি বাবার ইহাতেই কিন্তু আনন্দের সীমা ছিল না। এই সময় স্থানীয় ইংরাজি স্কুলের হেড্ মাষ্টার নটবর বাবুর সঙ্গে, পরামর্শ করিয়া বাবা আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

দশটা বাজতে না বাজিতে মা ভাত রাঁধিয়া দেন, আমি গরম ভাত খাইয়া তাড়াতাড়ি পুস্তকগুলি বগলে লইয়া

স্কুলে যাই। পিতা মাতার আনন্দের সীমা নাই। বাবা মনে করিতেছেন, পুত্র এইবার ইংরাজীতে পণ্ডিত হইয়া বংশ উজ্জ্বল করিবে। আমি যখন আমাদের মৃত্তিকা গৃহের দুয়ারে বসিয়া ঘাড় নাড়িয়া পা দুলাইতে দুলাইতে দি র‍্যাম—ঐ ভেড়া; এ হগ—এক শূকর; হি ইজ ইন তিনি হন ভিতরে, প্রভৃতি পড়াগুলি মুখস্থ করিতাম, তখন পিতৃদেব আনন্দোৎফুল্লহৃদয়ে পুত্রের ভাবী উন্নতির আশা বুকে লইয়া, অন্তরালে দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। আমার পিতা ইংরাজী পুস্তক কখন হাতে করেন নাই, সুতরাং ইংরাজি-বিদ্যায় আমি কতদূর পারদর্শী হইতেছি, বাবা ইহার কিছুই বুঝিতেন না। এক দিন আমার এইরূপ পাঠাভ্যাসের সময় আমার ভগ্নি "রাখাল দাসী" আমার কাছে বসিয়া খেলা করিতেছিল, বাবা দেখিতে পাইয়া বিরক্তিস্বরে মাকে বলিলেন, "তুমি এইরূপে ছেলের পাঠে বিঘ্ন ঘটাইলে কি করিয়া সে মানুষ হইবে?" মা তাড়াতাড়ি আসিয়া লজ্জাবনত মুখে ভগ্নিকে জোর করিয়া উঠাইয়া লইয়া গেলেন। ভগ্নি চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মা ভাবিলেন, আমি ছেলেকে আজ পাণ্ডিত্যের আসন হইতে বুঝি কত দিনের পথে পিছাইয়া দিলাম।

আমাদের গ্রামের ননী কামার তাহার একটি ছোট

ভাইকে লইয়া নিত্য স্কুলে যাইত। ভাইটি তাহার বড়ই বাধ্য ছিল, ঠিক যেন রামের পশ্চাতে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ যাইতেছে। ছোট ভাইটি কখন ননীর বইগুলি মাথায় করিয়া যাইতেছে, কখন দাদার ছাতাটি বগলে করিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছে। দাদার পায়ে কাদা লাগিয়াছে, অমনি ছোট ভাইটি নিজ ক্ষুদ্র বস্ত্রাগ্রে মুছাইয়া দিতে আসিতেছে। ইহাদের উভয় ভ্রাতার স্নেহ ভক্তি দেখিয়া আমার বড়ই হিংসা হইতে লাগিল। কিয়ৎদিবস মনের দুঃখ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া, একদিন স্কুল হইতে আসিয়া মাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া শেষে বলিলাম, "মা! আমার যদি একটি ভাই থাকিত, তবে আমিও ননীর মত সুখী হইতাম। আমার যদি ভাই না হয়, তবে আমার মনের দুঃখ মরিলেও যাইবে না।" মা বার বার আমার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ভগবানকে তোমার অন্তরের ব্যথা জানাও, তিনি কৃপা করিলে তুমিও একটি ননীর মত আজ্ঞাবহ ভাই পাইবে।"

মায়ের কথায় সেই দিন হইতে আমার চমক ভাঙ্গিল। মা যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ভগবানকে দেখাইয়া দিলেন। ভগবান কোথায় আছেন, কি করেন, অথবা ভগবান বলিয়া কোথাও কেহ আছেন কি না, এ চিন্তা আমি একদিনের জন্যও করি না। আজ মায়ের

কথায় আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। মরুময় বাল্য-জীবনে অনবরত অমৃতধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। এই দিন হইতে শয়নে, স্বপনে, ভোজনে একটি ভ্রাতার জন্য সরল প্রাণে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। একদিন প্রত্যূষে স্বপ্নে দেখিলাম, ৺তারকেশ্বরের মন্দির পশ্চাতে আমি দাঁড়াইয়া আছি, একটি সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ একটি শিশুকে আনিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। শিশুর হস্ত ধারণ করিয়া তারকনাথের মন্দির পশ্চাতে আমি বেড়াইতেছি, এমন সময় মা আসিয়া পড়িবার জন্য উঠাইয়া দিলেন। আমার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। মাকে আমি স্বপ্নের কথা বলিলাম। মা বলিলেন, "এই স্বপ্ন সত্য হইলেও হইতে পারে, কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না।" আমি মনের আনন্দ মনেই চাপিয়া রাখিলাম।

পবিত্র বাল্য-জীবনের ন্যায় এখন যদি আমি ভগবানের চরণে আকুল-প্রার্থনা জানাইতে পারিতাম, তবে অপার্থিব উন্নতি-শিখরে ভগবানের করুণায় আসন পাইতাম। সংসারের কোলাহলে পার্থিব-সুখ-ঐশ্বর্য্যের আশায় বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছি। সরল প্রাণের আকুল-প্রার্থনা হৃদয়-কন্দর হইতে এখন আর উত্থিত হয় না! জানি না, ভগবান হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতাপূর্ণ হৃদয়ের মলিনতা কখন

ধৌত করিয়া দিবেন কি না? আবার সেই বাল্যের সরল অকপট পবিত্র হৃদয় ফিরিয়া পাইব কি না, ভগবানই জানেন।

সত্য সত্যই ভগবানের করুণায় আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। আমার আকুল প্রার্থনা ভগবানের চরণে গিয়া পৌঁছিয়াছে। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃ-ক্রোড় অধিকার করিয়াছে। আমার আনন্দের সীমা নাই। আমি এখন স্কুল যাইবার সময় বার বার কনিষ্ঠের মুখচুম্বন করিয়া স্কুলে যাই; স্কুল হইতে চারিটার সময় প্রত্যাগমন করিয়াই ক্ষুধিত প্রাণে বার বার কনিষ্ঠের মুখচুম্বন করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করি? আমি যখন গভীর আনন্দ ভরে ভ্রাতার মুখচুম্বন করিতাম, তখন জননীর নয়নপ্রান্ত দিয়া বিন্দু বিন্দু আনন্দাশ্রু নির্গত হইত। এইরূপ গভীর আনন্দ ও সুখের মধ্য দিয়া আমার বয়স একাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

এই সময়ের একদিনকার ঘটনা এই স্থলে উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছদের পরিসমাপ্তি করিব। এই দিনকার কথা আজও স্মরণ করিলে আমার হৃদয় শিহরিয়া উঠে! এই ঘটনার কথা আজও অনলাক্ষরে আমার হৃদয়ে লিখিত আছে; জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এ লেখা মুছিবে না। আমার কনিষ্ঠের বয়স যখন তিন বৎসর, তখন একদিন

ভাইটিকে বক্ষঃস্থলে উঠাইয়া লইয়া প্রতিবেশিনী "সবি-দিদির" প্রাঙ্গনে খেলা করিতেছিলাম, খেলা করিতে করিতে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আমি অন্যমনস্ক হইয়াছি, ভাইটিও সম্মুখস্থ পুষ্করিণীতে গড়াইয়া পড়িয়া নিমগ্ন হইয়া গেল। জগৎ অন্ধকার দেখিলাম, মণ্ডলাকারে ধূমরাশি আসিয়া যেন আমাকে ডুবাইয়া দিল,—বৃক্ষ, তরু, লতা-গুলি পৃথিবীটাকে লইয়া আমার চক্ষের সম্মুখে যেন বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পুষ্করিণীর দিকে চাহিয়া রহিলাম;—পুষ্করি-ণীটা আমাকে যেন গ্রাস করিতে আসিল, একলম্ফে আমি পুষ্করিণীর জলে গিয়া পড়িলাম। সৌভাগ্যবশতঃ পুষ্করিণীতে অধিক জল ছিল না,—থাকিলে সেই দিনেই উভয় ভ্রাতার পার্থিব লীলা শেষ হইয়া যাইত।

অতি কষ্টে ভাইটিকে বুকে করিয়া তীরে উঠিলাম। "সবি দিদি" চীৎকার করিয়া দৌড়িয়া আসিল। আমি গগনভেদী রবে চীৎকার করিতে করিতে মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অল্পমাত্রই জল উদরে গিয়া-ছিল, সুতরাং সকলের শুশ্রূষায় অল্পক্ষণের মধ্যেই ভাইটি প্রকৃতিস্থ হইয়া মাতৃদুগ্ধ পান করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিবার পরেই আমার উপ-নীত-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া পিতৃদেব একজন ঘটককে একটি টুক্‌টুকে বধূর অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। ঘটকও প্রাণপণ চেষ্টায় পিতার ইচ্ছামত একটি পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই ঘটক মহাশয় একটি পাত্রী স্থির করিয়া পিতাকে আনন্দ-সংবাদ জ্ঞাপন করাই-লেন। পিতামাতার আনন্দের সীমা নাই, এইবার বধূ আসিয়া তাঁহাদের আঁধার ঘর আলো করিবে। যে গৃহ এতদিন অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে ঢাকিয়াছিল, সেই গৃহ এইবার পূর্ণিমা যামিনীর হেম স্নিগ্ধ ছায়ায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। মধুর স্নিগ্ধ বসন্তহিল্লোলে পিতা-মাতার সংসার অধিকতর আরামের স্থল হইবে। পিতাকে কেহ কেহ অনুরোধ করিলেন, অমাবস্যার পর একবারেই চন্দ্রিমার উদয় বিধির বিধানে অস্বাভাবিক, পরিণয় কার্য্য কিছুদিন স্থগিত থাকুক। এই কথা পিতার-মনঃপূত হইল না।

একদিন আমি পুস্তক বগলে স্কুলে যাইতেছি, এমন

সময় ঘটক মহাশয় কয়েকজন ব্রাহ্মণকে লইয়া আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। ঘটক মহাশয়ের বাক্-পটুতা গুণে পাত্রী-পক্ষীয়েরা আমার বিদ্যা-বুদ্ধির পরীক্ষা লইবার অবসর পাইলেন না। পাত্রীর একজন নিকট-আত্মীয় আমার বিদ্যার সীমা নির্দ্ধারণের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু ঘটক মহাশয়ের প্রবল বক্তৃতা-স্রোতে ভদ্রলোকটির ইচ্ছা ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গেল। ঘটক মহাশয় গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সোণার চাঁদ ছেলের মুখ দেখিয়া বুঝিতেছেন না, কালে একজন মহা বিদ্বান্ ধনবান্ লোক হইবে। এমন ছেলে আজ-কাল কি খুঁজিলে মিলে? যাও বাপ্‌ধন, স্কুলে যাও, আমাদের দেখা হইয়াছে।" ঘটক মহাশয়ের কথায় ভদ্রলোকগুলি মন্ত্রমুগ্ধবৎ আমার দিকে চাহিয়া রহিল, আমি সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া স্কুলে চলিয়া গেলাম। ভদ্রলোকগুলি যদি আমার বিদ্যার পরীক্ষা লইতেন, তাহা হইলে ঘটক মহাশয়ের লাভের আশা অতল জলে নিমজ্জিত হইত। সেই রাত্রেই বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইল এবং পাত্রীর পিতা ধান্য দূর্ব্বা ও কয়েকটি মুদ্রা দিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। ইহার একমাস পরেই পোলপাতুল গ্রামের ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী বসন্তকুমারীর সঙ্গে আমার শুভ-পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

আমার স্ত্রী সপ্তম বৎসরের বালিকা, আমার বয়স একাদশ বৎসর। বসন্তকুমারী অপেক্ষা আমার বয়স চারি বৎসর অধিক। আজ-কালকার অনেকেই হয়ত এই বাল্য-বিবাহের জন্য আমার পিতামাতাকে দোষ দিবেন। প্রথমতঃ আমার পিতামাতার স্বপক্ষে কয়েকটি কথা বলিয়া বাল্য-বিবাহের দোষগুণ সম্বন্ধে আমার নিজের মত ব্যক্ত করিব। বাল্য-বিবাহের দোষগুণ সম্বন্ধে আমি ভুক্ত-

আমি পিতা মাতার অধিক বয়সের সন্তান। পুত্র লাভে হতাশ হইয়াই তাঁহারা আমাকে লাভ করিয়াছিলেন। আমি যে পিতা-মাতার কত আদরের ধন তাহা সকলেই অবগত আছেন। পিতা মনে মনে বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে আর অধিক দিন সংসারে থাকিতে হইবে না, একটি নববধূ গৃহে আনিয়া সাধ আহ্লাদ মিটাইয়া লই। আমার সুখ দুঃখে সহানুভূতিকারী নিকট-আত্মীয় কেহ ছিলেন না, কে আমার বিবাহের ভার লইবে? এই সমস্ত ভবিষ্যৎ চিন্তাতে অভিভূত হইয়া পিতৃদেব আমার বাল্যকালেই বিবাহ দিতে প্রয়াসী হইলেন। বাল্যকালে বিবাহ দিলেই যে সন্তান বিগ্‌ড়াইয়া যায়, বাল্য-বিবাহ যে সন্তানের উন্নতি-পথে বাধা প্রদান করে, আমার পিতা-মাতা ইহা বিশ্বাস করিতেন না।

প্রকৃতই কি বাল্য-বিবাহ দোষের আকর? বাল্য-বিবাহে উপকারিতা কি কিছুই নাই? বাল্য-বিবাহে অনেক দোষ আছে, অপকারিতা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু বাল্য-বিবাহে উপকারিতাও নিতান্ত অল্প নহে। আজ-কাল সমাজ, সংসর্গ, শিক্ষা, দীক্ষা যেরূপ শোচনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাতে বাল্য-বিবাহ নিতান্ত দোষের বা অনাবশ্যকীয় একথা সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় না। যদি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর বালকগণকে পূর্ব্বের ন্যায় শিক্ষা, দীক্ষা ও সংযম ব্রত অভ্যাস করা-ইয়া বিবাহযোগ্য বয়সে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করা হইত, তাহা হইলে সমাজে এরূপ দুর্ব্বলতার স্রোত প্রবাহিত হইত না। ধর্ম্ম ও সংযমহীন উৎকট শিক্ষার প্রভাবে এবং সংসর্গদোষে আমাদের ভাবী বংশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানগণ অল্পবয়স হইতেই বিলাসিতার মোহে ডুবিয়া যায়, অল্প বয়স হইতেই তাহারা উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে বিলাস-বাসনা চরিতার্থের জন্য আপাততঃ সুখে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। অধুনা আমাদের দেশের বালক ও যুবকগণকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, ধর্ম্ম ও সংযমের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই; ফলে অল্প বয়স হইতেই নানারূপ উৎকট বাসনায় বালক ও যুবকগণের হৃদয় কলুষিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে আমাদের দেশের ভাবী বংশধরগণের পিতামাতা সন্তানকে

গুরুগৃহে পাঠাইয়া নিশ্চিন্তচিত্তে সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিতেন। সন্তানগণ সেবা দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান অর্জ্জন করিত,—সংযম অভ্যাস করিয়া দেহ মন সুগঠিত ও সুপ্রশস্ত করিয়া সংসারে প্রবেশ করিত। পিতামাতা উপযুক্ত সময়ে সন্তানের বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। তখনকার সংযমী সবল দৃঢ়চিত্ত উন্নতমনা বালক ও যুবকগণের সহিত এখনকার ক্ষীণ-দুর্ব্বল, রোগ-পীড়িত বিলাসী, অস্থিচর্ম্মসার বালক ও যুবকগণের তুলনা করিলে প্রকৃতই নয়নপ্রান্ত দিয়া দুঃখাশ্রু নির্গত হয়। এখন অনেকে যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই বিপথগামী হইয়া পড়ে; অনেক বালক ও যুবকগণ ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া অস্বাভাবিকরূপে দেহকে ধ্বংসের মুখে লইয়া যায়। এই শ্রেণীর বালক ও যুবকগণ চির জীবনের মত স্বাস্থ্য-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া অতি কষ্টে জীবন যাপন করে। এরূপ অবস্থায় সন্তানের বাল্যে বিবাহ দিলে বহু পরিমাণে সুফল ফলিতে পারে। যদি সন্তানের বাল্য-বিবাহ না দাও, তবে গৃহে গৃহে সন্তানকে ধর্ম্ম ও সংযম শিক্ষা প্রদান কর, তাহার ভাবী জীবনের ইষ্টানিষ্ট বুঝাইয়া দাও, সৎ-সঙ্গ ও সদুপদেশে তাহাদের হৃদয় মন গঠিত কর। অরণ্যে প্রবেশ করিলেই হিংস্র জন্তুর আক্রমণ সম্ভাবনায় যেরূপ আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্রাদি সঙ্গে লইতে হয়, লোভ

মোহ ও প্রলোভন-পূর্ণ সংসারে সন্তানকে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে ধর্ম্ম ও সংযম-রূপ অস্ত্রবর্ম্মে তাহাকে সুসজ্জিত করিয়া দাও, নচেৎ সন্তানের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যদি পিতামাতার বা অভিভাবকগণের ধর্ম্ম ও সংযম শিক্ষা দ্বারা পুত্রকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে অল্প বয়সেই সন্তানকে দাম্পত্য-বন্ধনে বাঁধিয়া দাও, তাহা হইলেও ভাবী বংশধরগণ হইতে বহু পরিমাণে মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে।

সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদান করিতে সকল পিতামাতা বা অভিভাবকগণই প্রয়াসী; কিন্তু সন্তানগণকে কেবল-মাত্র স্কুল কলেজে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, স্কুল কলেজের শিক্ষাকে আমরা একবারে মন্দ বলিতেছি না, কিন্তু ইহার সঙ্গে সংসারা-শ্রমের সার ধর্ম্ম ও সংযম শিক্ষা প্রতিগৃহে প্রতিষ্ঠিত হউক। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যোগী ঋষিগণের শিক্ষা যতদিন না ভারতভূমে পুনরাগমন করে, ততদিন সহস্র চেষ্টাতেও দুর্ব্বলতা, রুগ্নতা, দীনতা প্রভৃতির গতিরোধ হইবে না। অধুনা কোথায় সেই শিক্ষা, যে শিক্ষায় হৃদয় মন সুস্থ থাকিবে? কোথায় সেই শিক্ষা, যে শিক্ষায় শান্তির স্নিগ্ধ হিল্লোলে হিন্দুর গৃহ পবিত্র হইবে? কোথায় সেই শিক্ষা, যে শিক্ষার প্রভাবে প্রেমময়ী স্নেহময়ী ভার্য্যাকে বিলাস

চক্ষে না দেখিয়া সহধর্ম্মিণী বোধে ধর্ম্ম কর্ম্মের সঙ্গিনী করিবে? কোথায় সেই শিক্ষা, যে শিক্ষায় উন্নত বক্ষে প্রচুর হৃদয়বল ধারণ করিয়া সুখ দুঃখ তুচ্ছ বোধে কর্ত্তব্য পথে ধাবিত হইবে? কোথায় সেই শিক্ষা, যে শিক্ষার গুণে কামলোভাদি রিপুগণ মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ লুক্কাইত থাকিবে? কোথায় সেই শিক্ষা, যে শিক্ষায় স্বার্থপরতা দূরে গিয়া পরার্থপরতায় জীবন ও মনের উন্নতি সাধন করিবে? হিন্দুর সংসারে অধুনা যে শিক্ষা প্রবেশ করিয়াছে, সেই শিক্ষার প্রভাবে নরনারীকে বিলাস-বাসনায় উত্তেজিত করিতেছে,—ন্যক্কারজনক ঘৃণিত পাপস্রোতে দুর্ব্বল নর-নারীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া মৃত্যুতীরে উপনীত করিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, পুতিগন্ধপূর্ণ পাপস্রোতে সংযম ও ধর্ম্মশিক্ষাহীন বালক বা যুবকগণকে ভাসাইয়া না দিয়া, সংসারের অতলস্পর্শ কূপে ডুবাইয়া রাখ. কালে ইহারা উন্নতি সোপানে উঠিলেও উঠিতে পারে।

বাল্য-বিবাহে আরও একটি উপকার আছে। দুটি সরল পবিত্র প্রাণ একত্রিত হইয়া প্রেমময় হেম-শৃঙ্খলে বাঁধা হইয়া যায়। এই প্রেম-বন্ধন বুঝি জন্ম জন্মান্তরেও শিথিল হয় না। বাল্য-বিবাহে পবিত্র দাম্পত্য-প্রেম যত গাঢ় ও অস্থি-মজ্জাগত হয়, অধিক বয়সে বিবাহ হইলে

দাম্পত্য-প্রেমের এরূপ গভীরতা কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ছুটি সরল চঞ্চল প্রাণ যখন সহস্র ভাবী আশা বুকে লইয়া সংসারের চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিতে থাকে, যখন তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা চতুর্দ্দিকে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন ছুটি প্রাণ বজ্রবন্ধনে বাঁধা হইয়া যায়। পরস্পর পরস্পরের দোষগুণ সমালোচনা করিতে পারে না,—বিধির বিধান তাহাদিগকে ভাবিতে চিন্তিতে না দিয়া, তাহাদের অলক্ষিতে যেন তাহাদিগকে প্রাণে প্রাণে বাঁধিয়া দেয়। বাল্যকালের প্রেম ও ভালবাসা যে কত মধুর, আমার ন্যায় ভুক্তভোগী যাহারা, তাহারাই পবিত্র স্মৃতিটুকুর সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, অন্যের নিকট ইহা বুঝাইবার জিনিষ নহে। আমার মনে হয়, বাল্য-বিবাহে যতটা গুণের ভাগ বর্ত্তমান, দোষের ভাগ তদপেক্ষা অধিক নহে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাস। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত। মার্ত্তণ্ড-দেবের প্রচণ্ড উত্তাপে বিহগকুল বৃক্ষশাখার ছায়া আশ্রয় করিয়া বসিয়া আছে। পল্লিগ্রামের পথে কচিৎ দুই-একটি লোক যাতায়াত করিতেছে। পিতৃদেব আজ প্রাতঃকাল হইতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। পল্লীগ্রামে বর্ষাকালে গরুর জীবন ধারণের একমাত্র সম্বল খড়গুলি গো-শালায় গুছাইয়া রাখিতেছেন। কয়েকজন কৃষাণ বৈশাখের রৌদ্রে গলদঘর্ম্ম হইয়া পরিশ্রম করিতেছে। আমার পিতার কপোলদেশে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম একত্রিত হইয়া বড় বড় ফোঁটার আকারে বক্ষঃস্থলে গড়াইয়া পড়িতেছে; আবার বক্ষঃস্থল হইতে গড়াইয়া তাঁহার পরিধেয় বসনখানি আর্দ্র করিয়া দিতেছে। পিতাও মধ্যে মধ্যে কৃষাণগণকে সাহায্য করিতেছেন,—কাহারও মাথায় খড়ের বোঝা উঠাইয়া দিতেছেন, কাহারও মাথা হইতে বোঝা নামাইয়া দিতে-ছেন। পিতার সেই হাস্যদীপ্ত মুখচ্ছবি আজ যেন অন্ধকার মেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে ;, প্রশান্তমূর্ত্তি আজ যেন ম্লানভাব ধারণ করিয়াছে। আমি চারিদিক হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া

আসিতেছি, আর এক-একবার পিতার মুখের দিকে চাহিতেছি। পিতার মুখ দেখিয়া আমারও মুখটা শুখাইয়া যাইতেছে, মনটা বিকল হইয়া অন্তঃকরণ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছে। একবার মনে করিলাম, খড়ের বোঝা কৃষাণ-গণের মাথায় উঠাইয়া দিয়া পিতার একটু সাহায্য করি। আবার মনে হইল, না, এখান হইতে সরিয়া পড়ি। আমার পিতার বাবুগিরি বা মান-অপমান ছিল না, তিনি অম্লান-বদনে কৃষকদের সঙ্গে কৃষিকার্য্যে যথাসাধ্য পরি-শ্রম করিতেন। হায়! পিতঃ! কোথায় তুমি আজ? তোমার শ্মশ্রুগুম্ফ বিহীনপ্রশান্ত মুখমণ্ডল, তোমার সেই অর্দ্ধ পক্ক কেশগুলি, তোমার সেই শুভ্র উপবীতের গোছা, তোমার সেই কপোলোপরি ক্ষুদ্র "আবটি" পর্য্যন্ত মনে পড়িয়া হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিতেছে! হায়! হায়! তোমার কথার অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়া কতবার কত প্রকারে তোমার মনে ক্লেশ প্রদান করিয়াছি, জানি না পিতৃদেব, সেই সব পাপের প্রায়শ্চিত্তের আরও কি অবশিষ্ট আছে!

আমার পিতৃদেব প্রৌঢ়াবস্থাতেও বৈশাখের প্রখর দ্বিপ্রহর রৌদ্রে গলদঘর্ম্ম হইয়া পরিশ্রম করিতেছেন, এখনও জলবিন্দু মুখে দেন নাই, আর আমি ত্রয়োদশ বৎসরের অকাল কুষ্মাণ্ড পুত্র দশটার সময় চর্ব্যচূষ্য আহার

করিয়া, মাথার চুলগুলি ফিরাইয়া, সাদা কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া বেড়াইতেছি! তোমরা বলিতে পার, আমার এই জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? তোমরা ক্রমশঃ আমার এই সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখিতে পাইবে, কিন্তু তাহাই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট? বাবার সঙ্গে খড়ের বোঝা কৃষাণদের মস্তকে কেন তুলিয়া দিতে লজ্জা হইতেছে, তোমরা শুনিবে? তোমরা শুনিবে কি, এই ত্রয়োদশ বৎসরে বাবার সঙ্গে আমার কতটা প্রভেদ ঘটিয়াছে?

আমি এখন মনে করি, বাবা ইংরাজি জানেন না, আমি মধ্য ইংরাজি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছি, সুতরাং বাবা মূর্খ! বাবা কস্মিনকালেও বুট জুতা পায়ে দেন নাই, আমার বার্ণিসওলা বুট না হইলে একদণ্ডও চলে না; সুতরাং বাবা সেকেলে লোক! বাবা হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে আমার এবং আমার ভাই-ভগ্নিদের ক্ষুধার অন্নের জন্য কৃষিকার্য্যে অসভ্য কৃষাণদের সঙ্গে পরিশ্রম করেন, সুতরাং উনিও একজন অসভ্য কৃষকের ন্যায়! কৃষাণগুলা আহারে না বসিলে বাবা তাহাদিগকে রাখিয়া আহার করেন না; আমি দশটা বাজিতে না বাজিতে আহার করিয়া সমবয়স্কদের সঙ্গে বেড়াইয়া বেড়াই, সুতরাং বাবার আত্মসম্মান জ্ঞান নাই, আমার সেটা যথেষ্ট আছে। তোমাদিগকে এখন ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, বাবা

এখন আমার কার্য্য, চাল, চলন ও ব্যবহার দেখিয়া সর্ব্বদাই অসুখী ও বিমনা হইয়া থাকেন। তখন বুঝিতে পারি নাই কিন্তু এখন বুঝিতে পারি যে, আমার ব্যবহারে বাবাকে এই দুঃখের বোঝা বহিতে হৃদয়ে কতখানি যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। হতভাগ্য আমি—আমার ব্যবহারে বাবাকে এক একদিন অসহ্য দুঃখে অশ্রুপাত করিতে হইয়াছে! পুত্র যদি পিতার অবাধ্য হয়, কনিষ্ঠ যদি জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা শিরোধার্য্য না করে, ভ্রাতষ্পুত্র যদি খুল্লতাতের অনুমতির অপেক্ষায় দণ্ডায়মান না থাকে, তবে হৃদয়ে কিরূপ যন্ত্রণা হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। তোমরা কি এখন বুঝিতে পারিতেছ যে, আমি সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতার প্রাণে কষ্ট দিয়া কতখানি পাপ সঞ্চয় করিয়াছি?

অপরাহ্ণ সময়ে শুষ্ক ও বিষাদ-পূর্ণ মুখে গৃহে প্রবেশ করিয়া বাবা বলিলেন, "বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে বড়ই বেদনা অনুভব করিতেছি, আজ আর আমার স্নান করা হইল না।"

অসুস্থতার কথা শুনিয়া মা ও পিসি-মা দৌড়িয়া আসিলেন। বাবা স্নান না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, আজ অতি কষ্টে বস্ত্র ত্যাগ করিয়াই পূজা-আহ্নিক শেষ করিলেন। আমি ভাবিলাম, বাবা আজ অতিরিক্ত

পরিশ্রম করিয়াছেন, সেই জন্যই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বাবার কাছে আসিয়া দেখি, বাবা শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। বেদনার অসহ্য যন্ত্রণা, তাহার উপর ঘোরতর জ্বর। সেই দিন এই ভাবেই কাটিয়া গেল, কিন্তু পরদিন অসুখ আরও বৃদ্ধি হইল।

আজ চারি দিন বাবার ডাক্তারি চিকিৎসা হইতেছে, কিন্তু পীড়া কম হওয়া দূরের কথা, প্রত্যহ পীড়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভয়ঙ্কর জ্বর, কফ্‌, দুই পার্শ্বে বেদনা! ডাক্তার বলিতেছেন, পীড়া বড়ই কঠিন, বাত-শ্লেষ্মা জ্বর, তাহার উপর বেদনা। তিসির পুলটীস্‌, মালিস, ঔষধ, ডাক্তারের উপদেশ-মতই দেওয়া হইতেছে, কিন্তু পীড়ার তিলমাত্রও হ্রাস হইতেছে না। ক্রমশঃ সকলেই বাবার জন্য উৎকন্ঠিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এখন আর বাবা কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারেন না, অজ্ঞান অবস্থায় শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এবং সেই অবস্থাতেই ঔষধ, পুলটিশ ও মালিশ ইত্যাদি প্রয়োগ করা হইতেছে।

ছয় দিনের পর অপরাহ্ণ সময়ে বাবার একটু জ্ঞান হইল। আমি তখন বাবার পা দুখানি ক্রোড়ে রাখিয়া হাত বুলাইয়া দিতেছি, আড়াই বৎসরের ছোট ভগ্নী চারু-বালা একটু দূরে খেলা করিতেছে, ছয় বৎসরের কনিষ্ঠ ভাইটি বাবার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। এক-

বার ভাই ও ভগ্নিটির মুখের দিকে চাহিয়া শেষে চক্ষু দুটি আমার মুখের উপরে রাখিয়া বাবা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। চক্ষুপ্রান্ত দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া শুষ্ক গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। বাবার জ্ঞানলাভে আমার যে আনন্দটুকু হইয়াছিল, অশ্রুপাত দেখিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আনন্দ চলিয়া গেল। বাবার কান্না দেখিয়া আমি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। শোক দুঃখ হতাশের ক্রন্দন জীবনে আমার এই প্রথম। যাহার চক্ষের একবিন্দু অশ্রু দেখিলে পিতা আমার জগৎ অন্ধকার দেখিতেন, যাহার অশ্রুপাতে অন্তর ভেদ করিয়া চক্ষু দিয়া স্নেহবারী নির্গত হইত, আজ সেই পিতার রোগ-শয্যায় বসিয়া পুত্রের আকুল ক্রন্দন! পিতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, আমাকে তাঁহার শিয়রে যাইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে পিতার দক্ষিণ হস্তটি ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার শিয়রে উপবেশন করিলাম।

পিতা অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! তুমিই আমার প্রথম সন্তান! তোমাকে যদি ভাল দেখিয়া,—মানুষ করিয়া মরিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার মরণে সুখ হইত! কিন্তু ভগবানের তাহা অভিপ্রেত নয়! আমার—"

পিতা আর সে পিতা নাই! তাঁহার অস্থিচর্ম্মসার হই-

য়াছে। আজ আর তাঁহার কথা কহিবারও সামর্থ্য নাই। কি বলিতে যাইতেছিলেন, বলিতে না পারিয়া, একটু জল চাহিলেন। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার দুগ্ধ খাইবার ছোট গ্লাসটি করিয়া একটু জল দিলাম। জল খাইয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ—

"আমার জীবনী-শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। আমাকে আর এ জগতে দেখিতে পাইবে না। তুমি সংসারকে যতটা সুখের ও বিলাসের লীলাভূমি ভাবিতেছ, ইহা প্রকৃত তাহা নহে! বাপ! সংসার বড়ই কঠিন স্থান। তোমাকে অনেক কথা বলিয়াছি, অনেক উপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তুমি সে পথে একদিনের জন্যও যাইতে চেষ্টা কর নাই। আমি চলিলাম, কিন্তু আমার কথাগুলি মনে রাখিও। আ—মি—"

পিতা আর কথা কহিতে পারিলেন না, চক্ষু মুদিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পিতার অসহ্য রোগ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়া আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। আজ আর দিন কাটে না। সকলেই ব্যথিত ও শঙ্কিত চিত্তে বাবাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। বাবার কথা কহিবার শক্তি নাই, অব্যক্ত অসহ্য যন্ত্রণায় শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। হায়! পিতৃদেবের সেই রোগ-শয্যায় অসহ্য যন্ত্রণার কথা মনে হইলে আজও হৃদয়

অস্থির ও উদ্বেলিত হইয়া আমার শ্বাস-প্রশ্বাস মন্দীভূত হইয়া পড়ে।

ক্রমশঃ দিবা অবসান হইতে লাগিল। বৈশাখের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িলেন। কাল রাত্রি সমাগত জানিয়া, সকলের মুখমণ্ডল আরও বিষাদময় হইয়া উঠিল। মার্ত্তণ্ডদেব কি নিষ্ঠুর! আমাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে দেখিয়া, এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিল না—দেখিতে দেখিতে লুকাইয়া পড়িলেন। এদিকে সন্ধ্যা দেবীও সঙ্গে সঙ্গে উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। ডাক্তারের আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, আমি ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলাম। হায়! হায়! বিপদের উপর বিপদ। যদু ডাক্তারের ডাক্তারখানায় যাইয়া দেখি, ডাক্তারখানা বন্ধ। ডাক্তারের সহিস বলিল, ডাক্তার বাবু অনেকক্ষণ বাহির হইয়া গিয়াছেন। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। এখন আমি মৃত কি জীবিত নিজেই অনুভব করিতে পারিতেছি না! আমি স্বপ্ন দেখিতেছি না কি? বাবা আমার এত ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন কেন? তবে কি আবার পীড়া বৃদ্ধি হইল? অসুখ ত সকলেরই হয়, তবে মা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া দিবা রাত্র কাঁদিতেছেন কেন? তবে কি বাবা আমার এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না? এই ভীষণ কথা মনে হইবা মাত্র সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল,—কে যেন

আমার বক্ষের পঞ্জরগুলা জোরে মুচড়াইতে লাগিল! অসহ্য যন্ত্রণায় আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। ডাক্তারের সহিস আমার চীৎকার শুনিয়া দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখটা কি বাড়িয়াছে?" মূর্খ সহিসকে আর কি বলিব? বলিলেও সে কি আমার প্রাণের যন্ত্রণা বুঝিতে পারিবে? ডাক্তারের কথা ভুলিয়া গেলাম, ঔষধের কথা ভুলিয়া গেলাম, চিকিৎসা ও পীড়ার কথা ভুলিয়া গেলাম। বাবাকে দেখিবার জন্য উৰ্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে দৌড়াইতে লাগিলাম। আমাকে দৌড়াইতে দেখিয়া একটা কাল কুকুর "ভেউ ভেউ" করিয়া আমার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়াইতে লাগিল,—একটা বড় দাঁড়কাক "কা কা" করিয়া মাথার উপর উড়িতে লাগিল! দুইটা বড় বড় বাবলাকাঁটা পায়ে বিঁধিয়া যাওয়ায় যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা হইতে লাগিল,—আমার কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, পবন-বেগে দৌড়াইতে লাগিলাম।

গৃহে আসিয়া দেখি, বাবা পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক ছট্‌ফট্ করিলেও তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ বরফের ন্যায় শীতল, ললাট ও বক্ষঃস্থলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন নির্গত হইতেছে। বাবার আত্মীয়-স্বজনগণ আকুল ও উদাস-দৃষ্টিতে বাবার মুখের পানে চাহিয়া আছেন। কাহারও কাহারও গণ্ডস্থল দিয়া অজস্রধারে

জলধারা প্রবাহিত হইতেছে। মা আমার বাবার শিয়রে বসিয়া আছেন; কিন্তু তিনি জীবিতা কি মৃতা, ইহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। মা নিশ্চল নিষ্পন্দ! তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্পন্দন নাই! লাল করঞ্জার ন্যায় চক্ষুদুটি বাবার মুখের উপর ন্যস্ত, কিন্তু সে চক্ষে পলক নাই! মায়ের মুখের উপর যেন অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারটা জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। বাবার অবস্থা দেখিয়া আমার আনন্দ হইল কিন্তু মায়ের মুখপানে চাহিয়া ভয়ে দুঃখে মাথা ঘুরিয়া গেল। সমস্ত ঘরটা যেন আমার চক্ষে পুঞ্জীভূত অন্ধকারে ঘিরিয়া ফেলিল। আমি আর মায়ের মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না।

বাবার অবস্থা দেখিয়া আমি ভাবিলাম, এইবার আরোগ্য হইয়া যাইবেন। তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইয়া সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইতেছে, আরোগ্যের আর বাকি কি? ত্রয়োদশ বৎসরকাল পিতা-মাতার "আদুরে গোপাল" হইয়া কেবল খাইয়া খেলিয়া বেড়াইয়াছি, বই বগলে করিয়া স্কুলে চারিটা পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিয়াছি; কাহার কখন পীড়ার সময় কাছেও বসি না, কাহার কখন শুশ্রূষা করি না, কাহার কখন মৃত্যু-লক্ষণ দেখিবারও "গরজ" উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং বাবার এই আরোগ্যের লক্ষণে সকলের বিমর্ষভাব

দেখিয়া আমার বড়ই বিরক্তি আসিল। ভাবিলাম, বাবা আরোগ্য হইয়া আসিতেছেন, তবে ইহারা এমন করিতেছে কেন? পরক্ষণে ভাবিলাম, বাবা হয়ত গায়ে জল মাখিয়াছেন, সেই জন্য সর্ব্বাঙ্গ এরূপ শীতল। বাবা এক একদিন গাত্রদাহ অসহ্য হইলে গাত্রে শীতল বারিসিঞ্চন করিতেন, কাহার নিষেধ মানিতেন না।

আমি একটু অগ্রসর হইয়া বাবার কপোলদেশে হস্তার্পণ করিয়া বাবাকে বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা! আপনি আবার গাত্রে জলসিঞ্চন করিয়া অসুখটা বাড়াইতেছেন?" আমার কথা শুনিয়া কয়েকমুহূর্ত্ত বাবা আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরক্ষণে নয়ন-প্রান্ত দিয়া জলধারা নির্গত হইতে লাগিল। বাবা অন্তিম সময়ে হতভাগ্য পুত্রের কথায় কিরূপ মর্ম্ম-যাতনা পাইলেন, তাহা আমিই বুঝিতে পারি, অন্যে তাহা পারিবে না। এরূপ হতভাগ্য নরাধম পুত্র কোন পিতা-মাতার কখন যেন না হয়। পিতার অন্তিম সময়ে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আমি যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, বুঝি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

আমার কথা শুনিয়া বাবা আমার দক্ষিণ হস্তটি অতি দুঃখে এবং অতি স্নেহবশে ধরিতে গেলেন, কিন্তু তখন তাঁহার সে শক্তি নাই। পিতা মর্ম্মভেদী স্বরে অতি কষ্টে

বলিলেন, "অবোধ ছেলে, এখনও তুমি বুঝিতেছ না, তোমার পিতার অন্তিমকাল উপস্থিত। ধীরে ধীরে আমার জীবনী-শক্তি হ্রাস হইতেছে, এখনই যে সব শেষ হইবে, তুমি—"

পিতা আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যাদেবীকে কাল-যামিনীর অন্ধকারে ডুবাইয়া দিল। যতই রাত্রি অধিক হইতেছে, পিতার সর্ব্বাঙ্গ অধিকতর শীতল হইতে লাগিল। ঘর্ম্মের আর বিরাম নাই! ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি নাড়ী দেখিয়া আর কোন ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন না। দুইটি বিলিষ্টার প্রয়োগ করিয়া ভিজিট লইয়া চলিয়া গেলেন। ডাক্তারগুলা কি নিষ্ঠুর! বিলিষ্টার প্রয়োগ করায় বাবার যন্ত্রণার উপর আরো যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল।

আর কতক্ষণ অতীত হইল মনে নাই। আমি তখন জ্ঞানহারা পাগলের ন্যায় বাবার শিয়রে বসিয়া আছি। কে যেন আমাকে শূন্যে তুলিয়া ভূমিতে আছড়িয়া মারিতেছে, কে যেন আমার বক্ষের পঞ্জরগুলা এক একখানা করিয়া বুক হইতে খসাইয়া লইয়া এক মোচড়ে ভাঙ্গিয়া দূরে ফেলিয়া দিতেছে। কে যেন আমার হৃদপিণ্ডটা অনবরত শানিত ছুরিকার অগ্রভাগ দিয়া বিঁধিয়া দিতেছে। ঠিক এইরূপ সময়ে বাবার একবার জ্ঞানের উদয় হইল।

আমার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতার স্ত্রী আমাদের "বড় বউকে" বাবা অতি জড়িতস্বরে বলিলেন, "মা! যে সব ঘটনা আজ প্রত্যক্ষীভূত হইল, যদি বলিতে পারি, তবে বলিব।" হায়! হায়! এই একটি কথা কহিয়াই আবার বাবা অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। হায়! এই কথাই বাবার জীবনের শেষ কথা! তিনি অন্তিম সময়ে সূক্ষ্মদেহী বাবার আত্মীয় পরিজনকে দেখিয়া তাঁহাদের কথা বোধ হয় সকলকে বলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আর বলা হইল না। কয়েক মুহূর্ত্তের পরেই "হায়! কি হইল, কোথা গেলে" গগনভেদী এই আকুল চীৎকার ধ্বনিতে আমার প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল! আমি বাবার বুকের উপর অজ্ঞান হইয়া ঢলিয়া পড়িলাম। যখন আমার একটু জ্ঞানের উদয় হইল, তখন দেখিলাম, আমাদের গ্রামের অনতিদূরে "মোল্লাহাড়ের" শ্মশানে ধূ ধূ করিয়া একটি চিতা জ্বলিতেছে, আর আমার বাবাকে সেই জ্বলন্ত চিতায় কয়েকজন লোক দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। উঃ! মানুষগুলা কি নিষ্ঠুর! আমি বাবার চিতায় লাফাইয়া পড়িয়া পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব মনে করিয়া অগ্রসর হইলাম, অমনই কে একটা লোক ধরিয়া ফেলিল, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাবার মৃত্যুর পর তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন আমার বয়স ষোল বৎসর। পিতার মৃত্যুতে যে দুঃসহ শোক পাইয়াছিলাম, সেই শোকের তীব্রতা যদি অধিক দিন স্থায়ী হইত, তবে বোধ হয় অস্থি-পঞ্জরগুলি খসিয়া খসিয়া পড়িয়া যাইত। ভগবান তাঁহার বিশ্বরাজ্যে শোককে অল্পজীবী করিয়াছেন, তাই বুঝি জগতে মানব-বংশ নির্ম্মূল হইয়া যায় না। জগৎবাসী নরনারী যে ঐশ্বরী মায়া-প্রপঞ্চে ভুলিয়া তীব্র শোক-জ্বালা কালে বিস্মৃত হয়, পিতৃদেবকে শ্মশানের জ্বলন্ত চিতায় বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া জননীর স্নেহ-ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া আমিও সেই মায়ায় এই তিন বৎসরে অল্পে অল্পে পিতৃশোক বিস্মৃত হইতে ছিলাম। জানি না, জগতে ভগবানের কি শক্তিবশে এক-মাত্র প্রাণের প্রাণ পুত্র-রত্নকে কালের ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া কালে পাগলিনী জননীরও শোক-জ্বালা মন্দীভূত করিয়া ফেলে, সাবিত্রী সমানা পতিব্রতা নারী সুতীব্র স্বামী শোকেও কালে ধৈর্য্যধারণ করে, প্রাণ-প্রতিমা সহধর্ম্মি-ণীকে মৃত্যুস্রোতে ভাসাইয়া দিয়াও স্বামী আবার সংসার-

কোলাহলে ডুবিয়া গিয়া সকল স্মৃতি মুছিয়া দ্বিতীয় স্ত্রীরত্নের পাণিগ্রহণ করে। ক্ষুদ্র মানবে ভগবানের এই সব লীলা কিরূপে উপলব্ধি করিবে? শোকের তীব্রতা আমার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পিতার প্রেমময়-স্নেহময় মূর্ত্তি সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিত। পিতার সিন্দুকটির প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলেই নয়নজলে আমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। মা আমার নয়নজল মুছাইয়া মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিতেন, অমনি আমি সব ভুলিয়া যাইতাম।

পিতার সিন্দুকটিতে যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল এবং মায়ের কাছে যাহা কিছু ছিল, তাহাতেই এই তিন বৎসর একপ্রকার চলিয়া গেল। আমার জ্যেষ্ঠতাতভ্রাতা হারাধন দাদা আমাদিগকে কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। আমার পিতার চাষই একমাত্র উপজীবিকা ছিল কিন্তু দামোদর নদের বন্যায় সে আশাতেও ছাই পড়িয়াছে। পিতা থাকিতেই এই বন্যার উপদ্রবে অনেক জমি জমা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর এই তিন বৎসরে দামোদরের বন্যা এরূপ প্রবলভাব ধারণ করিয়াছে যে, কৃষিকার্য্য করিয়া একমুষ্টি ধান্যও কেহ পায় নাই। আমাদের উঠানে দুই তিনটা ধান্যের মরাই ছিল কিন্তু এখন আমাদিগকে চাউল কিনিয়া আনিয়া, তবে অন্নের সংস্থান

করিতে হয়। আমাদের ক্ষুদ্র সংসারটিতে খরচও নিতান্ত অল্প ছিল না;—আমি আমার জননী, কনিষ্ঠ ভাই, আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী রাখাল দাসী, এবং সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগ্নী চারুবালা। আমার যে পিসিমা ছিলেন, তিনি পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই ভ্রাতৃশোকে মৃত্যুক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহা ব্যতীত আমাদের দুইটি গাভী ছিল। আমার জননী চিরদিন আমাদের গোশালাপূর্ণ গরুগুলির প্রতি স্নেহ-যত্ন করিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্য এখন কষ্টের সংসার হইলেও গাভী দুটিকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। গরু দুটির আহার যোগান কষ্টকর ভাবিয়া আমাদের জ্ঞাতিরা গাভী দুটিকে ত্যাগ করিতে বলিতেন, কিন্তু মা বলিতেন, "আমি ছেলেগুলি ও গাভী দুটিকে লইয়া ভুলিয়া আছি।" আমাদের শয়ন ঘর, রন্ধনশালা, গোশালা, প্রাচীর, সদর ঘর প্রতি বৎসর খড় দিয়া ছাওয়াইতে হইত, ইহাতেও খরচ অল্প হইত না। তখন চাষের খড়ে ঘর ছাওয়ান হইত, এখন টাকা দিয়া খড় কিনিয়া তবে ঘর ছাওয়াইতে হয়।

ক্রমশঃ আমাদের সংসার প্রকৃতই দুঃখের সংসার হইয়া উঠিল। অভাব রাক্ষসী করালবদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিল। ইহার উপর আর একটি প্রাণী আমাদের সংসারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা বলিলেন, "আমি দুঃখে পড়িয়াছি বলিয়া কি বধূটিকে

আনিব না, সুতরাং আমার স্ত্রী বসন্তকুমারী এখন আমাদের গৃহে আনীত হইলেন।

দুঃখ দুর্দ্দশার ভিতর দিয়া আমাদের আরও এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। ক্রমশঃ মায়ের দুঃখ কষ্ট আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি যে এখন কি করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইহাই আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতাম। ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলাম, মায়ের দুই চারিখানি যাহা অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় ও বন্ধক পড়িয়াছে। আমি সর্ব্বদাই ভাবিতাম, কিরূপে অর্থ উপার্জ্জন হয়। অর্থোপার্জ্জনের একমাত্র পন্থা চাকরি, কিন্তু চাকরি পাইব কোথা? কেই বা আমাকে চাকরি করিয়া দিবে? চাকরি করিতে গেলে লেখাপড়া জানা চাই, সে পক্ষে আমি সরস্বতীর কৃপা দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত বলিলেও হয়। পিতৃদেবের সর্ব্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি ও সহস্র চেষ্টার ভিতর যেটুকু শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সেরূপ পিতা যদি না পাইতাম, তবে আমাকে একটি প্রকাণ্ড গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকিতে হইত। পিতার শ্মশান অগ্নির সঙ্গে স্কুলের পুস্তকগুলিও বিসর্জ্জন দিয়া এখন আমি বেকার অবস্থায় বসিয়া আছি। বিদ্যা গ্রাম্য মধ্য ইংরাজী স্কুলের প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত। আমার বাঙ্গালা খপরের কাগজ পড়া একটা নেশার মধ্যে ছিল। বাল্যকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত সেই নেশা অস্থি মজ্জায়

সংশ্লিষ্ট কিন্তু কেবল খপরের কাগজ পড়িলেত চাকরি হইবে না!

ক্রমশঃ আমাদের দিন চলা ভার হইয়া উঠিল। মায়ের বিষাদমাখা মলিন মুখখানি দেখিয়া এই দুঃখের সংসারের ভার বৃদ্ধি করিয়া আমিও বসিয়া আছি কেন? আমি কোথাও যাইয়া চাকরি করিলে আমার নিজের খরচটাও কমিয়া যাইবে। এই সব কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম। কিন্তু "যাই কোথায়" এই কথার মীমাংসা করিতে পারিলাম না। শালিখায় আমার এক পিসতুতা ভাইয়ের বাড়ী ও কারবার ছিল। অনেক দুঃখ কষ্ট জানাইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়া তাঁহার বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি তাঁহার তৈলের কলে আমাকে রাখিয়া দিলেন।

পিতার কত দিনের কত অমূল্য উপদেশ হেলায় শুনিয়াও শুনিতাম না। আমার এই প্রথম চাকরির দিন হইতে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। এতদিন দশটার মধ্যে ভাত না পাইলে সকলের মাথায় লাঠি মারিতে যাইতাম, আজ একটা বাজিয়া গেল, এখনও অন্নজল উদরে পড়িল না। ক্ষুধায় ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। বড় বড় কয় ফোঁটা অশ্রু বক্ষঃস্থলে আসিয়া পড়িল। জঠরানলের প্রতি বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিলাম, জননী

ও ভাই ভগ্নিগুলির কষ্টের জন্য চাকরি করিতে আসিয়াছি, তুমি আমার শত্রুতা করিতেছ কেন? দাদার তৈলের কল হইতে তাঁহার বাড়ী এক মাইলের অধিক। প্রত্যহ দিবা একটার পর ও রাত্রি নয়টার পর আমাকে আহার করিতে যাইতে হইত। রাত্রে আহার করিয়া কলে আসিতে আমার যে কষ্ট হইত তাহা লিখিলে বুঝিতে পারিবে না। ভুক্তভোগী ব্যতীত এ কষ্ট কাহার হৃদয়ঙ্গম হইবে না। যাহার সন্ধ্যার পর আহার করিয়া কোমল শয্যায় নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস, সে কি একবারে এত কষ্ট সহ্য করিতে পারে? এক একদিন রাত্রে আসিতে আসিতে নিদ্রাবশে রাজপথেই ঢুলিতে ঢুলিতে পড়িয়া যাইতাম।

সকল কষ্টই ক্রমশঃ সহ্য করিয়া লইলাম। কিন্তু একটা কষ্ট আমার দিন দিন অসহ্য হইয়া উঠিল। আমার মা ও ছোট ভাইটির জন্য প্রাণ সর্ব্বদা হু হু করিতে লাগিল। মাকে ও ভাইটিকে ছাড়িয়া কখন কোথাও তিনদিন থাকি না, শালিখায় অতি কষ্টে দুইমাস কাটাইলাম। প্রত্যহ ছোট ভাইটিকে ও মাকে স্বপ্ন দেখিতাম। রাত্রে যতক্ষণ না নিদ্রা আসিত, নয়নাশ্রুতে উপাধান সিক্ত হইয়া যাইত। দাদা আসিয়া এক একদিন অশ্রুসিক্ত উপাধান দেখিয়া বলিতেন, "তোমার স্বেদে বালিশটা মাটি

হইয়া গেল।" আমি ভয়ে প্রত্যহ বালিশটা রৌদ্রে শুখা-ইয়া রাখিতাম। এইরূপ কষ্টের মধ্য দিয়া আরও একমাস অতীত হইল। মা ও ভাইটির জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া এবং সাংসারিক চিন্তায় এখন আমার অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর পেটের পীড়ায় আমি আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম। আমি প্রবল ক্ষুধায় যেরূপ অল্প পরিমাণে আহার করিতাম, তাহাতে আমার পেটের পীড়ার আদৌ সম্ভাবনা ছিল না। অনেকগুলি কারণ একত্রিত হওয়াতে আমার পেটের পীড়ার উৎপত্তি হইল। প্রথম কারণ—অহরহঃ চিন্তা। দ্বিতীয় কারণ—অনিদ্রা, ভাবিতে ভাবিতে রাত্রে ভাল নিদ্রা হইত না। তৃতীয় কারণ—অধিকাংশ দিন আমাকে বেলা দশটার সময়ে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন রাত্রি দশটার আহার করিতে হইত; দাদার বাড়ীতে রাত্রে অন্নের পরিবর্ত্তে রুটি ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। আমার জন্য প্রায় নিত্যই প্রাতের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ঢাকা দেওয়া থাকিত। কোন কোন দিন রুটি তরকারি দিতেন। দাদা একদিন আমার কাছেই বৌ-ঠাকুরুণকে বলিয়া দিলেন, আমি পাড়া-গাঁ থেকে প্রথম কলিকাতায় গিয়াছি; প্রত্যহ রুটি খাওয়া ভাল নয়।

দিন দিন আমার পেটের পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দাদাও পূর্ব্ব হইতে আমার উপর বিরক্ত ছিলেন, কারণ

আমি কলের কাজ কর্ম্ম কিছুই বুঝিতাম না। একদিন দাদা বলিলেন, "তোমার কলিকাতার জল বায়ু সহ্য হইবে না, দেশে চলিয়া যাও।" দাদার কথা শুনিয়া হর্ষ বিষাদে কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। আমার চাকরি যাওয়া দুঃখের কারণ হইলেও মায়ের কাছে যাইতে পারিব, ইহাতে আহ্লাদও অল্প হইল না। আমি তিন মাস চাকরিতে ছিলাম, দাদা মাসিক চারি টাকা হিসাবে বার টাকা বেতন চুকাইয়া দিয়া বিদায় দিলেন। বারটি টাকা হাতে পাইয়া বড়ই আহ্লাদ হইল। আমার প্রথম চাকরির টাকা মায়ের হাতে যাইয়া দিব, মা কতই খুসী হইবেন, এই সব ভাবিতে ভাবিতে দাদার কল ত্যাগ করিলাম। গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, আমার কাছে পাঁচটি মাত্র টাকা আছে। ভাই ভগ্নিদের জন্য এবং সংসারের মসলা ও বস্ত্রাদি কিনিতে সাত টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। টাকা পাঁচটি বস্ত্রে বন্ধন করিয়া কত কি ভাবিতেছি, এমন সময় গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমার জীবনের প্রথম চাকরি এইখানেই শেষ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর চারি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের সংসারের অবস্থা শুনিলে সকলেরই চক্ষু দিয়া জল পড়িবে। কপর্দ্দকের সংস্থান নাই যে, আর একদিন চলিতে পারে। ইহার উপর ঋণ-জালে জড়িত। আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য জননী যেরূপ সংসারে কঠোর পরিশ্রম করেন, তাহা শুনিলে অনেকেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন না। হায়! অপত্য স্নেহ কি অসাধারণ! রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া জননী গাভী দুটির পরিচর্য্যা করিতেন। গোশালায় গোময়গুলি একত্রিত করিয়া পরদিন রন্ধনের জন্য দেওয়ালে ঘুঁটে দিতেন। প্রভাতের পূর্ব্বেই মায়ের গৃহকার্য্য সমস্তই শেষ হইয়া যাইত। অধিকাংশ দিনই পয়সার অভাবে আমাদের বাজার হইত না। পুষ্করিণী হইতে নিত্য শুষনি, কল্মি, হিঞ্চা শাক ইত্যাদি তুলিয়া মাতাঠাকুরাণীকে ব্যঞ্জনের আয়োজন করিতে হইত। এইরূপে অতি কষ্টে চাউল ও ব্যঞ্জনাদির আয়োজন করিয়া রন্ধন করিতে দিবা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া যাইত।

আমাকে ও ভাই ভগ্নিগুলিকে আহার করাইয়া জননী দেবগৃহে প্রবেশ করিতেন। জননীর পূজা আহ্নিক করিতে কোন কোন দিন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া যাইত। জননী তৃতীয় প্রহরের ক্ষুৎপিপাসায় কাতরকণ্ঠে সাংসারিক তীব্র অভাব-দুঃখানল বুকে লইয়া যখন করযোড়ে নিমীলিত নেত্রে পুত্র কন্যাগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন, তখন তাঁহার নয়নযুগল দিয়া জাহ্নবী স্রোতের ন্যায় অশ্রুবারি নির্গত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিত। পুত্র-কন্যাদের দুঃখ দুর্দ্দশা অপনোদনের জন্য তাঁহার সেই ঐকান্তিক আকুল প্রার্থনার কথা মনে পড়িলে মনে হয় জননী ব্যতীত ভগবৎ সমীপে এরূপ আকুল প্রার্থনা আর কাহার করিবার শক্তি নাই।

এই চারি বৎসরকাল আমি যে বিনা চেষ্টায় গৃহে বসিয়া জননীর ও ভাই ভগ্নিগুলির দুঃখ কষ্ট দেখিতেছি, এরূপ যেন কেহ মনে করিবেন না। আমার চেষ্টার ত্রুটি নাই, কিসে চাকরি হইবে, দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া জননী ও ভাই ভগ্নিগুলির কিরূপে কষ্ট নিবারণ করিব, এই চেষ্টা আমি সর্ব্বক্ষণই করিতেছি। সমুদ্রস্রোতে তৃণ-খণ্ডের ন্যায় আমার সমস্ত চেষ্টা দুরদৃষ্টের মধ্য দিয়া কোথায় উধাও হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। এই বিপদ-সাগরে সহস্র চেষ্টা করিয়াও আমি একটু কুল পাইতেছি

না। অনেক সাধ্য সাধনা, অনুনয়, বিনয়, তোষামোদ করিয়া কলিকাতার কোন স্থানে যদি একটি চাকরি পাই, সে চাকরি দুই এক মাসের অধিক স্থায়ী হয় না। কোন না, কোন কারণে আমার চাকরিতে জবাব হইয়া যায়।

আমাদের গ্রামের অনতিদূরে সালনপুরের গোপাল আচার্য্য আমাদের গ্রামে আসিলেই মা আমায় কুষ্ঠি দেখাইতে বলিতেন। মায়ের অপেক্ষা গোপাল আচার্য্যকে কুষ্ঠি দেখাইবার নেশা আমার অধিক ছিল। গোপাল আচার্য্য আসিয়াছে খবর পাইলেই ঠিকুজির তাড়াটি বগলে লইয়া ছুটিতাম। দুঃখের বিষয়, আমার ত্রয়োদশ বৎসরের সময় যে রাহুরদশা ধরিয়াছিল, সে রাহু আর ত্যাগ করিতেছে না। মা এক একদিন অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গোপাল আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "বাবা গোপাল! সাতকড়ির রাহুর দশা আরও কতদিন থাকিবে?" আচার্য্য মহাশয় বলিতেন, "খুড়ি মা! রাহুর চৌদ্দবর্ষ কাল ভোগ, রাহুর দশায় অনেক কষ্ট হইবে।" "ইহাপেক্ষা ছেলের আরও দুঃখ কষ্ট হইবে বাবা!" মা এই কথা বলিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িতেন। মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইত, ঠিকুজীগুলি হাতে লইয়া অন্তরালে যাইয়া বলিতাম, "ভগবান আমায় আর কত কষ্ট দিবেন?"

চারি বৎসরের মধ্যে আমি কলিকাতায় বোধ হয় বিংশতিবার চাকরির চেষ্টায় আসিয়াছি। কিন্তু চারিবার ব্যতীত প্রত্যেকবারই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছি। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া গেলে গ্রামের অধিকাংশ লোকই আমায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। কেহ বলিত, লেখাপড়া কি জানে যে, চাকরি হইবে!" একথা সম্পূর্ণ সত্য হইলেও আমার বড়ই দুঃখ হইত। কেহ বলিত, "ছোঁড়াটা স্ত্রীকে ছাড়িয়া বিদেশে থাকিতে পারে না।" কেহ বলিত, "বোধ হয় উহাকে কেহ বিশ্বাস করিয়া চাকরি দিতে চায় না।" গরীব দেখিয়া আমাকে অনেকেই অনেক কথা বলিত, এই সব কথা শুনিয়া দুঃখ ও রাগ হইলেও কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতাম না। স্ত্রীর ভালবাসার জন্যই যে আমি কলিকাতায় থাকিতে পারি না, অধিকাংশ লোকই একমত হইয়া এই কথা বলিত। ইহাদিগকে দোষ দিই না! প্রকৃতই আমি বসন্তকুমারীকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতাম। এক একবার আমি ভাবিতাম, গরীব হইলে কি স্ত্রীকে ভালবাসিতে নাই? স্ত্রীকে ভালবাসিয়া আমি কি বড়ই অন্যায় কার্য্য করিতেছি?

সংসারের অভাব ও দুঃখ দরিদ্রতার' নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ ত্রাহি ত্রাহি রব করিলেও তিনটি কারণে আমার সংসারে সুখ ছিল। এই সুখটুকু ছিল

বলিয়াই কলিকাতায় রোগে প্রপীড়িত হইলে সুখের আশায় গৃহের দিকে ছুটিতাম।

আমার সংসারের প্রথম সুখ—স্নেহময়ী জগদ্ধাত্রী-রূপিণী জননী। আমার মায়ের মত মা জগতে আর কাহার আছে? আমার জননী সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি, স্নেহের প্রস্রবণ, দয়ার আধার! আমার জননী পুত্র কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া সংসারে যে কষ্ট, যে শোক-জ্বালা সহ্য করিয়া গিয়াছেন, তিনি যদি পাষাণময়ী হইতেন, তাহা হইলেও অসহনীয় দুঃখ কষ্টে তাঁহার বক্ষঃস্থল ফাটিয়া যাইত। আমার জননী অকাতরে যে দুঃখ-জ্বালা সহিয়া গিয়াছেন, তিনি যদি মানবী হইতেন, তবে এত দুঃখ সহিতে পারিতেন না। আমার জননী প্রকৃতই দেবী ছিলেন।

এত কষ্টের মধ্যেও আমার দ্বিতীয় সুখ—প্রাণের অনুজ! সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী লক্ষ্মণের ন্যায় কনিষ্ঠের মুখ দেখিয়া, অসহ্য দুঃখ-দাহনে জ্বলিয়া পুড়িয়াও, আমি সুখী হইতাম। এই দুঃখের সংসারে ভাই আমার অর্দ্ধ-অঙ্গরূপে সর্ব্বক্ষণ ছায়ার ন্যায় সঙ্গে থাকিত। আমিও ভ্রাতার মুখ দেখিয়া সকল কষ্ট ভুলিয়া যাইতাম। এই ভ্রাতার অদর্শনে কলিকাতা-বাসকে আমি দ্বীপান্তর বাসের ন্যায় মনে করিতাম। তৃতীয় সুখ ছিল—সহধর্ম্মিণী বসন্ত-

কুমারী! তাহার জীবনে কখন একখানি অলঙ্কার বা ভাল বস্ত্র হতভাগ্য স্বামী কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় নাই, কিন্তু সদাই হাস্যময়ী। তাহার অদৃষ্ট মন্দ ছিল বটে কিন্তু তাহার স্বামীভক্তি ও ভালবাসা সংসারে অতুলনীয়।

আমার প্রথম চাকরি শালিখায় দাদার কলে। ইহা আপনারা জানিলেও অবশিষ্ট চারি বৎসরের চাকরির কথা না বলিলে জীবনের সকল কথা বলা হইবে না। আমাদের গ্রামের দীননাথ রায় একজন পরোপকারী লোক ছিলেন। গ্রামের বহুলোককে, এমন কি, অনেক মূর্খকেও তিনি চাকরি করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাকেও প্রথমে রাধা-বাজারের একটি কাগজের দোকানে বাহির করেন, পরে একটি প্রেসে কাজ করিয়া দেন, তৃতীয়বার—কোন এক মাসিক পত্রিকা অফিসে চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন। এই চাকরি কোনবারই দুই তিন মাসের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। কোনবার জ্বর সর্দ্দি ও পেটের পীড়ার জন্য, কোনবারে কার্য্যে অনুপযুক্ততা হেতু আমার চাকরি গিয়াছিল। দুঃখ ও অভাবের কশাঘাতে আমি প্রাণের দায়ে চাকরি করিতে আসিতাম বটে, কিন্তু আমার চাকরি করিবার আন্তরিক ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি ছিল না। আমার চাকরির প্রতি আন্তরিক যত্ন থাকিলে নিশ্চয়ই এত শীঘ্র চাকরি যাইত না। সংসারে মাতার দুঃসহ যন্ত্রণা,

অন্নাভাব, তবুও জানি না, কেন পরাধীনতাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করিতাম। চাকরির জন্য যেরূপ লালাইত ছিলাম, পরাধীনতা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্যও তদ্রূপ লালাইত থাকিতাম। চাকরি গেলে অসুখী হইয়া ভুবন অন্ধকার দেখিতাম বটে কিন্তু স্বাধীন হৃদয় লইয়া মাতা, স্ত্রী ও ভাইভগ্নির সঙ্গে যে দুঃখের সংসারে মিলিত হইব, ইহাতে আনন্দও অল্প হইত না।

বাল্যকাল হইতে কখন কাহার কথা সহ্য করিতে পারি না, চাকরিতে প্রবৃত্ত হইয়া কাহার একটা কটূ কথা শুনিলে চক্ষু দিয়া জল আসিত। চাকরিতে প্রবেশ করিয়া ভাবিতাম, "যে কয়মাস এখানে চলে, ইহাই পরমলাভ।" চাকুরির ইহাই আমার মূলমন্ত্র ছিল। আমি যে লাইনে প্রবেশ করিয়াছি, সে লাইনের কার্য্য শিক্ষা করিয়া উন্নতি করিতে কখন প্রয়াস পাই নাই। চাকরি করিয়া আমি উন্নতিলাভ করিব, এ চিন্তা কখন আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কে যেন সর্ব্বক্ষণ আমার কর্ণকুহরে চুপি চুপি বলিয়া দিত, "চাকরি তোমার জীবনে কখন স্থায়ী হইবে না, চাকরি করিয়া পার্থিব সুখ-সৌভাগ্য লাভ করিবে এ চিন্তা কখন মনে স্থান দিও না।"

কলিকাতার এই চাকরি ব্যতীত দুইবার আসাম অঞ্চলে গিয়া আমি চাকরিতে প্রবৃত্ত হই। প্রথম আমার

খুল্লতাত ভ্রাতার নিকট যাইয়া "সামাগুড়ি" নামক স্থানে তাঁহার কারবারের ভার প্রাপ্ত হই। তিনি আমাকে অতি স্নেহ ও যত্নের সহিতই রাখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ সেখানেও আমি ছয় মাসের অধিককাল থাকিতে পারি নাই। এখানে জননী অপেক্ষা আমার ছোট ভাইটির জন্যই প্রাণ সর্ব্বদা হু হু করিত। জানি না, কেন তাহার অমঙ্গল চিন্তায় সর্ব্বদাই আমার প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিত। যাঁহারা অধিক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় ইহার কারণ বলিতে পারেন। আমি মনে করিতাম, অধিক স্নেহ করি বলিয়াই বোধ হয় সর্ব্বদা ভ্রাতার অমঙ্গল আশঙ্কা মনে উদিত হইত। ভ্রাতার জলে ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কাই আমার হৃদয়ে অধিক হইত। আমি যখন আসামে যাই, তখন বর্ষাকাল। আমাদের গ্রাম তখন দামোদরের বন্যায় ডুবিয়া আছে। আমার ভ্রাতার বয়স তখন দশ বৎসরের অধিক হইবে না। এই বয়সেই কনিষ্ঠ সংসারে জননীর অনেক কার্য্যে সাহায্য করিত। আমাদের গ্রামে বাজার নাই। প্রায় একমাইল দূরে রশুলপুর গ্রামে সপ্তাহে দুইদিন শনি ও মঙ্গলবারে হাট হইয়া থাকে। আমার কনিষ্ঠ এই বয়সেই একজন পাকা বাজার-সরকার হইয়া উঠিয়াছিল। মা যদি কাহার নিকট কর্জ্জ করিয়া কনিষ্ঠের হাতে দুই আনার পয়সা দিয়া

হাটে পাঠাইতেন, কনিষ্ঠ দরকার মত জিনিষ আনিয়া দুই পয়সা ফেরত দিত। বর্ষাকালে আসাম যাইবার সময় মাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিয়াছিলাম, "মা, ভাইকে হাটে পাঠাইও না।" মা বলিলেন, "বাবা! বর্ষাকালে এক দিনও হাটে পাঠাইব না, সেজন্য তুমি চিন্তা করিও না।" আমি আসামে গিয়া অহরহঃ ভাবিতাম, কনিষ্ঠ বুঝি হাটে যাইতে যাইতে জলে ডুবিয়া গিয়াছে। আমি আসামে থাকিতে আমার এক বাল্যবন্ধুর প্রত্যহ লিপি পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতাম। বন্ধুর পত্র পাঠে আমার হৃদয়ের দুঃখভার অনেক লাঘব হইত। এই বন্ধুর পরিচয় পরে দিব।

"যদি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।"
"আছে কাজ ত সকাল সাজ।"

অর্থাৎ যেখানেই যাও, অদৃষ্ট তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছে। যে কাজ করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নে সম্পন্ন করিয়া না রাখিলে পরে অনেক বেগ পাইতে হয়, হয়ত সেই কার্য্য সমাধা হইয়াই উঠে না। আমার পিতার এই দুটি মহামূল্য বাক্য সর্ব্বক্ষণ আমার হৃদয়ে জাগরুক আছে, কখন তাহার ব্যত্যয় হইতে দেখি নাই; জীবনের এই শেষ সীমায় আসিয়াও পদে পদে এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছি। আমি যদিও জননী ও ভাই ভগ্নী-

গুলির দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য আসাম গিয়াছিলাম, কিন্তু দুরদৃষ্ট আমাকে ত্যাগ করে নাই। আসাম হইতে আসিবার সময় আমার জ্যেষ্ঠতাত-ভ্রাতা আমাকে যে টাকাগুলি দিয়াছিলেন এবং আমার সঙ্গে জামা ও বস্ত্রাদি মূল্যবান জিনিষ যাহা ছিল, গৌহাটি আসিয়া জাহাজে সমস্তই তাহা চুরি হইয়া গেল। আমি শূন্যহস্তে গৃহে আসিয়া উপস্থিত। ছয় মাসের পর মা আমাকে দেখিয়া যেন লক্ষমুদ্রা কুড়াইয়া পাইলেন। আমার স্ত্রীর দুইটি মাকড়ি বন্ধক দিয়া নিত্য আমাকে মনের আনন্দে উপাদেয় অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। আমার আসামের চাকরি এইখানেই শেষ হইয়া গেল।

সংসারের দুরাবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইল। এখন আর জিনিষ বন্ধক ব্যতীত কর্জ্জও কোথাও মিলিতেছে না। অলঙ্কার যাহা ছিল তাহা ইতিপূর্ব্বেই বন্ধক ও বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। বহু চেষ্টাতেও আর কলিকাতায় চাকরি মিলিতেছে না। একদিকে সংসারের এই শোচনীয় অবস্থা, অন্যদিকে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী চারুবালাকে লইয়া আমরা বিব্রত হইয়া পড়িলাম। চারুবালার বয়স একাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে চলিল, এপর্য্যন্ত কোথাও তাহার সম্বন্ধ স্থির হইল না। পাত্রের অনুসন্ধান করিয়াই বা কি করিব, অর্থ না হইলে কিরূপেই বা বিবাহ হইবে? কন্যার

বিবাহের চিন্তায় মায়ের এখন আর আহার নিদ্রা নাই। অশ্রুপাতেই মাতার এখন দিনযামিনী অতিবাহিত হইতেছে। ক্রমশঃ কন্যার চিন্তায় মায়ের অস্থিচর্ম্মসার হইয়া উঠিল। মায়ের অবস্থা দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেরূপেই হউক, ভগ্নীটীর বিবাহ দিব। হস্তে এক কপর্দ্দকও সম্বল নাই, ভগবানকে স্মরণ করিয়া পাত্র দেখিতে বাহির হইলাম। নানাস্থানে পাত্র দেখিলাম, পাত্রও পছন্দ হইল, কিন্তু অর্থাভাববশতঃ সকল সম্বন্ধই ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। আমরা কুলীন না হইলেও খাঁটী বংশজ, যেখানে সেখানে ভগ্নীর বিবাহ দিতে পারি না। টাকার অভাবে ভাল ঘরও মিলিতেছে না, আমরা মাতা পুত্রে অকূল সাগরে পড়িয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। আমার খুল্লতাত ভ্রাতা ও জ্ঞাতি ভ্রাতাদের অবস্থা খুব স্বচ্ছল, আমাদের পাড়ার মধ্যে ইহাঁরাই এখন বড়লোক। বড়লোক জ্ঞাতিদের পার্শ্বে আমরা অতি দীন-হীন অবস্থায় বাস করিতেছি। আমি যখন ভগ্নিটিকে লইয়া অকূলপাথারে ভাসিতেছি, তখন এক ধনী জ্ঞাতি ভ্রাতা আমাকে নানারূপ সৎযুক্তি দেখাইয়া বলিলেন যে, অর্থাভাবে যখন কন্যাটির ভালঘরে বিবাহ দিতেই পারিতেছ না, তখন কিছু টাকা লইয়া নিকৃষ্ট ঘরেই ভগ্নীর বিবাহ দেওয়া উচিত। মানুষ জলমগ্ন

হইলে যেমন একগাছি তৃণকে ধরিয়াও বাঁচিবার চেষ্টা করে, আমার জননীও এই জ্ঞাতি ভ্রাতার কথা শুনিয়া একটু আশ্বস্ত হইলেন। আমার কিন্তু এই সৎযুক্তি বজ্রাঘাতের ন্যায় হৃদয়ে বাজিল। আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়াই এরূপ সৎযুক্তি প্রদান করিলেন কি না জানি না, কিন্তু কথা শুনিয়া আমার প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। আমি দীন, দরিদ্র, অক্ষম বলিয়া কি পিতৃদেবকে নিরয়গামী করিব? জীবন থাকিতে তাহা পারিব না। ভগ্নিটির বিবাহের জন্য প্রত্যহ পিতাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতাম, ভগবানের চরণে বিপদ উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতাম।

আমার আকুল ক্রন্দনে ও জননীর নিত্য ব্যাকুল প্রার্থনায় ভগবানের বুঝি দয়া হইল। অতি অল্পব্যয়েই একটি সৎপাত্রের সহিত আমার ভগ্নীর বিবাহ হইয়া গেল। আমার স্ত্রী বসন্তকুমারীর একছড়া সোণার চিক আমার জ্ঞাতিদের নিকট অল্প টাকাতেই বন্ধক ছিল, তাঁহাদের নিকট হইতে আরও কিছু টাকা লইলাম, সেই টাকাতেই আমার ভগ্নীর বিবাহ হইয়া গেল। যে দিন বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত চারুবালার বিবাহ হইল, সে দিন মায়ের আনন্দ রাখিবার স্থান ছিল না, আমিও যেন নূতন জীবন প্রাপ্ত হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চারুবালার বিবাহের পর একজন বন্ধুর অনুগ্রহে সিরাজগঞ্জে একটি চাকরি পাইয়াছিলাম। যাহার কুগ্রহ সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে, গোপাল আচার্য্যের প্রবল প্রতাপ রাহুগ্রহ যাহার স্কন্ধে বসিয়া আছে, তাহার কি কখন চাকরি স্থায়ী হইতে পারে? কয়েক মাসের পর সেখানেও আমার চাকরির জবাব হইয়া গেল। "যথা পূর্ব্বং তথা পরং।" আবার আমি গলগ্রহরূপে মায়ের দুঃখের সংসারে প্রবেশ করিলাম। মা এখন আর আমার সে মা নাই! শোক, দুঃখ, অভাব, অনাহার, অনিদ্রায় সেই পূর্ব্বের মা বলিয়া এখন আর মাকে চিনিবার উপায় নাই। হায়! পূর্ব্বের মায়ের সঙ্গে এখনকার এই মায়ের আকাশ পাতাল প্রভেদ! আমার পূর্ব্বের মা পিতার সংসারে অন্নপূর্ণা-রূপিণী হইয়া অকাতরে সকলকে অন্নব্যঞ্জন বিতরণ করিতেন, এখনকার মা নিজ পুত্র কন্যার উদর পূরণের জন্য কাঙ্গালিনী। আমার পূর্ব্বের জননী দীন, দুঃখী নিঃস্ব প্রতিবাসীকে পরিধেয় বস্ত্রাদি বিতরণ করিয়া তাহাদের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন; এখনকার জননী মলিনবেশা,

নিজ পুত্র কন্যার একখানি পরিধেয় বস্ত্রের জন্য কাতরা! আমার পূর্ব্বের গর্ভধারিণী যথার্থই জগদ্ধাত্রী প্রতিমার ন্যায় বাবার সংসারে বিরাজ করিতেন; আর আমার এখনকার গর্ভধারিণী জীর্ণা, শীর্ণা, ছিন্ন মলিন বসন পরিধানা শোক-বিহ্বলা! এই দৈন্য, অভাব ও অন্নকষ্টের ভিতরেও আমার মা ভীষণ শোক পাইয়াছেন, সে শোক আমার ভগ্নী রাখাল দাসীর শোচনীয় মৃত্যুজনিত! আমার ভগ্নীপতি, রাখাল দাসীর স্বামী, বিবাহের কিছুদিন পরেই বিদেশে চাকরি করিতে চলিয়া যান। পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমার ভগ্নীর কোন সংবাদই লইলেন না। আমাদের এই দুঃখের সংসারে ভগ্নিটিকেও প্রতিপালন করিতে হইতেছিল। আমার জন্মগ্রহণের পরেই আমার এই ভগ্নিটি জন্মগ্রহণ করে, এজন্য এই ভগ্নিটিও পিতার বড়ই আদরের ছিল। ভগ্নিটি বড়ই অভিমানিনী, আমাদের সঙ্গে দুঃখ-সাগরে ভাসিতে থাকিলেও কাহার একটী রূঢ় কথা কখন সহ্য করিতে পারিত না। আমার মা বিরক্ত হইয়া ভগ্নিটিকে যদি কখন কিছু বলিতেন, তবে সে দিন তাহার চক্ষের জলধারার বিরাম হইত না। ভগ্নিটি আমার এক বৎসরের ছোট ছিল বলিয়া আমাদের উভয়ে প্রায়ই ঝগড়া হইত। ঝগড়া হইলেও রাখালদাসীকে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসিতাম। এখনও সেই স্নেহের স্মৃতি-

টুকু অন্তর হইতে মুছিতে পারি নাই। এখনও ভগ্নী রাখালদাসীর স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া যাতনা প্রদান করে। আমার ভগ্নীপতি ষোড়শবর্ষীয়া পত্নীর কোনই সংবাদ লইত না, এজন্য রাখালদাসী সর্ব্বদাই বিমর্ষভাবে কাল-যাপন করিত। আমাদের গলগ্রহ হইয়া থাকাতে তিলার্দ্ধের জন্যও তাহার মনে শান্তি ছিল না। "কি করিয়া সংসার চলিবে" এই বলিয়া মা যখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেন, মায়ের চক্ষু দুটি যখন জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত, তখন রাখালদাসীও অনিমেষনয়নে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। রাখালদাসী মনে মনে ভাবিত, "হায়! মায়ের গলগ্রহ হইয়া মাকে ও দাদাকে কষ্টের উপর কষ্ট দিতেছি; এই দুঃখের জীবন আমার আর না রাখাই ভাল। আরও কতকাল মায়ের ও দাদার এরূপে গলগ্রহ হইয়া থাকিব? আমার রক্ষাকর্ত্তা,—গুরু,—দেবতা,—স্বামী যাহার খোঁজ লন না, তাহার আর জীবনে ফল কি?"

আমার ভগ্নী প্রকৃতই একদিন "সালুক গেড়ের" অতল জলে নিজ জীবন পরিত্যাগ করিল। রাখাল দাসীকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া আমি চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, মা পাগলিনীর ন্যায় চারিদিকে ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেখিলাম, সোনার প্রতিমা জলে ভাসিতেছে! অকালে বিজয়ার বাজনা বাজিয়া উঠিল!

মা তাঁহার নাড়ী-ছেঁড়াধনকে জলে ভাসিতে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। হা ভগবান! তোমার যে কি মঙ্গল বিধান জগতে কার্য্য করিতেছে, কিসে কি হইতেছে, তাহা আমরা ক্ষুদ্র মানব, ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া কিরূপে এই রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিব! বুঝিতে পারি না জগত-পাতা! দুঃখীই দুঃখ পায় কেন? বিপদই বিপন্নের অনুগামী কেন? যাহারা সংসারতাপে তাপিত, জীর্ণ শীর্ণ দেহ লইয়া জগতে বিচরণ করে, উপর্য্যুপরি অভাব দুঃখ তাহাদিগকেই গ্রাস করিতে আসে কেন? যাহারা এজগতে কত মিথ্যা, কত প্রবঞ্চনা, অধর্ম্ম ও শত শত কুকর্ম্ম করিতেছে, তাহারা ত বেশ সুখে আছে, আর যাহারা অভাব দুঃখের ভিতর অহোরাত্র পরিত্রাহিরবে ভগবানের নিকট দুঃখ দৈন্য দূর করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে, তাহাদেরই মস্তকে বজ্রপতন হয় কেন? আমার মা কখন কাহার ভাল ব্যতীত মন্দ করেন নাই, উপকার ব্যতীত অপকার করেন নাই, মিথ্যার ছায়া কখন মাকে স্পর্শ করে নাই, কখন মা কাহাকেও একটি উচ্চ কথা বলিয়া প্রাণে যাতনা দেন নাই। মা সর্ব্বক্ষণ ইষ্টমন্ত্র পূজা ধ্যান লইয়াই আছেন। আমার জননীর সংসারে কেহই শত্রু নাই, কাহার সহিত যদি কখন কোন অনিবার্য্য কারণে কথান্তর হইয়া মনান্তর ঘটিত, তবে মা যতক্ষণ না তাহাকে মিষ্ট

কথায় সান্ত্বনা করিতেন, ততক্ষণ তাঁহার প্রাণে শান্তি হইত না, অন্ন জল মুখে দিতেন না! তবে মায়ের আজ কেন এই হৃদয়-বিদারক যন্ত্রণা! এ শোক-শেল কেন মায়ের হৃদয় ভেদ করিয়া অন্তস্তলে প্রবেশ করিল? হৃদয়ের এই ভীষণ ক্ষত মায়ের এ জীবনে আর শুখাইবে না! নিরপরাধিনী দীনা মায়ের শুষ্ক হৃদয়ে কে এরূপ শাণিত ছুরিকা বসাইয়া দিল? তবে কি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে জননীর এই দুর্দ্দশা হইতেছে? যদি প্রকৃত তাহা হয়, তবে কর্ম্মফল তোমার কি অসীম শক্তি! তোমার কি সহিষ্ণুতা! জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া লোকের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, তোমার কি বিরাম নাই— বিশ্রাম নাই? হায় কর্ম্মফল! তুমি কি অমর? তোমার কি মৃত্যু নাই? তোমার কি শক্তির ক্ষয় নাই? তুমি অমর, ক্ষমতাশালী হও, কিন্তু তোমার দেহে কি দয়ামায়া নাই? দীনা হীনা কাতরা জননীর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া এই অসহ্য যন্ত্রণা দিতেছ? বুঝিয়াছি কর্ম্মফল! তোমার শক্তি অসীম—অনন্ত! দেবতারাও তোমার দুর্জ্জয় শক্তির নিকট পরাজিত। তোমার সূক্ষ্ম সমষ্টিই মানবের সঙ্গে অদৃষ্টরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের নর-নারীকে দুঃখ বা সুখ প্রদান করিয়া থাকে। কর্ম্মফল! তোমার হস্ত হইতে মানবের পরিত্রাণের উপায় নাই।

কর্ম্মফল খণ্ডন করিতে মানবের কেন, দেবতারও সাধ্য নাই। মানব আমার জননীর যাতনা দেখিয়া তোমরাও সাবধান হও। সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাল বা মন্দ কার্য্য যাহা কিছু করিতেছ, ইহার ফলাফল কর্ম্মফলরূপে সঞ্চিত হইতেছে। এই কার্য্যের ফলভোগ তিল প্রমাণেও ব্যর্থ হইবার নয়। এমন কি, সু বা কু-কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিলেও মনে মনে কু বা সু-কার্য্যে যাহা চিন্তা করিতেছ, তাহারও ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী! কর্ম্মফলাদির ভোগ ভগবানের নির্দ্দিষ্ট অব্যর্থ বিধান। এই যে লক্ষ লক্ষ নর-নারী অন্নাভাবে "হা অন্ন" "হা অন্ন" করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহা কি তাহাদের কর্ম্মফলের নিদর্শন নহে? মানব! এই সমস্ত ঘটনা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও কি জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে না? ঐ যে কলিকাতার পথে শত শত কুষ্ঠরোগী অঙ্গুলিহীন হইয়া বৈশাখের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহাও কি তাহাদের কর্ম্মফলের নিদর্শন নহে? দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, ক্ষীর, সর, ননি, মাখনে কেহ বা দেহ পুষ্ট করিতেছে, কেহ বা একমুষ্টি চাউলের জন্য "হা অন্ন" "হা অন্ন" রবে নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে, ইহা কি পূর্ব্ব-জন্মের অর্জ্জিত কর্ম্মফলের ক্রিয়া প্রকাশ নহে? কেন এমন হয়? পূর্ব্বের বিশেষ কার্য্যশক্তি না থাকিলে ভগ-

বানের রাজ্যে এতটা বৈষম্য থাকিতে পারে না। কর্ম্ম-ফলের অব্যর্থ শক্তি বড়ই ভীষণ! রাজ-রাজ্যেশ্বর হইতে পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র ব্যক্তি, দুগ্ধফেননিভ শয্যাশায়ী কোমলকান্তি যুবাপুরুষ হইতে বৃক্ষতলশায়ী জরাজীর্ণ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই এই কর্ম্মফলের অধীন। এই জন্যই মহা-পুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বক্ষণ সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে না পারিলেও অহোরাত্র সৎচিন্তা যেন হৃদয়ক্ষেত্রে সমুদিত হয়। সর্ব্বক্ষণ মনোমধ্যে সৎচিন্তা উদিত হইলে কালে কখন না কখন সেই চিন্তা কার্য্যে পরিণত হইবে। কার্য্যাপেক্ষা চিন্তার শক্তি ক্ষুদ্র নহে। শীঘ্র বা বিলম্বে চিন্তার ফল হইতে মানব কখন বঞ্চিত হয় না।

রাখাল দাসীর ভীষণ শোকশেল আমার মাতৃহৃদয়ে বিদ্ধ হইবার পর জননী-হৃদয় আর একটি ক্ষুদ্র শোকে জর্জ্জরিত হইয়াছিল। সংসারের দুঃখ-দৈন্য দূর করিবার জন্য আমি যখন সিরাজগঞ্জে চাকরি করিতে যাই, তখন আমার স্ত্রী আসন্ন-প্রসবা। যথাসময়ে আমার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এত শোক দুঃখের উপরেও জননী পৌত্রটিকে ক্রোড়ে পাইয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়া-ছিলেন! গাঢ় অন্ধকারময় অমাবস্যা রজনীতে যেরূপ ক্ষণিক বিদ্যুতের উদয়, দুঃখের দিনে সুখের উদয়ও তদ্রূপ ক্ষণস্থায়ী। দুঃখের দিনে ক্ষণিক সুখের উদয় বিধাতার

কঠোর উপহাস অথবা মানবের তীব্র কর্ম্মফলের প্রতি বিধাতার নিষ্ঠুর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ। আমার জননীর ক্রোড়ে আমাদের দুঃখের চিহ্নস্বরূপ আমার সেই পুত্ররত্নটি তিনমাস নিদ্রা যাইবার পর, একদিন চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল! তিনমাসের শিশু স্ফোটক রোগে আমার জননী, পত্নী ও কনিষ্ঠের অশ্রুপ্রবাহের সহিত কালস্রোতে কোন্ দিকে ভাসিয়া গেল। আমাদের দুঃখের সংসারে বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছা ষোল কলায় পূর্ণ হইল। ভীষণ শোকের উপর এই শিশুটির শোক ক্ষতস্থানে লবণ প্রয়োগের ন্যায় আমার জননী-হৃদয়ে ভীষণ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল। হায় কর্ম্মফল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দুঃখ-দৈন্যপূর্ণ সংসারে আরও কয়েক মাস বসিয়া রহিলাম। এখন যে আমরা কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহার বর্ণনা না করিলেও যাঁহাদিগের হৃদয় আছে, তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমাদের এখনকার শোচনীয় অবস্থা লেখনী-মুখে ব্যক্ত হইবার নহে। কিন্তু হায়! সংসার কি ভীষণ স্থান! মানব-হৃদয় কি নির্ম্মম!—কি কঠোর। আমাদের এই দুরবস্থা অবলোকন করিয়া আমাদের ধনবান জ্ঞাতি-বর্গের কেহ কেহ আমাদের দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া উপহাসের হাসি হাসিত। তাঁহারা বড়, আমরা ছোট; তাঁহারা ধনী, আমরা দরিদ্র,—আমরা অন্নের কাঙ্গাল; তাঁহারা দুইহস্তে সকলকে অন্ন বিতরণ করিতেছেন, তাহাদের দৃষ্টি ও ব্যবহারে এই কথাই বুঝাইয়া দিত। আমি প্রাণে প্রাণে কষ্টানুভব করিলেও জ্ঞাতিদের এই সমস্ত অব্যক্ত ইঙ্গিত-বাক্য জননীকে বুঝাইয়া দিয়া কখন তাঁহার সরল হৃদয়ে ব্যথা দিতাম না।

জননী সকলকেই আপনার ভাবিয়া প্রাণের দুঃখের

কথা তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিতেন। আমি জ্ঞাতি-দের নিকট দুঃখের কথা প্রকাশ করিতে অথবা অনুগ্রহ-প্রার্থী হইতে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম। অনাহারে জীবনত্যাগ করিব, তত্রাচ পরপ্রত্যাশী হইব না, ইহাই আমার জীবনের মূলমন্ত্র। আমার জ্যেষ্ঠতাত ভগ্নী মোক্ষদা-সুন্দরী ভ্রাতৃজায়াকে লুকাইয়া জননীকে অনেক সময় সাহায্য করিতেন। মেজদিদি বাল্যকাল হইতে আমা-দিগকে ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন, এই জন্য আমাদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন। মেজদিদি ভ্রাতৃ-জায়াকে লুকাইয়া কোনদিন লবণ, কোনদিন একটু তৈল, কোনদিন দুটি আলু মাকে দিয়া যাইতেন। এজন্য মেজ-দিদিকে অনেক সময় ভ্রাতৃজায়ার হস্তে তিরস্কৃত হইতে হইত। মেজদিদির এখনকার এই সাহায্য অতি ক্ষুদ্র হইলেও জীবনে আমরা কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না।

কয়েকমাস গৃহে বসিয়া থাকিবার পর, অতিকষ্টে আবার আমার একটি চাকরির জোগাড় হইল। এই চাকরি আমার জীবন মরণের সহিত সংস্পৃষ্ট বলিয়া এ চাকরির কথা জীবনে কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। এই চাকরি নিদারুণ শেল সম চিরদিন আমার বক্ষঃস্থলে বিঁধিয়া থাকিবে। যেদিন আমি কলিকাতায় চাকরি করিতে আসিব, তাহার দুইদিন পূর্ব্ব হইতে জননীর ব্যাকু-

লতার সীমা নাই। মা আমাকে ক্রোড়ের কাছে বসাইয়া অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! তোমাকে বিদেশে পাঠাইবার আমার তিলার্দ্ধ ইচ্ছা নাই। যখনই তুমি কলিকাতায় যাও, একটি না একটি অসুখ লইয়া, অস্থিচর্ম্মসার হইয়া, শুষ্কমুখে গৃহে প্রত্যাগমন কর। বাবা! দেশে থাকিয়া কোন উপায়ে মাসে যদি চারিটি টাকা আমাকে আনিয়া দিতে পারিতে, তাহা হইলে তাহাতেই আমি সংসার চালাইতে পারিতাম। জানি না, কেন তোমাকে এবার কলিকাতা যাইতে দিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।"

মায়ের কথা শুনিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইল। মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলাম, দুঃখের অবস্থায় শরীরটা এত "সুখী" হইল কেন? একটু ঠাণ্ডা লাগিলে—একটু অনিয়ম করিলেই কলিকাতায় অসুখ হইয়া পড়ে। অমনি মায়ের কাছে,—ভাই ভগ্নীর কাছে,—প্রিয়তমা পত্নীর কাছে ছুটিয়া আসি। হা অদৃষ্ট! প্রকাশ্যে মাকে বলিলাম, "মা! এবারে খুব সাবধানে থাকিব, যাহাতে অসুখ না হয় তাহার বিহিত চেষ্টা করিব।" মা তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি আমার মস্তকে অর্পণ করিয়া রোরুদ্যমানা কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! তুমি আমার অনেক কষ্টের ধন! সাতরাজার ধন একদিকে রাখিয়া তোমাকে

একদিকে রাখিলে আমার কাছে তুলনা হয় না! তিনি থাকিতে তোমাকে কখন একটুও কষ্ট দিই নাই। তিনি স্বর্গে গিয়াছেন, আমি জীবিত থাকিয়া তোমাদের কত কষ্টই দেখিতেছি। আর আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও বাঁচিতে ইচ্ছা হয় না।" মায়ের সপ্তসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। বস্ত্রাঞ্চল মুখে দিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। হায় মাতৃস্নেহ!

কলিকাতা আসিবার দুইদিন পূর্ব্ব হইতে মা আমাকে নানারূপ ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। তখন আমি বুঝিতে পারি নাই যে, মা এত পয়সা কোথায় পাইতেছেন; পরে জানিতে পারিলাম, মায়ের হাতে অনেক দিনের একটি সোণার মাদুলি ছিল। সেই মাদুলিতে পঞ্চানন্দের ফুল ছিল, মা প্রত্যহ সেইটি ধুইয়া জল খাইয়া পঞ্চানন্দের নিকট আমাদের দীর্ঘজীবনের প্রার্থনা করিতেন। আমাদের অসুখ হইলেও সেই মাদুলিটি প্রাতে ও সন্ধ্যায় মাথায় বুলাইয়া দিতেন। নিরুপায় হইয়া সেই মাদুলিটি বিক্রয় করিয়া মা আমাকে ব্যঞ্জন খাওয়াইতেছেন। মাকে বলিলাম, "মা, কেন তুমি ঠাকুরের মাদুলিটি বিক্রয় করিলে?" মা বলিলেন, "বাবা! তুমি ব্যঞ্জন ভালবাস, কলিকাতায় কে আর তোমাকে খাওয়াইবে?" আমার চক্ষু দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

বাল্যকাল হইতে আমি একটু বেশী ব্যঞ্জন খাইতে ভালবাসি। এই অভ্যাসটা আমার মায়ের যত্নের ফল। যে ব্যঞ্জনটি ভাল হইত, একবারের পরিবর্ত্তে সেই ব্যঞ্জন তিনবার আমাকে পরিবেশন না করিয়া মা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। আমার মেজদিদি হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "খুড়ি! তোমার সব মেয়েছেলেগুলিইত সমান, তবে বড় ছেলেটিকে অত স্নেহ কর কেন?" মা বলিতেন, "মোক্ষদা! তোমার খুড়া থাকিতে সাতুকে দুই হাতে ভরিয়া কত ভাল জিনিষ খাওয়াইয়াছি। ছেলে এখন কি খাইতে পার না? তাই ভাল জিনিষ একটু হইলে সাতুকে অর্দ্ধেক দিই, অর্দ্ধেক সকলকে খাওয়াই।" মায়ের চক্ষের জল দেখিয়া মেজদিদিরও চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রাত্রি একপ্রহর থাকিতে উঠিয়া মা রন্ধন করিতে-ছেন। বেলা ছয় দণ্ডের সময় শুভ মুহূর্ত্তে কলিকাতা যাত্রা করিব, মায়ের নিদ্রা হইবে কেন? সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ডাল, ব্যঞ্জন, মৎস্যের ঝোল ইত্যাদি রন্ধন হইয়া গেল। দধি, সিদ্ধি, পূর্ণকুম্ভ, পঞ্চদেবতার ফুল, তুলসীতলার মাটি, এই সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়া মা আমাকে আহারে বসাইলেন। মা কাছে বসিয়া না থাকিলে কোন দিনই আমার খাওয়া হইত না। আজ আমাকে আহার করাইয়া

মায়ের তৃপ্তি হইতেছে না। যতদিন কলিকাতায় থাকিব, ততদিনের খাওয়াটা আজ খাওয়াইয়া দিতে পারিলে মা বোধ হয় খুব তৃপ্তিলাভ করিতেন। আমার পেটে তিল মাত্র ধারণের স্থান নাই। আহারান্তে কলিকাতা যাওয়া দূরের কথা, এই গুরু আহারে উদরের ভার বহন করিয়া বোধ হয় আমি একপদও চলিতে পারিব না। মা ভাবিতেছেন, ছেলের কিছুই খাওয়া হইল না, তিনি দুগ্ধ ও দধি আনিয়া, "আর দুটি ভাত খা বাবা, পথে আর কি খেতে পাবি" এই বলিয়া অঞ্চলে নয়নাশ্রু মুছিতে লাগিলেন।

আহার করিয়া একটু বিশ্রাম করিতে না করিতে বেলা ছয়দণ্ড অতীত হইয়া গেল। শুভ মুহূর্ত্তে মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলাম। আমার ছোট ভাই-ভগ্নী দুটি কাঁদ কাঁদ মুখে আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মা অশ্রুপূর্ণ লোচনে আমার চাদরখানিতে সিদ্ধি, বিল্বপত্র ও ঠাকুরের ফুল বাঁধিয়া দিয়া ললাটে দধির ফোঁটা দিলেন। এইবার মা আমাকে রুদ্ধকণ্ঠে পূর্ণঘটে প্রণাম করিতে বলিয়া বারবার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। বিদায় দিবার সময়ে আমার মস্তকে ঠাকুরের ফুল, বিল্বপত্র ও তুলসীতলার মাটি দিয়া, মা অশ্রুপূর্ণলোচনে কতই আশীর্ব্বাদ করিয়া তেত্রিশকোটী দেবতার নিকট আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

যতক্ষণ মা আমাকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অজস্রধারে অশ্রুপাত করিতে করিতে নির্নিমেষ নয়নে মাঠের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মা, ভগ্নী ও ভাইটির জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হইতে লাগিল। নয়নাশ্রু মুছিতে মুছিতে কলিকাতার পথে আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথে আসিতে আসিতে কেবল মায়ের মলিন বিষাদমাখা মুখখানি এবং তাঁহার অজস্র অশ্রুধারা মনে পড়িতে লাগিল। হায়! আমি কি হতভাগ্য সন্তান, একদিনের জন্য মাকে সুখী করিতে পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে কলিকাতায় আমার তিনমাস অতীত হইয়া গেল। আমি একটি ছাপাখানায় লেখাপড়ার কাজ করি। বারটাকা বেতন পাই কিন্তু এই তিনমাসে পাঁচটি টাকা ব্যতীত মাকে কিছুই পাঠাইতে পারি নাই। চির অভ্যাস জন্য দুইবেলা ভাত খাইয়া হোটেলের ব্রাহ্মণকে ৭৲ টাকা দিতে হয়। এক পয়সারও জল খাই না, কিন্তু কাপড় জামা ধোপা নাপিত ইত্যাদিতে একটি পয়সাও রাখিতে পারি না। ইহা ব্যতীত এই তিনমাসে দুইবার জ্বর হইয়া ৫।৬ দিন কার্য্যে অনুপস্থিত থাকা নিবন্ধন ১০।১২ দিনের বেতন বাদ গিয়াছে, অধিকন্তু ঔষধ খরচও কিছু হইয়াছে। আসিবার সময় মা আমাকে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, "বাবা! অসুখ হইলে তৎক্ষণাৎ ঔষধ

খাইও।” কাজে কাজেই মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ভয়ে এবং চাকরিটি বাজায় রাখিবার জন্য দুই দিন জ্বরের পরেই সর্দ্দির উপরে অনবরত কুইনাইন মিক্সচার খাইয়াছি। গৃহে অন্নের জন্য সর্ব্বক্ষণ হাহাকার ধ্বনি হইলেও কলিকাতার বাহ্যিক সভ্যতা ষোলকলায় বিদ্যমান! অগত্যা আমাকেও সকলের ন্যায় একখানি সাদা কাপড় ও জামা এবং এক জোড়া জুতা পায়ে কলিকাতার বাবু সাজিয়া ছাপাখানায় যাইতে হইত, ইহাতেও কিছু ব্যয় ছিল। হায় কলিকাতা সহর! যে দিন আমি কনিষ্ঠের নামে পাঁচ টাকা মণিঅর্ডার করিলাম, সে দিন যে আমার কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা আর আপনাদিগকে কি বলিব! যে দিন মা টাকা পাঁচটি হাতে পাইবেন, সে দিন মায়ের কতই আনন্দ হইবে, এই ভাবিয়া সে রাত্রে আমার নিদ্রা হইল না।

বৈশাখ মাস। প্রচণ্ড রৌদ্র। বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, আজ রবিবার, ছাপাখানা বন্ধ। আমি সমস্ত দিন বাসাতেই বসিয়া আছি। আমাদের গ্রামের কয়েকজন লোক কলিকাতা নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটের একটি বাসায় থাকিত, আমি সেই বাসার নিম্নতলে একটি অন্ধকারময় গৃহে শয়ন করিতে পাইতাম। আমাদের গ্রামের কয়েকজন লোকের অনুগ্রহে আমার বাসা-ভাড়াটা লাগিত না। বৈশাখের

প্রচণ্ড রৌদ্রে সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া যাইতেছে, প্রাণটাও সকাল হইতে হু হু করিতেছে। বাসার সকলে সোডা, লেমনেড্ বরফ খাইয়া হাত-পাখার বাতাস করিতেছে, আমি সেই আঁধার গৃহে ছারপোকাপূর্ণ ভাঙ্গা তক্তপোষ-খানিতে বসিয়া কত কি চিন্তা করিতেছি। অন্য দিন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, চিন্তার বেশী অবসর পাইতাম না, কিন্তু রবিবারে আমার জগতের সহিত অল্পক্ষণই সম্বন্ধ থাকিত, আমি সেই দিন আপন মনে চিন্তায় বিভোর থাকিতাম। অন্য দিন অপেক্ষা আজ যেন মায়ের জন্য আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে! বিদায়কালীন মায়ের সেই অশ্রুজল, সেই ম্লান দারিদ্রক্লিষ্ট মুখখানি, সেই অভাব দুঃখ-নিষ্পেষিত সরস স্নেহপূর্ণ বাক্য মনে হইয়া শ্বাসরুদ্ধ হইতে লাগিল! দুঃখরাশি একত্রিত হইয়া অশ্রুরূপে আমার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিতে লাগিল! আমি পেট ভরিয়া হোটেলের অন্ন উদরস্থ করিয়া বসিয়া আছি, মাকে না জানি, কত কষ্টই পাইতে হইতেছে। হায় মা! কেন আমি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? যে পুত্র জননীর দুঃখ নিবারণ করিতে পারে না, যে অধম সন্তানের, চক্ষের উপর দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়াও, তাহা দূর করিবার ক্ষমতা নাই, সে কেন সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল? হায় মা! ভূমিষ্ঠ হইয়াবধি আমাকে সুখে রাখিবার জন্য

তুমি কি কষ্ট না পাইয়াছ, আমি তোমাকে একদিনের জন্যও সুখী করিতে পারিলাম না! হায় মা! পিতার সংসারে তুমি অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে, আমার জগদ্ধাত্রীরূপিনী জননী হইয়া, সুখ শান্তির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনের প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধার পূজা পাইয়াছ, সকলেই তোমার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া ধন্য হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে; আজ মা তোমার এই দুর্দ্দশা কেন? তবে কি এই অধম পুত্রকে উদরে স্থান দিয়াছ বলিয়াই তোমার এই দুর্দ্দশা? মাগো! জীবনে যদি তোমাকে সুখী করিতে না পারি, তবে এ দুঃখ আমার জন্মজন্মান্তরেও যাইবে না! অন্ধকারময় গৃহে মলিন শয্যোপরি শয়ন করিয়া এইরূপ কত কি চিন্তা করিতেছি, অবিরাম নয়নাশ্রুতে মলিন ছিন্ন-উপাধানটা একবারে সিক্ত হইয়া গিয়াছে, এমন সময় কে একখানি চিঠি দিয়া গেল। চিঠি-খানি হাতে পাইয়া আহ্লাদে লাফাইয়া উঠিলাম। ডাকে চিঠি পাইবার জন্য আমি অনেকদিন হইতে পথপানে চাহিয়া থাকিতাম। চিঠিখানি পাঠ করিতে করিতে মনে করিতাম, ভাই ভগ্নির ও জননীর স্নেহ-মমতা পত্রের ছত্রে ছত্রে যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে! চিঠি পাঠ করিতে করিতে জননী ভগ্নী ও সহোদরকে যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতাম। সপ্তাহাধিক গত হইল, ভ্রাতার পত্র পাই

নাই, তাই বুঝি আজ প্রাণ মন অধিক চঞ্চল হইয়া উঠি-য়াছে। কাঙ্গালের লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্তির ন্যায় চিঠিখানি পাইয়া পাঠ করিবার জন্য অন্ধকূপ গৃহ হইতে বাহিরে আসিলাম।

হরি! হরি! একি! চিঠিখানির কয়েক ছত্র পাঠ করিয়াই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল! কলিকাতা সহরটা বোঁ বোঁ করিয়া যেন চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। কতক্ষণ বসিয়া আমি বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলাম। আমার কি দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়াছে? পুনর্ব্বার আলোকে আসিয়া পত্রখানি পাঠ করিলাম। সত্য সত্যই আমার জননীর কঠিন পীড়া। আমার কনিষ্ঠ সামান্য জ্বরের কথা লিখিয়াছে বটে কিন্তু বুঝিতেছি, কঠিন পীড়া! যদি সামান্য অসুখ হইবে, তবে আমাকে তাড়া-তাড়ি গৃহে যাইবার কথা লিখিবে কেন? পাছে আমি চাকরি ছাড়িয়া গৃহে চলিয়া যাই, এই জন্য মা কখন আমাকে কাহার অসুখের কথা লিখিতে দিতেন না, তবে আজ এরূপ চিঠি আসিল কেন? অন্যের হস্তলিপি হইলে চক্ষু অবিশ্বাস করিত, গরিবকে কেহ উপহাস করিয়াছে ভাবিয়া, মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম কিন্তু এ যে সত্য সত্যই আমার প্রাণসম কনিষ্ঠের হস্তলিপি! চিঠিতে সামান্য জ্বরের কথা লেখা থাকিলেও, কে যেন আমার প্রাণকে ভীষণ মর্ম্মভেদী সমাচার বলিয়া দিতেছে—"না না,

সামান্য অসুখ নহে। তোমার দুঃখিনী জননী মৃত্যুশয্যায় ছট্‌ফট করিতেছেন!!

আর থাকা হইল না! আর তিলার্দ্ধও বিলম্ব নয়। ছুটিলাম। প্রাণপণে ছুটিলাম। কিয়ৎদূর আসিয়া মনে হইল, গাড়ীতে উঠিবার রেলভাড়া কৈ? আবার আমি সেই অন্ধকূপ গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। হোটেলস্বামী ব্রাহ্মণকে দিবার জন্য যে দুইটি টাকা ছিল, সেই টাকা দুইটি, কাপড় ও গামছাখানি লইয়া পুনর্ব্বার বাহির হইতেছি, কে একজন বলিল, "মনিবের কাছে ছুটি লইয়া যাও।" ছুটি! মায়ের অসুখ, ছুটি কি? চাকরি করিয়া মাকে খুব সুখী করিলাম, ছুটিতে প্রয়োজন নাই, চাকরিতে প্রয়োজন নাই, অর্থে প্রয়োজন নাই। উদাস প্রাণে দৌড়াইতে লাগিলাম। যখন হাওড়া ষ্টেশনে আসিলাম, তখন ষ্টেশনের বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিয়া গেল। বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্র। প্রায় দেড় মাইল পথ ছুটিয়া আসিয়াছি, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ। কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। মনে হইতেছে, ঐ পতিতপাবনী জাহ্নবীর সমস্ত জলটা শুষিয়া খাইলেও পিপাসা নিবারণ হইবে না! জল খাওয়া হইল না। ভয়—পাছে গাড়ী না পাই।

কখন কোন্ ট্রেন কোথায় যায় কিছুই জানি না।

শুষ্ককণ্ঠে হাঁপাইতে হাঁপাইতে অতি কষ্টে একটি ভদ্রবেশ-ধারী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! গাড়ী কখন ছাড়িবে?"

বাবুটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সোনার চসমাটি একটু উচু করিয়া কতক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পিপাসা, ভীষণ রৌদ্র ও হৃদয়ের যাতনায় আমার মুখের চেহারাটা তখন একবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছে! রৌদ্রতাপে আমার মুখ যেন ঝলসিয়া উঠিয়াছে। ভদ্রবেশধারী শিক্ষিত বাবুটি মনে করিলেন, আমি বুঝি কাহার এই মাত্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আসিতেছি। বাবুটী গম্ভীর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কে মারা গেছে?" বাল্যকাল হইতে আমার স্বভাবটা কিছু উগ্র, সহজেই সামান্য কথাতেই আমার রাগ হইয়া উঠে। কিন্তু সে ক্রোধ অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী। সামান্য ক্ষণেই সে ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

বাবুটির প্রশ্নে সেই দুঃখের উপরেও আমার বড় রাগ হইল। আমার তখন কথা কহিবার শক্তি ছিল না। ক্রোধে হৃদয়টা উত্তেজিত হইয়া চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। বাবুটি আবার একবার ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। আমি উদাস দৃষ্টিতে ষ্টেশনের চতুর্দ্দিকে

চাহিতে লাগিলাম। গাড়ী, ঘোড়া, সাহেব, মেম, জৈন, খৃষ্টান, পার্সি, মাড়োয়ারি কত রকমের লোক কত রকম অদ্ভুত বেশে গন্তব্য স্থানে গমনের জন্য গাড়ীর অপেক্ষায় বেড়াইতেছেন; আমার কোন দিকেই লক্ষ্য নাই। পথহারা পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া আমি গাড়ীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। বহু অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, পাঁচটা কয় মিনিটের সময় গাড়ী ছাড়িবে।

আমি যখন ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম, তখন রাত্রি দশটা। এখান হইতে ১০ মাইল বা পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে তবে আমাদের গ্রামে পৌঁছিতে পারা যায়। সন্ধ্যা হইলে কেহ এই পথে পদার্পণ করে না। আমাদের গ্রামে যাইতে হইলে দুই ক্রোশব্যাপী দুইটি ভীষণ মাঠ পার হইতে হয়। এই দুইটী মাঠে কত নরহত্যা হইয়াছে, এখনও কত শত নরনারীর অস্থি-কঙ্কাল মৃত্তিকা নিম্নে প্রোথিত আছে, তাহার সংখ্যা নাই। ইংরাজ-শাসনে এখন যদিও দস্যুবংশধরগণ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে, তত্রাচ অনেকেই এখনও ইহাকে একবারে নিরাপদ স্থান বলিয়া মনে করে না। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, একা এই অন্ধকার রজনীতে কিরূপে এই ভীষণ

মাঠ অতিক্রম করিব? চিত্তের স্থির না থাকায়, এই কথা একবার মাত্র চিন্তা করিয়াই গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। লোকচরিত্রাভিজ্ঞ কোন দূরদর্শী বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্থিরদৃষ্টিতে যদি আমার মুখের দিকে একবার চাহিতেন, তবে তখন আমি জীবিত কি মৃত, পাগল কি প্রকৃতিস্থ, মানব কি পশু, তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না। আমি জীবিত বটে কিন্তু আমার জীবনীশক্তি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। আমি মৃত নহি, কিন্তু মৃতের ন্যায় আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ, অচল। আমি পাগল নহি কিন্তু আমার দৃষ্টি পাগলের ন্যায়, আমার হৃদয়, মন, মস্তিষ্ক পাগলের ন্যায়! বাহ্যিক চেহারায় আমি মানব বলিয়া লোকচক্ষে প্রতীয়মান হইলেও পশুর ন্যায় হিতাহিতজ্ঞান কোথায় যেন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। প্রতিমুহূর্ত্তে মনে পড়িতেছে, মায়ের রোগশয্যা। জননীর দীনা, হীনা, কাঙ্গালিনীর ন্যায় বেশ। মনে পড়িতেছে, মায়ের সেই দুঃখের সংসারে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। আবার মনে পড়িতেছে, তৈলাভাবে মায়ের সেই রুক্ষ কেশগুলি। পরক্ষণে মনে হইতেছে, মায়ের সেই অপার স্নেহ-মমতা। আবার মনে পড়িল, মায়ের সেই অশ্রুজল। এইবার আমি ঘোর অন্ধকার পথে ছুটিতে লাগিলাম। পড়িয়া গেলাম, আবার উঠিলাম।

কয়েকজন লোক আলোহস্তে দ্রুতপদে পথ হাঁটিয়া চলিয়াছে! আরও দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া দেখিলাম, একজন একটি লণ্ঠনহস্তে অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে, আর দুই-তিনজন তাহার অনুগমন করিতেছে। একটি কাঁচের লণ্ঠনের ভিতর তৈল-পূর্ণ একটী প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে!

আমাকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া একজন কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

আমার তখন কথা কহিবার শক্তি ছিল না! ভয় ও বিরক্তির স্বরে আর একটা লোক বলিল, ""কে তুই শীঘ্র বল্?" অমনি একজন লোক আমার মস্তক লক্ষ্য করতঃ ঊর্দ্ধে যষ্টি উত্তোলন করিল। আমি শুষ্ককণ্ঠে কাতরস্বরে বলিলাম, "আমি পথিক, বড়ই বিপন্ন!"

অতি কষ্টে দুই-এক কথায় আমার বিপদের কথা জানাইলাম। আমাকে দেখিয়া বুঝি তাহাদের একটু দয়া হইল; তাহারা আমাকে আর কিছু বলিল না, বলিলেও আমি তাহাদের কথায় উত্তর দিতে পারিতাম না, আমার অঙ্গ অবশ ও বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া আসিতেছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বদিক্ ফর্সা হইয়া আসিয়াছে। কাকগুলা কা কা করিয়া আমার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। আমি আমাদের খিড়্‌কির দরজায় দাঁড়াইয়া প্রাণপণ শক্তিতে ডাকিতেছি, "মা! মাগো! কপাট খোল, আমি আসিয়াছি।" কাহারও উত্তর নাই! আমার দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া আবার ডাকিলাম, "মা! মা! আমি গো! আমি আসিয়াছি!" পিপাসা শুষ্ক-কণ্ঠ-নিঃসৃত ক্ষীণ নির্জীব স্বরের কেবল অস্ফুট প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। দেহ অবশ, কণ্ঠ রুদ্ধ, এ ক্ষীণ চিৎকারে উত্তর দিবে কে? আবার প্রাণপণ শক্তিতে "মা! মা!" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম। উত্তর নাই! একি হইল? যখন যেখান হইতে আসি, মা যে দৌড়িয়া আসিয়া আমার মুখ চুম্বন করেন? আজ এ কি হইল? যদি কখন কোথাও দুই দিনের জন্য যাইতাম, "কখন আসিবে, কখন আসিবে" বলিয়া মা যে পথের পানে চাহিয়া থাকিতেন। আজ তিন মাস পরে আসিলাম, মা দৌড়িয়া আসিল না কেন? আমার হৃদয়টা যেন ফাটিয়া

যাইবার উপক্রম হইল! আবার "মা! মা!" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলাম। এবার আমার কণ্ঠস্বর কনিষ্ঠের কর্ণকুহরে আঘাত করিল। কনিষ্ঠ কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িয়া আসিয়া কপাট খুলিয়া দিল। যখন মা দৌড়িয়া না আসিয়া ভাইটি ছুটিয়া আসিল, তখন আমার মস্তকে যেন প্রতিমুহূর্ত্তে সহস্র সহস্র বজ্রপতন হইতে লাগিল! হায় মা! আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তুমি কি করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলে? তবে কি দয়া-মমতা সব বিসর্জ্জন দিয়াছ? না! না! আমার জননীর স্নেহ-সিন্ধু শুকাইবার নহে! জগতের নদ, নদী, তড়াগ সমুদ্র শুকাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমার জননীর স্নেহ-সিন্ধু শুকাইবার নহে! তবে কেন এমন হইল? একদণ্ড কোথাও যাইলে মা যে আমার দুঃখিনী ভিখারিণীর ন্যায় উদাস নয়নে পথের পানে চাহিয়া প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেন। আর আজ! তিন মাস কলিকাতায় ছিলাম, মা যে তিনযুগ বলিয়া মনে করিতেছেন, তবে আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছুটিয়া আসিল না কেন? হায়! হায়! এ কি হইল! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? অগত্যা আমি নীরব, নিশ্চল স্থানুর ন্যায় দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কনিষ্ঠের ব্যাকুল ক্রন্দনে আমার চমক ভাঙ্গিল! বিনাইয়া বিনাইয়া কচি ভাইটি কত কথা বলিয়া কাঁদি-

তেছে। আমার জ্ঞান হইল, মনে পড়িল, স্বপ্ন নহে, সত্য! সত্যই মায়ের পীড়া! স্বপ্ন নহে, সত্য আমি মায়ের পীড়ার সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে ছুটিয়া আসিতেছি! সত্য, সব সত্য! সমস্ত কথা একবারে স্মৃতিপথে উদিত হইল! দৌড়িয়া গিয়া ভাইটার গলা জড়াইয়া ধরিলাম! হায়! হায়! কতদিনের পর, বুঝি তিন যুগের পর, ভাইটিকে বুকের কাছে টানিয়া আনিলাম! কনিষ্ঠের অঙ্গস্পর্শে একটা আনন্দের ছায়া টিট্‌কারি দিয়া কোথায় চলিয়া গেল! আকুল প্রাণে, রুদ্ধকণ্ঠে, সশঙ্কিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা কোথা, মা কেমন আছে ভাই?"

আমার প্রশ্নে কনিষ্ঠ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা ভাল নাই দাদা!"

"কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে! সংসারে আর যে আমার কেউ নাই রে!" বলির পশুকে যূপকাষ্ঠে পুরিয়া শাণিত খড়্গে মস্তকটা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলে দেহটা দূরে পড়িয়া যেরূপ ছট ফট্ করিতে থাকে, আমিও তদ্রূপ মাতার শয্যার পার্শ্বে পড়িয়া অসহনীয় যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলাম। জগতে এমন ভাষা নাই যে, তদ্দ্বারা সে যাতনা ভাষায় পরিস্ফুট হইতে পারে।

ভাষাই বা জগতে কয়টা? কথাই বা জগতে কয়টা আছে? আমার এই অসীম অসহ্য অন্তরের বেদনা কি

কথাতে প্রকাশ হয়? হৃদয়ের ভাব, প্রাণের যাতনা কথাতে প্রকাশ করা যাইতে পারে, এরূপ ভাষার সৃষ্টি এখনও জগতে হয় নাই। এরূপ ভাষার উৎপত্তি জগতে বুঝি একবারেই অসম্ভব! পাঠক, তখনকার আমার মনের অবস্থা আপনাদিগকে বুঝাইতে পারিব না। কেন পারিব না, তাহাই আপনাদিগকে বিশদভাবে বলিতেছি।

সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, শোক প্রভৃতিতে মানুষের হৃদয়ে এরূপ অভিনব ভাবের উদয় হয় যে, মানুষ সহস্র চেষ্টা বা ইচ্ছা করিলেও তাহা সম্যক ব্যক্ত করিতে পারে না। এই মনোভাব আংশিক ভাবে ব্যক্ত করিতে পারিলেও হৃদয়ের অন্তস্তল-নিহিত শোক দুঃখের ভাব ভাষা, বাক্যে বা লেখনীমুখে প্রকাশ অসম্ভব। অপূর্ণ মানবের ভাষাও যে অসম্পূর্ণ তাহা কে অস্বীকার করিবে? মানব-হৃদয়ের যে সমস্ত ভাব সহজ, সামান্য, সুস্পষ্ট ও হৃদয়োপরি ভাসমান, তাহাই পুত্র, কলত্র, বন্ধু প্রতিবাসী ও স্বজাতীর নিকট প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। কি[illegible]খানে অসহনীয় গভীর দুঃখের বাহু[illegible]তা, সেখানেই ভাষা[illegible] অক্ষমতা। যেখানে [illegible] শোক-[illegible]খে মানব-হৃদয় প্লা[illegible]ত ও অভিভূত, ভাষা সেইখানেই শক্তিহীন ও প[illegible]। হৃদয় যে মাতৃ-শোকের সীমা নির্দ্ধারণ [illegible] একে সে শোকের তীব্রতা, দুঃখের গভীরতা [illegible]।

মায়ের সেই অন্তিম শয্যার কথা লিখিতে লিখিতে হৃদয় যেরূপ ক্রমশ ঘন অন্ধকারে আবৃত হইতেছে, ভাষাও তেমনই দূরে—অতি দূরে সরিয়া যাইতেছে। শোক, দুঃখ, বিষাদ সামান্য প্রকারের হইলে অনেকেই তাহা ভাষায় বা ক্রন্দনে প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু শোক দুঃখে হৃদয় একবারে ঢাকিয়া গেলে, ভাষার অভিব্যক্তি থাকে না। ধাতু যেমন পুটপাক পাত্রে থাকিয়া অন্তরে দহ্যমান হইয়াও বাহিরে আপন অবস্থা প্রকাশ করে না, পাঠক! আমার অবস্থাও তদ্রূপ! যাঁহাকে দেখিয়া, যাঁহাকে ভাবিয়া, যাঁহার স্নেহ যত্নে এতদিন বাঁচিয়াছিলাম, সেই জগদ্ধাত্রীরূপিণী জননীর অবস্থা দেখিয়া, আমার হৃদয় যে কি অসহ্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছে, তাহা আপনাদিগকে ভাষায় কি করিয়া বুঝাইব?

হায়! হায়! কে এমন করিলরে! মা'র আমার সে শ্রী নাই, মা আমার অস্থি-কঙ্কাল-সার হইয়া শয্যায় মিশিয়া আছেন! মায়ের জ্ঞান নাই! মা অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় আশ্রয় করিয়া আছেন! মায়ের অবস্থা দেখিয়া আমার পিতার মৃত্যুশয্যা মনে পড়িল। পা-দুখানি বুকে লইয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে লাগিলাম। হায়! মানব-দেহ কি পাষাণ! জানি না, ভগবান কি উপাদানে মানব-হৃদয় সৃজন করিয়াছেন। যদি ভগবানের

সতর্ক হস্ত ও বিশেষ উপাদানে মানব-হৃদয় গঠিত না হইত, তবে বোধ হয়, এতক্ষণ মায়ের রুগ্নশয্যায় এই নশ্বরদেহ লুণ্ঠিত হইয়া পড়িত!

আমার পত্নী বসন্তকুমারী ও মেজ দিদি আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া তুলিল! সকলে ভয় দেখাইতে লাগিল, এরূপ বিহ্বল হইয়া চিৎকার করিলে, মা ভাল হইবে না, রোগ বৃদ্ধি হইবে! "আর রোগ বৃদ্ধির বাকি কি গো!" বলিয়া আবার আমি কাতরস্বরে চিৎকার করিয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলাম।

হায়! হায়! কি হৃদয়-বিদারক কথা! আমার মেজ দিদি জননীর কানের কাছে মুখ রাখিয়া রোরুদ্দমানা কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সেজখুড়ি! তোমার সাতু কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, একবার চাহিয়া দেখ।" মুমূর্ষু জননীর কর্ণে অধম পুত্রের আগমন-বার্ত্তা প্রবেশ করিবা মাত্র কোথা হইতে তাঁহার জ্ঞান যেন ফিরিয়া আসিল! ওহো! জননীর পুত্রস্নেহ প্রকৃতই স্বর্গীয় পদার্থ! যে বলে, উহা মর্ত্ত্যের জিনিষ, সে মূর্খ! জননী অতি কষ্টে, ক্ষীণকণ্ঠে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা জড়িতস্বরে কেবল একটী কথা বলিলেন! সে কথা কি ভীষণ! যতদিন এই দেহে জীবন থাকিবে, ততদিন জননীর সেই প্রাণভেদী আক্ষেপ-বাক্য, অন্তিম সময়ের হৃদয়ভেদী কথা, আমি বিস্মৃত হইব

না। হায় মা! কোথায় তুমি আজ? তোমার চরণ-সেবা করিবার জন্য পুত্রদের ক্ষীণ বাহু এখনও কম্পিত হইতেছে, কিন্তু তোমার অস্তিত্ব আর এ জগতে নাই!

হায়! কি হৃদয়ভেদী—কি বৃশ্চিক দংশন-যন্ত্রণা! আমার মেজ দিদির কথার উত্তরে জননী আমার অন্তিম শয্যায় ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ—জড়িত ভগ্নস্বরে বলিলেন, আসিয়াছে, সাতু আমার আসিয়াছে, শুধুভাত সুধুভাতই—মস্তকের রুক্ষ কেশগুলি স্পর্শ করিয়া আবার জড়িত ক্ষীণ স্বরে মা বলিলেন, "মাথায় তেল নাই!!!" ওহো! কি হৃদয়ভেদী মর্ম্মান্তিক জননীর অন্তিম বাণী! এখনও হৃদয় শিহরিয়া উঠে, শরীরের রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়! জননীর অন্তিম কালের সেই মর্ম্মান্তিক হৃদয়ভেদী দুঃখের কথা স্মৃতিপটে উদিত হইলে জীবনে ধিক্কার জন্মে, সংসার ত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যে মাতৃপদ ধ্যান করিতে, অসার জীবন জননীর দুঃখপূর্ণ জীবনের অনুগামী করিতে, প্রবল বাসনা জন্মে। হায়! কঠোর নির্ম্মম সংসার!

জননী অন্তিম-সময়ে ইহাই বুঝি বলিলেন, "বাবা, তোমাদের আশায়,তোমাদের মুখ চাহিয়া তৈলহীন মস্তকে এক সন্ধ্যা ব্যঞ্জনহীন অন্নে জীবনধারণ করিয়াছিলাম; তুমি কলিকাতা যাইবার পর আমার দুঃখ দৈন্য সাতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, শুধুভাত, তাও অতি কষ্টে জুটিত!"

মায়ের অন্তিম বাক্য আমার হৃদয়ে শেলের ন্যায় আঘাত করিল। আমি উচ্চৈঃস্বরে গগনভেদী চিৎকার করিয়া উঠিলাম। এমন সময় ডাক্তার আসিয়া মাকে বাহিরে আনিবার জন্য বলিলেন। জড় ডাক্তারের পায়ে পড়িয়া চিৎকার করিতে করিতে বলিলাম, "ডাক্তার বাবু! আমার মাকে বাঁচাও, আমাদের যাহা কিছু আছে তোমাকে দিব।" ডাক্তার দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। এমন সময় "মাগো কোথায় যাও গো! খুড়ি গো! আমাদিগকে ফেলিয়া তুমি কোথায় পালাচ্চ গো!" রবে চিৎকারধ্বনি উত্থিত হইল। ফিরিয়া দেখি, আমার মা আর নাই। আমি মায়ের পদতলে পড়িয়া চিৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলাম। তত চিৎকারে, তত আকুলি-ব্যাকুলিতেও মা আমার কথা কহিলেন না। আজ পর্য্যন্ত মা আমার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন না। দুঃখ-দৈন্যের ভয়ে—শোক তাপের যাতনায়, মা আমার বুঝি আর কখন এই পাপ সংসারে আসিবেন না। জানি না, কোথায় গেলে, কতদিন পরে, আবার আমি মায়ের সেই পা-দুখানি দেখিতে পাইব।

দশম পরিচ্ছেদ

তিন বৎসর হইল, জননীর মৃত্যু হইয়াছে। এখন আমি ছোট ভাই ও বসন্তকুমারীকে লইয়া এই দুঃখের সংসারে বাস করিতেছি, ভগ্নী চারুবালাও এখন আর আমাদের সংসারে নাই। আমার ভগ্নীপতি বিধুভূষণ আসিয়া চারুবালাকে লইয়া গিয়াছে।

"মাগো কোথা আছিস্ গো" বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যেদিন চারুবালা শ্বশুরবাড়ী যায়, সেদিন মা-ও চারুবালার জন্য শোক দুঃখে অধীর হইয়া পাগলের ন্যায় সমস্ত দিন লোকালয় ত্যাগ করিয়া শ্মশানে ও অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। চারুবালাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইয়া এই দুঃখের উপরেও আমার একটু সান্ত্বনা ছিল। বিধুভূষণের সাধুতা, চরিত্রবল ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া চারুবালাকে যে অপাত্রে অর্পণ করি নাই, এই ভাবিয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম।

চারুবালার স্বামী বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় যুবা পুরুষ। দেখিতেও মন্দ ছিল না। আজকালকার যুবকদের মত বিধুভূষণের ভাবভঙ্গি ছিল না। বিধু-

ভূষণকে কখন টেরি কাটিতে দেখি নাই, এসেন্স, পমেটম্ আদির নাম বিধূভূষণের জানা ছিল কি না, সে পক্ষে ঘোর সন্দেহ আছে। বিধুভূষণের সহিত কাহার মনের মিল বা মতের ঐক্য হইত না। নব্য সভ্য যুবকমণ্ডলি বিধুভূষণকে দেখিলে কেহ ঘৃণা করিত, কেহ বা উপহাস্যের হাসি হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত। বিধুভূষণের স্বভাবটা অতি অদ্ভূত রকমের ছিল ; সে সর্ব্বদাই নিঃসঙ্গ হইয়া নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসিত। লোকের সহবাস তাহার অঙ্গে যেন কণ্টক বিদ্ধের যাতনা প্রদান করিত। বিধুভূষণ চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য কয়বৎসর ক্যাম্বেলে পড়িয়াছিল, কিন্তু পাশ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়বার পাশের চেষ্টা না করিয়া কাঁচগেড়ে গ্রামে একটি ডিস্‌পেন্সারি খুলিয়া চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করিল।

চারুবালার বিবাহের এক বৎসর পরে বিধুভূষণকে একবার আমাদের বাটীতে আনিবার জন্য কয়েকবার লোক পাঠাইলাম, কিন্তু সে কিছুতেই আমাদের বাটীতে আসিল না। অগত্যা সকলের জেদে আমি নিজেই তাহাকে আনিতে গেলাম। অনেক সাধ্য-সাধনার পর সে শ্বশুরগৃহে আসিতে স্বীকৃত হইল। বিধুভূষণের আগমন সংবাদে বসন্তকুমারী আনন্দে আত্মহারা হইয়া দুঃখের সংসারে যথাসাধ্য জামাই আদরের আয়োজন করিতে

লাগিলেন। আমার জ্ঞাতী ভ্রাতাদের স্ত্রীরা, বিশেষত ছোট বউ ও মেজ বউ বসন্তকুমারীর সহিত বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত বিধুভূষণকে ঠকাইবার জন্য নানারূপ কৃত্রিম খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিধুভূষণ আমাদের চণ্ডিমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইল। নূতন জামাইয়ের প্রথম শ্বশুর গৃহাগমনের সংবাদে স্ত্রীমহলে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল;—সকলেই আনন্দে আত্মহারা। বাসর-ঘর ও নূতন জামাই পাইলে যুবতীদের হৃদয় আনন্দে কিরূপ উৎফুল্ল হইয়া উঠে. তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই! ক্ষুধিত ব্যাঘ্রিণী সন্মুখে আহার পাইলে যেরূপ দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া একবারে লাফাইয়া পড়ে, নূতন জামাই ও বাসর-ঘরের নামেও বঙ্গ-ললনারা তদ্রূপ দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়ে! জামাইদের উপর শ্যালি শ্যেলেজ ও ঠান্‌দিদিদের কেন এত আক্রোশ, তাহার মীমাংসা আজ পর্য্যন্তও হইল না। বিধুকে বাটীর মধ্যে আসিবার জন্য শ্যালি শ্যেলেজ ও ঠান্‌দিদিদের পক্ষ হইতে বালক, বালিকা, যুবতী ও প্রৌঢ়াদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া প্রতিনিধি প্রেরিত হইতে লাগিল; কিন্তু কেহই তাহাকে বাটীর মধ্যে আনিতে পারিল না। অবশেষে সন্ধ্যা আহ্নিক ও ঈশ্বর-উপাসনার সময় অতীত হইয়া যায় দেখিয়া জামাতা

স্বয়ং বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। স্ত্রী-লোকদের হুলুধ্বনি ও শঙ্খ-নিনাদের মধ্যে বেচারা জালবদ্ধ মৃগের ন্যায় অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। রজনী তখন চরিদণ্ড অতীত হইয়া গিয়াছে।

"আপনারা আমাকে ঠাকুর ঘরটি দেখাইয়া দিন, আমার এখনও সন্ধ্যা আহ্নিকাদি হয় নাই!"

নবাগত জামাতার প্রথম সম্ভাষণ শুনিয়া যুবতী-মহলে হো—হো হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। বেচারা বিধুভূষণ যেন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। জামাতার নাস্তা-নাবুদ দেখিয়া আমার মাসি-মা ঠাকুর-ঘর খুলিয়া দিলেন। বিধুভূষণ সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতে বসিল।

রজনী এক প্রহর অতীত হইয়া গেল, বিধুভূষণের সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ হইল না। "কোথাকার একটা বেল্লিক জামাই" এইরূপ এবং অন্যরূপ ব্যঙ্গোক্তি করিয়া যুবতীরা একে একে সকলেই স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। যাহাদের সহিষ্ণুতার অন্ত নাই, তাহারাই নূতন জামাতার সঙ্গে রঙ্গ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না, বসিয়া রহিল।

এইরূপেই দুই দিন অতীত হইয়া গেল। স্ত্রীমহলে বা নব্য যুবক-মহলে বিধু বেচারি প্রশংসা লাভ করিতে পারিল না। কেহ বলিল, বোকা; কেহ বলিল, অসভ্য; কেহ বলিল, নিরেট মূর্খ। আমার বৌ-দিদিরা বলিল,

আমাদের কথার উত্তর দিয়াও জামাই মান রাখিল না;
বিধুর ব্যাপার দেখিয়া আমিও মনে মনে চটিয়া গেলাম।

বিধুর ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া ক্রমশঃ আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। সকলেই নিন্দা করিতেছে, সকলেই বলিতেছে, জামাইটা এত বোকা, নিরেট মূর্খ, অসভ্য অথবা লাজুক যে, কাহারও সহিত আলাপ করিতে, কি একটা কথা বলিতে পারে না। স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বালক-বৃদ্ধ সকলেরই এই এক কথা। আমিই পছন্দ করিয়া এই অদ্ভুত জীবের সঙ্গে চারুবালার বিবাহ দিয়াছি, আমার রাগ বা দুঃখ হইবারই কথা। প্রকৃতই আমি বিধুর উপর বড়ই চটিয়া গেলাম।

বিধু একটা সাদা সার্ট গায়ে দিয়া আসিয়াছিল। হাতে বোতাম নাই, বোতামহীন পিরাণের হাত দুটা বাতাসে উড়িতেছিল। ভগ্নিপতির ভঙ্গি দেখিয়া আমি বলিলাম, "বিধু! কেবল একটা সার্ট গায়ে দিয়া আসিয়াছ, তাতেও বোতাম নাই।" বিধু আমার মুখের দিকে চাহিয়া সহজ ভাবে বলিল, "তাতে ক্ষতি কি?" আমি বলিলাম; "লোকে কি বলবে না যে, "অসভ্যের তুমি একটি অভিনব সংস্করণ!" বিধু আবার বলিল, "লোকের বলাতেই বা ক্ষতি কি!"

বিধুর কথায় আমার ক্রোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে

লাগিল। আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "এরূপ পরিচ্ছদে শ্বশুরবাড়ী আসা ভাল দেখায় না।" বিধু বলিল, "আমারত একটা বোতামহীন জামা আছে, অনেক দীন দুঃখীর তাহাও নাই।" পরদিন দেখি, বিধু সে জামাটা একটা ভিখারিকে দিয়া খালি গায়ে বসিয়া গীতা পড়িতেছে।

বিধুর উপর আমার আন্তরিক বিরক্তি ভাব থাকিলেও তাহার আদর-যত্নের কোন ত্রুটী না হয় সে চেষ্টা আমি সর্ব্বক্ষণই করিতাম। কপর্দ্দকহীন হইলেও তাহার জন্য ভাল আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে ত্রুটী করিতাম না। বসন্তকুমারী এজন্য আমাকে তাহার পোর্টম্যানের শেষ আধলা পয়সাটি পর্য্যন্ত দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। এতটা করিবার একটু কারণ ছিল। মা তাঁহার এই জামাইয়ের জন্য গাভীর দুগ্ধ আমাদিগকে খাইতে না দিয়া, ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে কথা আমি বিস্মৃত হই নাই। একদিন আমি দুলে পাড়া হইতে একটি মৎস্য লইয়া বিমর্ষ ও দুঃখিতচিত্তে গৃহে আসিয়া দেখি, আমার স্ত্রী বসন্তকুমারীর সঙ্গে বিধু মনের আনন্দে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। এরূপ প্রাণ খুলিয়া কাহার সঙ্গে কথা কহিতে বিধুকে আর কোন দিন দেখি নাই। ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে আমার কৌতূহল চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। গরিব দুলে বেচারারা নিত্য

আমাকে ধারে মৎস্য বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় যে মনোবেদনা লইয়া গৃহে ঢুকিতেছিলাম, ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় সেই মর্ম্মবেদনা বিস্মৃত হইয়া গেলাম। কিন্তু আমার আগমনে পাছে তাহাদের বাক্য-স্রোত রুদ্ধ হইয়া পড়ে, এইজন্য নিজেকে একটু অন্তরালে রাখিতে বিস্মৃত হইলাম না। বসন্তকুমারী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া আকুল কণ্ঠে বলিতেছে, "জানি না ভাই! আমাদিগকে এই দুঃখ-সমুদ্রে ভাসাইয়া ভগবানের কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে?"

"ভগবানকে কেন দোষ দাও বৌ দিদি! দয়ার আধার যিনি, তিনি কি কখন কাহাকেও দুঃখ কষ্ট দিতে পারেন?"

"তবে আমার স্বামীর এত দুর্দ্দশা কেন?"

"সকলই কর্ম্মফল বৌ দিদি! কর্ম্মফলেই মানুষ সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যতদিন এই কর্ম্মফল ভোগ শেষ না হয়, ততদিন দুঃখ ভোগ অবশ্যম্ভাবী।"

বসন্ত।—তবে কি আমাদের উভয়েরই কর্ম্মফল সমসূত্রে গ্রথিত? আর আমার ছোট দেবরের অদৃষ্টও কি আমাদের অদৃষ্টের সঙ্গে সংসৃষ্ট। আহা! দুধের ছেলে দেবরটি কি কষ্টই না পাইতেছে!

বিধু।—নিশ্চয়ই বৌ দিদি! তোমাদের সকলের

অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল প্রায়ই সমান। তাহা না হইলে তুমি কোথায় যাইয়া কাহার গৃহ আলো করিতে কে বলিতে পারিত? তোমার অদৃষ্ট প্রায় এক বলিয়াই তোমাকে বৌ-দিদি রূপে দেখিতেছি। তোমার স্বামী ও দেবর সম্বন্ধেও এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে বৌ-দিদি।"

বসন্ত। জানি না ভাই, পূর্ব্বজন্মে আমি কি পাপ করিয়াছিলাম। দুঃখের সংসারে সাত রাজার ধন মাণিক— বত্রিশ নাড়ী ছিন্ন করিয়া ক্রোড়ে আসিল, তাহাও হত-ভাগিনীর অদৃষ্টে সহিল না! বাছার মুখটি মনে হইলে বুক ফাটিয়া যায়! আমার সেই দেবীসদৃশা শ্বশ্রু-ঠাকুরাণী, যিনি আমাকে কন্যাপেক্ষাও স্নেহ-যত্ন করিতেন, তিনিও ত্যাগ করিয়া গেলেন! সকল কষ্টই সহিয়া থাকিতে পারি, যদি স্বামীর শুষ্ক বিষাদ-ভরা মুখখানি না দেখিতে হয়! আমার জীবন আমার পক্ষে প্রকৃতই দিন দিন ভারবোধ হইয়া পড়িতেছে ভাই!

অজস্রধারে দুঃখাশ্রু নির্গত হইয়া বসন্তকুমারীর বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল! বসন্তকুমারীর শোকাশ্রু দেখিয়া আমার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল পড়িল।

বিধুভূষণ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"বৌ-দিদি! সংসারের শোক-দুঃখ সকলই স্বপ্নের খেলা! তোমার

ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীর ইহাতে বিচলিত হওয়া উচিত নয়! জগতে প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে! ঘোর অন্ধকার, ঝড়, ঝঞ্ঝাবাৎ, বিদ্যুৎ, অবিরাম বারি পতন দেখিয়া কি মনে হয় না, ইহার পশ্চাতে সুস্নিগ্ধবায়ু, প্রাণারাম জ্যোৎস্নালোক, শান্ত—নিস্তব্ধভাব রহিয়াছে? জানেন না কি, ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহের পর রণভূমি আবার শান্তভাব ধারণ করে! নিয়তই ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তরুরাজীর পত্রসমূহ ঝরিয়া যায়, আবার বসন্তঋতুর আগমনে নব নব সতেজ পত্রে বৃক্ষ সুশোভিত হইয়া মানবকে নব ফল-ফুলের আশায় মোহিত করে। এই যে তোমাদের সোনার সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে, সাজান বাগান শুখাইয়াছে, বিধির বিড়ম্বনা ভাবিয়া এই যে তোমরা হা-হুতাশ করিতেছ, কালবশে আবার যে তোমাদের মুখে হাসির রেখা ফুটিবে না, ইহা কে বলিতে পারে? বৌ-দিদি! দুঃখটা ফেলিবার জিনিস নহে। দুঃখ, দৈন্য, অভাব মানুষকে মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যায়! সুখের জীবন জীবনই নহে! বিলাসময় সুখের জীবন সংসারে কেবল একটানা স্রোতে ভাসিয়া যায়, হৃদয়ে ময়লা-মাটি মিশ্রিত হইয়া থাকে, যতদিন না তাহারা দুঃখকে আলিঙ্গন করে, ততদিন তাহাদের হৃদয় ময়লা-মাটি ধুইয়া পবিত্র হয় না! বৌ-দিদি! ভগবানে বিশ্বাস হারাইও না তোমাদের

অবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী! দাদার অচিরে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি।"

বসন্তকুমারী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তোমার দাদার এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে ইহা আমিও বিশ্বাস করি, কিন্তু ভাই পরিবর্ত্তনে ইহাপেক্ষা মন্দ অবস্থাও ত আসিতে পারে?"

বিধুভূষণ একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তাহাও আসিতে পারে বৌ-দিদি! কিন্তু মন্দ অবস্থারও একটা সীমা আছে! ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া অনেকেই প্রলয়ের আশঙ্কা করে, কিন্তু সে মেঘ কাটিয়া গেলে, জগৎ আবার হাসিতে থাকে।"

বসন্তকুমারী জলভারাক্রান্ত নয়নে বলিল, "তোমার দাদার মুখে সে হাসি দেখা আমার অদৃষ্টে নাই ভাই।"

জানি না, কেন বসন্তকুমারীর শেষ কথাটা শুনিয়া আমার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল! বারবার আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল,—"সে হাসি দেখা আমার অদৃষ্টে নাই ভাই!"

আমি আর আত্মগোপন করিতে পারিলাম না, নিকটে আসিলাম। আমার আগমনে তখনকার মত বসন্তকুমারী ও বিধুভূষণের কথা-ভঙ্গ হইয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভাদ্র মাস! কেবল আমাদের গ্রাম নয়—দামোদরের ভীষণ বন্যায় অন্যূন সহস্রাধিক পল্লীগ্রাম ডুবিয়া আছে। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ গৃহস্থই দরিদ্র। একমাত্র কৃষিকার্য্যই প্রায় সকলের উপজীবিকা। দামোদরের বর্ষার উপদ্রবে কেহ একমুষ্টিও ধান্য পায় না, সকল গৃহেই হাহাকার ধ্বনি! ইহার উপর আজ কয়েকদিন যাবৎ বন্যার জলে পল্লিগ্রামগুলি ডুবিয়া থাকায়, সকলেই প্রায় অনাহারে দিন যাপন করিতেছে। যাহাদের গৃহে ধান চাউলের সংস্থান আছে, তাহারাই কেবল অন্নের মুখ দেখিতে পাইতেছে। আবার ধান চাউল থাকিতেও অনেকে খাইতে পাইতেছে না। কাহার রন্ধনের স্থানের অভাব—বন্যার জলে গৃহাদি সমস্তই ডুবিয়া আছে। কাহার রন্ধনকাষ্ঠের অভাব—বন্যার জলে সমস্তই আর্দ্র হইয়া গিয়াছে! কাহার লবণ, তৈল বা ব্যঞ্জনের অভাব, বন্যার-জন্য এই সমস্ত সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। এই বন্যার সময় আমাদের কষ্টের পরিমাণ বোধ হয় লেখনী-সাহায্যে ব্যক্ত করিতে হইবে না! আমাদের সমুদ্রে-শয্যা, শিশিরের আর কি পরিচয় দিব?

এখন আমাদের গৃহে আমি আর বসন্তকুমারী! ভগ্নী-চারুবালা স্বামীগৃহে। আমার কনিষ্ঠ ভাইটি আমাদের সব্ ডিভিজনের উকিল নবগোপাল বাবুর হেড মোহুরির নিকট কার্য্য শিক্ষা করিতেছে। কনিষ্ঠ প্রতি শনিবারে বাটিতে আসে। প্রতি শনিবারে সন্ধ্যার সময় আমি ভাইটির জন্য পথের মাঝে দাঁড়াইয়া থাকি; যদি কোন দিন আসিতে রাত্রি অধিক হইয়া যায়, তবে উদ্বেগ ও চিন্তায় হৃদয় অস্থির হইয়া উঠে! আমার ভ্রাতার প্রতি আমার হৃদয়ের টান যে কতখানি, কাগজ কলমে লিখিয়া তাহার আর কি পরিচয় দিব? ভাই যে কি জিনিস, যাহাদের ভাই আছে, তাহারাই আমার ভ্রাতার প্রতি স্নেহ-ভালবাসার পরিমাণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। "মায়ের পেটের ভাই কোথায় গেলে পাই?" মায়ের পেটের ভাইয়ের ন্যায় আপনার জগতে আর আছে কি? এক্ মাতৃগর্ভে আমাদের উভয় ভ্রাতার জন্ম, এক মাতৃ-ক্রোড়ে অবস্থান, এক মাতৃস্তন্যে আমাদের পুষ্টি, এক মাতৃ-স্নেহে আমরা লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি; এরূপ ভ্রাতার ন্যায় নিতান্ত আপনার—চির ব্যথার ব্যথি জগতে আমার আর কে আছে? আমরা এক মাতৃগর্ভের দুইটি ভাই, ঠিক আমরা যেন একবৃন্তে দুইটি ফুল! আমাদের এক বৃক্ষে জন্ম, একবৃন্তে অবস্থান, সুতরাং ভ্রাতার ন্যায়

প্রাণাধিক প্রিয়বস্তু জগতে আর কে আছে? এক মায়ের পেটের ভ্রাতার ন্যায় সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, বিপদে সহায়, সম্পদে সহযোগী, জগতে আর দ্বিতীয় আছে কে? যাহার যত বলই থাকুক, যত সহায় সম্পত্তিই থাকুক, ভ্রাতৃবলের ন্যায় বল জগতে আর নাই! এরূপ আন্তরিকতা, এরূপ প্রাণের টান আর কাহার হইতে পারে কি? আমি যখন দুঃখে ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া জগৎ অন্ধকার দেখি, ভ্রাতৃবলই তখন আমাকে আলোকে আনয়ন করে। যাহাদের দেহে পিতামাতার অস্থি, রক্ত, মাংস বর্ত্তমান, যে সহোদর আমার অঙ্গের অর্দ্ধেক, কায়ার ছায়া, তাহার ন্যায় ব্যথার ব্যথি জগতে আর কে হইতে পারে? এই সোনার দেশ ভারতই জানে, ভাই কি জিনিস! যোগী ঋষির বংশধর হিন্দুই জানে, ভাই কি পদার্থ! ভ্রাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃপ্রেম আমাদের দেশ ব্যতীত অন্য দেশে সুদুর্লভ। পাশ্চাত্য দেশে ভ্রাতৃস্নেহ অতি বিরল। মনে হয়, ভ্রাতৃপ্রেমের মহিমা তাঁহারা সাধনার অভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তজ্জন্যই বুঝি তাঁহারা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

ভ্রাতার সহিত নিজের কোন প্রভেদ আছে ইহা হিন্দু কখন মনে করিতে পারে না; বিশেষতঃ আমার ন্যায় পাড়াগেঁয়ে দরিদ্র ব্যক্তি ভ্রাতার সহিত নিজের প্রভেদের কথা কখন কল্পনাতেও আনিতে পারে না!

ভ্রাতার সহিত নিজের কোন প্রভেদ আছে কল্পনাতেও এই পাপ কথা যে দিন মন মধ্যে উদিত হইবে, সেদিন যেন আমার মৃত্যু হয়;—সেদিন এই পাপ জীবনের তিলমাত্র অস্তিত্বও জগৎ পৃষ্ঠে থাকিয়া ধরাধামকে যেন কলঙ্কিত না করে! ভ্রাতাকে যে পর ভাবে, সে নরাধম পিতামাতাকে পর ভাবিয়া পদদলিত করে! পিতা-মাতার রক্ত-মাংস,—পিতামাতার আত্মার অংশ ভ্রাতাতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান! যে কুপুত্র ভ্রাতাকে পর ভাবিয়া দূরে রাখে. সে পিতামাতাকে নিরয়গামী করে, সুতরাং জনক-জননীর আত্মার অভিশাপে সেই হতভাগ্য যে অচীরে ধ্বংসমুখে নিজেকে সমর্পণ করিতেছে, ইহাতে তিল মাত্রও সন্দেহ নাই।

হায়! লিখিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, দুঃখ লজ্জা ও মর্ম্ম-বেদনায় লেখনী চলে না, এই পাপ কথা লিখিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। আমাদের এই হিন্দুর দেশে যে দেশে রামলক্ষ্মণ, পঞ্চপাণ্ডব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেশে, আমাদের এই সোণার হিন্দুর সংসারে ভ্রাতৃপ্রেম ও ভ্রাতৃ-স্নেহের বন্ধনটা যেন অনেক শিথিল হইয়া গিয়াছে! হিন্দুর সংসারে তখনকার মত এখন যেন আর ভাইকে ভাই প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে না, ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার যেন সেরূপ রামলক্ষ্মণ ও পঞ্চপাণ্ডবের মত ঐকান্তিক প্রাণের টান

নাই। ভ্রাতার ব্যথায়, ভ্রাতার দুঃখে, ভ্রাতার মর্ম্মপীড়ায় এখন আর যেন ভ্রাতার অস্থিপঞ্জর ভগ্ন হয় না! হায়! ভ্রাতার হৃদয় হইতে কে সেই পূর্ব্বের অতুলনীয় আবেগ, অমৃতোপম স্নেহ, ভালবাসা অপহরণ করিয়া লইল? হায়! কোথায় সেইদিন—যেদিন পাণ্ডবেরা বলিয়াছিল, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের যে একবিন্দু রক্ত ভূমিতে ফেলিবে, আমাদের কোপানলে তাহাকে ছারখার হইতে হইবে, তাহার বংশে বাতি দিতে কাহাকেও রাখিব না! কোথায় সেদিন, যেদিন লক্ষ্মণ সন্ন্যাসীর বেশে চতুর্দ্দশ বৎসর অনাহার অনিদ্রায় জ্যেষ্ঠের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়াছিল। হায়! কোথায় সেদিন, যেদিন অরণ্যে অগ্রজের পদে একটি তৃণ বিদ্ধ হইলে রোষ ও দুঃখে অনুজ লক্ষ্মণের নয়নযুগলে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত!

যাহাদের দেশের ভ্রাতৃপ্রেমের অসংখ্য উচ্চ আদর্শ বর্ত্তমান, তাহাদের এই হীন দশা কেন হইল? কি পাপে কাহার অভিশাপে সেই ভ্রাতৃপ্রেমের পবিত্র দৃঢ়বন্ধন শিথিল দেখিতে পাই! কুশিক্ষার দোষে আমাদের পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-পরিবেষ্টিত হিন্দুর একান্নবর্ত্তী সংসারে এই পাপ প্রবেশ করিয়াছে! ভারতবাসী, এই পাপ ও স্বার্থপরতা সংসার হইতে দূর করিয়া প্রাণের সহোদরকে বক্ষে জড়াইয়া রাখ, তবেই দেশকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিবে। আমরা

ভারতবাসী হিন্দুর সন্তান, রামলক্ষ্মণ, পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতি ভারতের ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীরগণ আমাদের চক্ষের সম্মুখে যে অমূল্য আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন ভ্রাতৃপ্রেমের সেই উচ্চ আদর্শ কখন বিস্মৃত না হই।

আমি পল্লিগ্রামবাসী! পল্লিগ্রামেই আমার জন্ম, শিক্ষা! পাশ্চাত্যবিদ্যা, পাশ্চাত্যশিক্ষা, পাশ্চাত্যদেশবাসীর সংসর্গ আমার অদৃষ্টে কখন ঘটে নাই! ইহা আমার দুরদৃষ্ট কি সৌভাগ্য, তাহা জানি না! সহরের ইংরাজী বিদ্যালয় আমি কখন চক্ষে দেখি নাই, সুতরাং ইংরাজী শিক্ষিত সুসভ্য তোমরা, এই অসভ্য অর্দ্ধশিক্ষিত বা মূর্খ পাড়াগেঁয়েকে দেখিয়া তোমরা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পার। নব্য, সভ্য, শিক্ষিত তোমরা,—পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শে শিক্ষিত, বর্দ্ধিত ও পুষ্ট তোমরা, তোমাদের দলের সহরবাসী হ্যাট-কোট-ধারিগণ ভ্রাতাকে কোন্ চক্ষে নিরীক্ষণ করে, তাহা আমি জানি না! শুনিয়াছি, সহরের বাবুরা নিজ সুখ, স্বার্থ ও অর্দ্ধাঙ্গিনীকে লইয়া এতই ব্যস্ত যে, সহোদরের দিকে লক্ষ্য করিতে অবসর পান না!

আমি জানি, ভাই আমার সর্ব্বস্ব, ভাই আমার সঙ্গের সাথী! আমি যখন রোগশয্যায় ছট্‌ফট্ করি, তখন ভ্রাতাকে সম্মুখে না দেখিলে হৃদয় ফাটিয়া যায়! আমি জানি, রোগে বা বিপদে, মানবে বা যমে আমার প্রাণ

লইয়া টানাটানি করিলে, ভ্রাতা আমার জন্ত তাহার শেষ সম্বল বা দেহের শেষ রক্তবিন্দু ত্যাগ করিতে পারে! আমি ইহাও জানি যে, আমার কনিষ্ঠের রোগ দুঃখ নিবারণ করিতে আমার যথাসর্ব্বস্ব, শেষ কপর্দ্দক—অবশেষে হৃদয়ের কোমল অংশটুকু ছিন্ন করিয়া দিতে পারি।

কনিষ্ঠকে কার্য্য শিক্ষা করিতে দিয়া আমার চিন্তার মাত্রা, হৃদয়ের দুঃখাগ্নি আরও হু হু করিয়া বাড়িতেছে। আমার ভ্রাতাকে হেড্ মোহরা বড়াল মহাশয়ের রাঁধুনির কার্য্য করিতে হয়, ইহা আমার একবারেই অসহ্য! একদিন আমি ভাইটিকে দেখিতে গিয়াছি, তখন বেলা আড়াই প্রহর অতীত! ভাইটির অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, সকলকে আহারাদি করাইয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়াছে। ভ্রাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, পিতামাতাকে মনে পড়িয়া বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ প্রায় হইতে লাগিল। কি করিব, উপায় নাই! গৃহে আসিয়া বসন্তকুমারীকে সমস্তই বলিলাম। বসন্তকুমারী বসনাঞ্চল দিয়া বারবার চক্ষু মুছিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের রজনী। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আর একদিন ব্যতীত এরূপ নিবীড় অন্ধকার রজনী আমার জীবনে আর কখন দেখি নাই! মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে! অদূরে বারবার বজ্র-পতনের শব্দ-শ্রুত হইতেছে! আমাদের মাটির দুতলা ঘরের উপর মলিন শয্যায় শুইয়া কত কি ভাবিতেছি! চিন্তার আদি নাই—অন্ত নাই! কখন ভাবিতেছি, হায়! কেন আমি বসন্তকুমারীকে বিবাহ করিয়া এই দুঃখের সংসারে আরও দুঃখ বাড়াইলাম! অন্যের সংসারে গেলে বসন্তকে এত কষ্ট—এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অভাব-রাক্ষসীর সহিত অহোরাত্র যুদ্ধ করিতে হইত না। হায়! বসন্ত ছিন্ন মলিন বস্ত্রে যৌবনে বার্দ্ধক্যের রেখাগুলি অতি যত্নে ঢাকিয়া রাখে! পরক্ষণে আবার কত কি চিন্তা হৃদয় আলোড়িত করিয়া অশ্রুরূপে নয়নপ্রান্ত দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে! এমন সময়, একটি মৃন্ময় প্রদীপ হস্তে বসন্তকুমারী শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। আমি বসন্তের মুখের দিকে চাহিলাম, আমার অন্তর কাঁপিতে লাগিল! তাড়াতাড়ি

উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বসন্ত! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আবার আজ বুঝি বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে-ছিলে? ছি বসন্ত! তোমাকে এত করিয়া বুঝাইতেছি, তবু আমার কথা শুনিবে না? আমি কালই যেখানে হয় চলিয়া যাইব, যেরূপে পারি, একটি চাকরির জোগাড় করিয়া লইব। ঘরে বসিয়া তোমার এরূপ দুর্দ্দশা আমি আর দেখিতে পারিতেছি না!"

একটা কথা এতদিন বলা হয় নাই! এত দুঃখের উপরেও বসন্ত আমাকে কোথাও যাইতে দিত না! যদি কলিকাতা যাইবার নাম করিতাম, বসন্তের চক্ষু দুটি হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে থাকিত। এতদিন যে আমি অসীম অভাব দুঃখ মস্তকে লইয়া চাকরির চেষ্টা না করিয়া গৃহে বসিয়া আছি, তাহা কেবল বসন্তের অশ্রুরাশির ভয়ে।

আমার গৃহত্যাগের ভয়ে বসন্ত ব্যস্তভাবে আমার পায়ে হাত বুলাইতে বসিল। তৈলাভাবে মৃণ্ময় প্রদীপটা নিবিয়া যাওয়ায় বাহিরের জমাট অন্ধকারে ঘরটা ভরিয়া উঠিল। সেই জমাট অন্ধকারের মধ্যে বসন্তের অশ্রুবারির বড় বড় ফোঁটা আমার পায়ে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসন্তের চক্ষুদুটি মুছাইয়া দিয়া, বুকের মধ্যে টানিয়া আনিলাম। কি সর্ব্বনাশ! আমার

হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! বসন্তকুমারির সর্ব্বাঙ্গ এত উষ্ণ যে, আমি অধিক ক্ষণ বসন্তকে বুকে রাখিতে পারিলাম না। বসন্তের প্রবল জ্বর! বসন্তের অসুখ হইলে কখন আমাকে জানিতে দিত না, যাতনা বুকে চাপিয়া বসন্ত সংসারে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিত! না করিলেই বা উপায় কি? দীনহীনা বসন্তের সংসারের কাজ আর কেই বা করিয়া দিবে? আর আমার ন্যায় অক্ষম হতভাগ্য স্বামীকে তাহার অসুখের কথা বলিলেই বা কি হইবে? আমি তাহার কি বা করিতে পারিব? স্বামীর কর্ত্তব্য সহধর্ম্মিণীর পীড়ার সময় শুশ্রুষা ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা। হায়! যে স্বামী সহধর্ম্মিণীর মুখে একমুষ্টি অন্ন দিতে অক্ষম, তাহাকে স্ত্রীর চিকিৎসা বা ঔষধের জন্য বলা অরণ্যে রোদন মাত্র! বুদ্ধিমতী, স্বামী-পারায়ণা বসন্তকুমারী এই সমস্ত ভাবিয়াই বুঝি পীড়ার যাতনা আমার কাছে গোপন করিত! কিন্তু বসন্ত পূর্ব্বে যাহা নীরবে সহ্য করিতে পারিয়াছে, এখন আর সে যন্ত্রণা মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে পারিতেছে না! এখন একটি অষ্টম মাসের শিশু বসন্তের বক্ষের রক্ত শোষণ করিয়া উদরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে! দুঃখের সংসারে ভগবান এ উপসর্গ কেন দিলেন, তাহা কেবল তিনিই বলিতে পারেন!

সেই নিবীড় অন্ধকারে উদাস নয়নে চাহিয়া আমি বসন্তকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বসন্ত! তোমার কি জ্বর হইয়াছে?"

বসন্ত ধীরে ধীরে অস্ফুট স্বরে বলিল, "বোধ হয় একটু হইয়াছে।"

আমি।—তবে আমায় বল নাই কেন বসন্ত?

বসন্ত।—বেশী হইলে বলিতাম, সামান্য একটু গা গরম হইয়াছে বৈ ত নয়?

আমি।—ইহা যদি সামান্য হয়, তবে বেশী কাহাকে বলে বসন্ত? সামান্য ক্ষণ তোমায় বুকে রাখিয়াছি, কিন্তু তোমার দেহের তাপে আমার শরীর ঝল্‌সিয়া যাইতেছে!

বসন্ত বলিল, "শেষ প্রহরে জ্বর ছাড়িয়া গা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। এমন নিত্যই হয়, এর জন্য ভাবনা কি?"

"এমন নিত্যই হয়, এর জন্য ভাবনা কি!" বসন্তের কথা শুনিয়া আমার অন্তরাত্মা শুখাইয়া গেল। "এত প্রবল জ্বর, তোমার এই ক্ষীণ দেহে কতদিন সহ্য করিতে পারিবে বসন্ত?" এই বলিয়া আমি বসন্তকে আবার বুকে জড়াইয়া ধরিলাম। বসন্ত নানা কথা বলিয়া এই কথাটা আমাকে ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ভুলাইবার নিষ্ফল প্রয়াস! "এমন নিত্যই হয়" বসন্তের এই কথাটা বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া, প্রতিধ্বনিত হইয়া, মুহুর্মুহু

সজোরে আমার বক্ষে আঘাত করিতে লাগিল। হায়! সে আঘাত কি ভীষণ। এখনও মনে পড়িলে চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী সব যেন আমার চক্ষের সম্মুখে ডুবিয়া যায়। নিবীড় অন্ধকার ব্যতীত আমি আর কিছুই দেখিতে পাই না।

বসন্তের একটা অসাধারণ শক্তি ছিল। অন্য স্ত্রীর সে শক্তি আছে কি না আমি জানি না। যাহার এই শক্তি আছে, তিনি মানবী নহেন, দেবী! এরূপ অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বর্গীয়া লতা যে তরুতে জড়িত, তাহার জীবন ধন্য। "এমন জ্বর নিত্যই হয়" এই কথা বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া এতক্ষণ আমার বক্ষ পঞ্জরগুলি বিদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু বসন্তকুমারী এরূপ অমিয়সিক্ত প্রেমভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আমার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল যে, কে যেন আমার বিদ্ধস্থানে কোমল হস্ত বুলাইয়া বেদনা স্থান নিরাময় করিয়া দিল। আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বসন্তের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। আজ বলিয়া নহে, যে দিন, যখনই আমি অসহ্য দুঃখ-যাতনা বুকে করিয়া বসন্তের কাছে আসিতাম, বসন্ত আমার মুখের পানে চাহিয়া অন্তরের বেদনা বুঝিতে পারিত এবং মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া প্রেমভক্তি-পূরিত হৃদয়ে অমূল্য বাক্য-সুধা ঢালিয়া আমার হৃদয়-যাতনা মন্ত্রৌষধির ন্যায় অপসারণ করিয়া দিত। অমিয় বচন-সুধা-রূপ প্রলেপ দানে আমার হৃদয়

বেদনা নিরাময় করিয়া বসন্ত আমার দুটি হাত ধরিয়া বলিল, "স্বামিন্! তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে, কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত আমাকে একেলা রাখিয়া আর কোথাও যাইতে চাহিবে না!" বসন্তের প্রেম-ভক্তি-মিশ্রিত ব্যাকুল প্রাণের কথা কয়টি শুনিয়া আমার চক্ষু দুটি আর্দ্র হইয়া উঠিল। অশ্রুসিক্ত নয়ন হইতে অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া বড় বড় দুটি অশ্রুবিন্দু বসন্তকুমারীর জীর্ণ মলিন বস্ত্রে ঝরিয়া পড়িল। বসন্তকুমারী তাহা বোধ হয় দেখিতে পাইল না। বসন্তকুমারী কেন আমাকে এই অনুরোধ করিতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, ভাবিলাম, কার্ত্তিক মাসে বসন্তের দশ মাস পূর্ণ হইবে। এই দশ মাস গুর্বিণীর জীবন মরণের সন্ধিস্থল। সংসারের অভাব-রাক্ষসী সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে; দুঃখ-দৈন্য আমাদের প্রতি পদক্ষেপে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। এই ভীষণ অবস্থায় প্রসবের সময় যদি আমি না থাকি, তবে বসন্তের আর অবলম্বন কি আছে? এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই বুঝি বসন্ত আমাকে গৃহে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। হায়! তখন কি আমি জানিতাম, সাধ্বী বসন্তকুমারী ভবিষ্যতের যবনিকা উত্তোলন করিয়া সমস্তই দেখিতে পাইয়াছে।

আমি বসন্তকে আরও বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া

স্নেহভরে তাহার সেই রক্তহীন, শুষ্ক অত্যুষ্ণ ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া বলিলাম,—"না বসন্ত! যতদিন না তুমি প্রসব হও, ততদিন আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইব না! অভাব—শত সহস্র অভাব আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলুক, দুঃখ—জগতের দুঃখরাশি একত্রিত হইয়া আমাদের উভয়ের ললাটোপরি আসন পাতিয়া উপবেশন করুক, সকলই সহ্য করিব, অনাহারে মরিব, তবু তোমাকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইব না।"

বসন্তকুমারী আমার কথা শুনিয়া একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল,—"প্রভু! আমার জন্যই আপনাকে এত দুঃখ সহ্য করিতে হইতেছে; আমার দুরদৃষ্টের সঙ্গে আপনার অদৃষ্ট গ্রথিত বলিয়াই বুঝি আপনিও দুঃখ ভোগ করিতেছেন; আমি যদি না থাকিতাম—"

বাধা দিয়া আমি বলিলাম, "তুমি না থাকিলে কি হইত বসন্ত?"

"আমি না থাকিলে আপনি যেখানে ইচ্ছা গিয়া দুঃখের হাত এড়াইতে পারিতেন। সংসারের সকলেরই উপার্জ্জনের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, আপনারও কি একটা উপায় হইত না? আমিই আপনার পায়ের শৃঙ্খল হইয়াছি! কেন যে আপনাকে চক্ষের অন্তরালে রাখিয়া থাকিতে পারি না,—তাহা ভগবানই জানেন।

বসন্তকুমারী আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া বসন্তকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলাম। আমার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া বামহস্তে আমার গলদেশ বেষ্টন করিয়া বসন্তকুমারী বলিল, বলুন দেখি প্রভু! আমার ন্যায় আবার সুখী কে? আপনার মলিন মুখের দিকে চাহিলেই আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়,—আমার নিজেরত কোন কষ্টই নাই! বসন্তের কথাগুলির প্রতি তখন আমার মনোযোগ ছিল না। তখন হাতে করিয়া নাড়িতেছিলাম বসন্তের সেই সুদীর্ঘ, রুক্ষ কেশরাশি; হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতেছিলাম— বসন্তের ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাস,—আর বার বার কর্ণে প্রতি-ধ্বনিত হইতেছিল বসন্তকুমারীর সেই মর্ম্মভেদী কথাটি— "আমি যদি না থাকিতাম—।"

আমি অধীর হইয়া বলিলাম, "ভগবান জানেন বসন্ত! আমার জগদ্ধাত্রীরূপিণী জননীর মৃত্যুর পর এই দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ সংসারে,—এই ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতপূর্ণ দুঃখ-সমুদ্রে অর্দ্ধ নিমজ্জিত জীর্ণ সংসার-তরণীখানি তুমি যদি না ধরিয়া থাকিতে, তবে প্রাণের কনিষ্ঠের হস্ত ধারণ করিয়া কোথায় এতদিন ভাসিয়া যাইতাম? কে বলিতে পারে, আমাদের অস্তিত্ব থাকিত কি না? তুমি যদি না থাকিতে বসন্ত। তবে কে জানে এতদিন আমরা উভয়

ভ্রাতায় কোন্ দেশের কোন্ বৃক্ষতল আশ্রয় করিতাম? অতি কষ্টে সংগ্রহ করিয়া ক্ষুধায় এক মুষ্টি অন্ন—পিপাসায় পানীয়—দুঃখে সান্ত্বনা,—পীড়ায় সুশ্রুষা—তোমার অভাবে কোথায় পাইতাম বসন্ত? আজও যে আমরা জীবিত আছি, তাহা কি কেবল তোমার জন্য নয়? হাহাকারময় দুঃখের সংসারে রোগ যন্ত্রণায় মলিন জীর্ণ শয্যায় পড়িয়া বিনা চিকিৎসায়—বিনা ঔষধে যখন ছট্‌ফট করি, তখন রক্তহীন তোমার পবিত্র কোমল হস্তদুখানিই যে আমাকে রোগ-যন্ত্রণা বিস্মৃত করিয়া দেয়! কি ছার অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা! রোগশীর্ণ-কপোলোপরি তোমার কোমল হস্ত সঞ্চালনেই পীড়ার তীব্র প্রতাপ কোথায় দূর হইয়া যায়! রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে তোমার অমিয় মধুর বচন-সুধাই তেজবীর্য্য ঔষধ অপেক্ষা অচিরে আমার রোগ যন্ত্রণা নিবারণ করে! ঔষধহীন, পথ্যহীন, কপর্দ্দকহীন, রোগজীর্ণ দেহে কোটরগত চক্ষু লইয়া ভগবানের এই অসীম জগতে চাহিয়া দেখি, আপনার বলিতে কেহ নাই! সাহায্য, সহায়, সম্বলহীন হতাশ হৃদয়ের উষ্ণ শ্বাস যখন ঘন ঘন বহিতে থাকে, যখন অশ্রু-বারিতে মলিন রোগ-শয্যা সিক্ত হইয়া যায়, তখন চাহিয়া দেখি, এই দেবীরূপিণীর দুইখানি কোমল হস্ত সংসারের কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া প্রেম, ভক্তি, ভালবাসার অঞ্জলি লইয়া

আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! বসন্ত! তখন আমি রোগ-যন্ত্রণা, দুঃখ-দরিদ্রতা সকলই বিস্মৃত হইয়া যাই! মনে হয়, এই দরিদ্রতা আমার সুখের,—এই রোগ যন্ত্রণায় সুখ আছে, শান্তি আছে,—এই মলিন রোগশয্যা আরামের দুগ্ধফেননিভশয্যা অপেক্ষাও শান্তিদায়িনী! তবে কেন নিষ্ঠুর হৃদয়ার ন্যায় বল বসন্ত—"আমি যদি না থাকিতাম!"

আমি হৃদয়ের আবেগে বসন্তকে আরও কি বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু বসন্ত তাড়াতাড়ি তাহার সেই সুকোমল রক্তহীন উষ্ণ হস্তে আমার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "স্বামিন! না বুঝিয়া একটি কথায় আপনার প্রাণে বেদনা দিয়াছি, আশ্রিতা অধিনীকে কি ক্ষমা করিবেন না? বসন্তের নির্ম্মল স্বভাব-সিদ্ধ বচন সুধাপানে বিভোর হইয়া সকলই বিস্মৃত হইলাম। দুঃখ দারিদ্র্য, অন্নকষ্ট সকলই ভুলিয়া আমি যেন কোন্ প্রাণারাম অজানিত দেশে উপস্থিত হইলাম। যে দেশে দুঃখ নাই, দরিদ্রতা নাই, অন্নকষ্ট নাই, দরিদ্রের হা-হুতাশ নাই, দরিদ্রের প্রতি ধনবানের ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নাই, আমি যেন সেই দেশে গিয়া বসন্তের বক্ষে ঢলিয়া পড়িলাম! ঠিক এই সময়ে আমাদের গৃহের অদূরে ভীষণ শব্দে বজ্রপতন হইল! বসন্ত বাহু-লতায় আমার গলা জড়াইয়া ধরিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসন্তের মুখে একটীও কথা বাহির হইল না,—কেবল ঘন ঘন তপ্ত নিশ্বাস সজোরে আমার বক্ষে আসিয়া পড়িতে লাগিল! কাল মেঘের ন্যায় বসন্তের সেই ঘন কৃষ্ণ কেশগুলি নাড়িতে নাড়িতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বসন্ত! ভয় পাইয়াছ?" বসন্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না।"

"তবে কেন তুমি এরূপ বিমর্ষভাবে রহিয়াছ বসন্ত?"

বসন্ত আবার একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "অন্ধকার আকাশের এই প্রলয়কাণ্ড দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, আবার বুঝি আমাদিগকে কোন বিপদে পড়িতে হইবে!"

"বিপদের আর বাকি কি বসন্ত? ইহার অধিক আমাদের আর কি বিপদ হইবে! ভগবান কি মানুষের জন্য ইহার অধিক আরও অন্য নূতন বিপদের সৃষ্টি করিতে পারেন? বাল্যকাল অতি সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু সে সুখের কথা এখন আমি স্বপ্ন বলিয়াই উড়াইয়া দিই! দেব-সদৃশ পিতাকে হারাইয়াছি, জগদ্ধাত্রিরূপিণী জননীকে চিরজীবনের মত দুঃখ-সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিয়াছি, অন্নকষ্টের ভয়ে ভগ্নিটি পলাইয়াছে, তোমার ন্যায় প্রিয়তমা স্ত্রীকে লজ্জা নিবারণের জন্য একখানি বস্ত্র, এমন কি, ক্ষুধায় অন্ন দিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নাই। এই হত-

ভাগ্যের চক্ষের সম্মুখে তোমার স্বর্ণকান্তি দেহে কালিমা পড়িতেছে, আর আমি স্থির নয়নে অহোরাত্র তাহাই দেখিতেছি! প্রাণের সহোদর যাহার মুখ দেখিয়া জনক-জননী মৃদু মৃদু হাস্যে স্বর্গসুখ অনুভব করিতেন, লক্ষ্মণ সদৃশ আমার সেই ভ্রাতা মাসিক দুই একটি মুদ্রার জন্য পরের পাচকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নীরবে সকল কষ্ট সহ্য করিতেছে! আর আমি ভিখারির অধম হইয়া দুঃখ-দৈন্যের তীব্রতাপে সর্ব্বক্ষণ দগ্ধ হইতেছি! হায় বসন্ত! ইহাপেক্ষা আরও কি বিপদে পড়িব?"

আমার দুঃখের কথায় বসন্ত আবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বসন্তের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকার দ্বিপ্রহর রজনীতে আমাদের গ্রামের চতুর্দ্দিক হইতে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল। কি ভীষণ চীৎকার! হায়! সে দিনের কথা মনে পড়িলে আজও বক্ষের অস্থিপঞ্জর যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

চারিদিকে "গেল গেল, সব গেল" এই ভীষণ রব! "রক্ষা কর! প্রাণে বাঁচাও", এই চীৎকার ধ্বনি! এই আর্ত্তরবে প্রাণ বিদীর্ণ হয়। পৃথিবী বুঝি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া শূন্যে উড়িয়া গেল। অথবা বিধাতার সৃষ্টি বুঝি অন্ধকারে ডুবিয়া যায়! না! না! আমাদের দেশটা চিরতরে অতল-জলে নিমজ্জিত হইল।

আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ আমাদের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। একটু প্রকৃতিস্থ হইবার পর আমরা উৎকর্ণ হইয়া চারিদিকের হাহাকার ধ্বনি শুনিতে লাগিলাম। কেহ বলিতেছে, হায়! হায়! আমার সব গেল। কেহ বলিতেছে, আমার বাছাকে তোমরা ধর, ঐ ভাসিয়া গেল। কেহ বলিতেছে, আমার গরুবাছুর সব ভাসিয়া গেল, আমার অপোগণ্ড শিশুর মুখের গ্রাস ধান্যগুলিও ধরিতে পারিলাম না, বাছারা আমার কি খাইয়া বাঁচিবে। এইরূপ প্রাণভেদী কাতর চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে গৃহ-পতনের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। এতক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম, ভীষণ দামোদর নদের প্রবল বন্যা-স্রোত দুই ক্রোশব্যাপী বেগোর মোহান বা খাল দিয়া প্রবাহিত হইয়া আমাদের গ্রামগুলি ধ্বংসমুখে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।

এইবার আমাদের নিকটস্থ প্রতিবাসীদের গৃহ বন্যা-স্রোতে পতিত হইতে লাগিল। পাছে আমাদের মাটির দ্বিতল গৃহখানিও পড়িয়া যায়, এই ভয়ে বাহিরে যাইবার জন্য বসন্ত আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। চারি-দিকের কাতর চীৎকার ধ্বনিতে আমি কি এক প্রকার হইয়া গিয়াছিলাম। বসন্ত আমার অবস্থা বুঝিয়া বলপূর্ব্বক হস্ত ধারণ করিয়া নীচে নামাইয়া আনিল।

হরি! হরি! একি? বসন্ত আমাদের শয়ন-গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিবামাত্র বন্যা-স্রোত প্রবলবেগে আমাদের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বন্যার জল আমাদের উভয়ের কটিদেশ পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া দিল। সেই অন্ধকারে চাহিয়া দেখিলাম, আমাদের গৃহ প্রাঙ্গণ বন্যার জলে সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছে, কাহার সাধ্য আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে এক পা অগ্রসর হয়। দেখিতে দেখিতে বন্যার জল বৃদ্ধি হইয়া আমাদের বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া দিল। বসন্ত কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল—"হা ভগবান! এ আবার কি পরীক্ষা!" এতক্ষণ আমার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হয় নাই। বসন্তের মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে আমার চৈতন্য হইল। দুই হস্তে বসন্তের গলদেশ বেষ্টন করিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিলাম, "বসন্ত! আমরা উভয়ে একসঙ্গে মরিব ইহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু মৃত্যু সময়ে একবার প্রাণের কনিষ্ঠের সঙ্গে দেখা হইল না, বড়ই খেদ রহিল।" রোগক্লিষ্ট বসন্তের সেই পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন মুখকমলে তাহার সেই রোগক্লিষ্ট সুন্দর আয়ত-লোচন আমার কথায় যেন জ্বলিয়া উঠিল! মুখের কি এক সুন্দর দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইয়া সেই অন্ধকার গৃহ উদ্ভাসিত করিয়া দিল। দৃঢ়হস্তে বসন্ত আমার হস্তধারণ করিয়া বলিতে লাগিল,—

"স্বামিন! দেবতা! বিপদে অধৈর্য্য হইয়া ভগবানে বিশ্বাস হারাইবেন না। উপরে ভগবান আছেন, ইহা কি বিস্মৃত হইলেন। সদর্পে,—সগৌরবে বিপদকে আলিঙ্গন করিয়া ভগবানের ইচ্ছা হাসিমুখে পূর্ণ হইতে দিন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর মঙ্গল ইচ্ছায় চালিত হইতেছে, যাঁহার ইঙ্গিত আদেশে রবি, শশী, গ্রহ তারার উদয় অস্ত ঘটিতেছে, তাঁহারই ইচ্ছায় আমরা আজ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি। জানি না প্রভু! ইহা ভাল কি মন্দ! যাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা ব্যতীত ক্ষুদ্র বৃক্ষের একটি শুষ্ক পত্রও ধূলিতে লুণ্ঠিত হয় না, আমাদের এই বিপদের মধ্যে তাঁহার যে মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত নাই, ইহা কি আপনি বিশ্বাস করিবেন? যাঁহার ইচ্ছায় জীবের জীবন, তাঁহারই ইচ্ছায় জীব মৃত্যুরাজ্যে অগ্রসর হয়। তবে কেন আপনি ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা বিস্মৃত হইতেছেন দেব? যদি আমাদের মৃত্যুই তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার মাঝে নিহিত থাকে, পূর্ণ হউক তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা! আসুন, হাসিমুখে করযোড়ে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্বপাতাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার নিকট ক্ষুদ্র জীবনকে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হই। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কালের মাঝে আমাদের আত্মাও অনন্তরূপে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। আমার প্রাণের সহোদর-সদৃশ দেবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ আজ না হয় পরজন্মে ঘটিবে, ইহাতেই বা

ক্ষোভ কি আছে দেব! বিপদে পতিত হইয়া মৃত্যুভয়ে আমরা কি বিস্মৃত হইব—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি
নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো
ন শোষয়তিমারুতঃ॥

বসন্তের আঁখি-যুগল হইতে কি এক অভূত অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্যরশ্মি নির্গত হইতে লাগিল। আমি অমিমেষ-লোচনে বসন্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সকলই ভুলিয়া গেলাম। মনে হইতে লাগিল, কোন্ সুখময় স্বপ্নরাজ্যে কি কল্পনাময় স্বর্গরাজ্যের সজীব-দেবী-প্রতিমার হস্ত ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। আবার বসন্তের মুখের দিব্য-জ্যোতিতে আমার হৃদয় মন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নীরবে অনিমেষ নয়নে বসন্তের মুখের পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলাম, জানি না বসন্ত! তুমি আমার হৃদয়ের অধীশ্বরী—কি স্বর্গরাজ্যের দেবী! তুমি আমার অন্ধকার গৃহের—আঁধার জীর্ণ হৃদয়ের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী, কি সুখময় স্বর্গরাজ্যের প্রেমময়ী. ভক্তিময়ী রমণী!

বসন্তের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া আমি কতক্ষণ নিশ্চল নিস্পন্দ হৃদয়ে সুখময় স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলাম জানি না। যখন বিহগকুলের কাতর চীৎকারে কাকের

ভীষণ কা কা স্বরে, গাভীর আকুল হাম্বারবে, গ্রাম-বাসীগণের হৃদয়ভেদী কাতরক্রন্দনে আমার প্রাণারাম সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গেল, তখন বুঝিতে পারিলাম, কালনিশি প্রভাত হইয়াছে, প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে গরিবের শেষ সম্বল—আমাদের যাহা কিছু ছিল সমস্তই বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে; গ্রামবাসী ও প্রতিবাসীগণের সর্ব্বস্ব গিয়াছে, আমার গৃহগুলি বন্যার স্রোতে সমস্তই ভাসিয়া গিয়াছে, কেবল যে গৃহে আমরা দাঁড়াইয়া আছি সেইখানি এখনও ভূমিসাৎ হইয়া স্রোতমুখে ভাসে নাই, আর আমি অর্দ্ধমগ্ন অবস্থায় বসন্তের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সব ফুরাইল! জগতে বুঝি আমার বলিতে কিছু থাকিবে না। এতদিন অনশনে অর্দ্ধাশনে থাকিয়া যে গৃহে মাথা গুঁজিয়া ছিলাম, দামোদরের ভীষণ বন্যায় তাহাও ভাসাইয়া লইয়া গেল। আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমার অদৃষ্ট সত্য সত্যই আমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বৃক্ষতল দেখাইয়া দিল। যে গৃহে বসন্ত পাকাদি করিত, সেই রান্না ঘরখানির চিহ্নমাত্রও নাই। গোয়াল, চণ্ডি-মণ্ডপ, এমন কি, প্রাচীরের একগাছি তৃণও দেখিতে পাই না। মাটির দ্বিতল শয়ন-গৃহখানি দামোদরের ভীষণ স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিয়া যদিও নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, কিন্তু তাহাকে কর্দ্দমের স্তূপ বলিলেই হয়। ভগবানের এই বিশাল জগতে আজ আমাদের একটু দাঁড়াইবার স্থান নাই? পাঠক! আমাদের অবস্থা কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে? যদি না পার, একবার কল্পনা-নেত্রে চাহিয়া দেখ। ঘরে এক মুষ্টি অন্ন নাই, জনক-জননীর সুকোমল শয্যাগুলি যাহা এতদিন জীর্ণ-ছিন্ন মলিন অবস্থায় তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি বুকে করিয়া দীনাতি-

দীন পুত্র পুত্রবধূকে সংসারের শ্রান্তি ক্লান্তি নিবারণের জন্য সাদরে বক্ষ পাতিয়া দিতেছিল, তাহারা মৃত্তিকা-স্তূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পিতা মাতার স্মৃতি তাহাদের বক্ষে ছিল বলিয়াই বোধ হয় আমাদের এ অবস্থা তাহারা আর দেখিতে পারিল না। গর্ভবতী, রোগ-প্রপীড়িতা, পাণ্ডুবর্ণা, বসন্তকুমারী ছিন্ন আর্দ্রবস্ত্রে কদলিপত্রের ন্যায় মুহুর্মুহু কম্পিত হইতেছে। হায়! গৃহে এমন একটু শুষ্ক ছিন্নবস্ত্রখণ্ডও নাই যে, বসন্তের জীবন রক্ষা করি! যেদিকে চাহি, কিছুই নাই। সব যেন ধূধূ করিতেছে। আমার পিতৃ-পিতামহের পবিত্র বাস্তুভিটা, আমার জনক-জননীর অতি স্নেহের—অতি আদরের ভদ্রাসন আজ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। শ্মশানের নির্ব্বাপিত ভস্মরাশির ন্যায় আমাদের নির্ব্বাপিত সংসারের কর্দ্দমরাশি স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। আমি পাগলের ন্যায় উদাস নয়নে ইতস্ততঃ চাহিতেছি। বসন্তের অবস্থা দেখিয়া হৃদয় ফাটিয়া যাই-তেছে, ইচ্ছা হইতেছে, হৃদ্‌পিণ্ডটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলি। কখন বক্ষে সজোরে আঘাত করিতেছি, পরক্ষণেই গৃহের চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আবার দৌড়িয়া আসিয়া বসন্তের কম্পিত-দেহ নিরীক্ষণ করিতেছি। বলিতে পার তোমরা, আমার চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে না কেন? অশ্রু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অশ্রুপাতের একটা

সীমা আছে, আমার আজ সে সীমা অতীত। হা ভগবান! দীনা শীর্ণা বসন্তকে কিরূপে রক্ষা করি? এ কষ্ট বসন্ত আর অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিবে না। একটু অগ্নি জ্বালিবার জন্য চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। একটি শুষ্ক তৃণখণ্ডও কোথাও দেখিতে পাইলাম না। শোকে, দুঃখে একবার গগনভেদী চীৎকার করিয়া উঠিলাম। বসন্ত আমার অবস্থা দেখিয়া নিকটে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। বসন্তের তখন কথা কহিবার শক্তি ছিল না।

দৌড়িয়া আসিয়া বসন্তকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলাম। আমার অঙ্গস্পর্শে বসন্ত একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া স্তূপাকার কর্দ্দমরাশির উপর বসিয়া পড়িল। আবার চীৎকার করিয়া উঠিলাম। এবার বসন্ত অতিকষ্টে ধীরে ধীরে বলিল,—

"আমার জন্য কেন ব্যাকুল হইতেছেন? কর্ম্মফল ভোগ করিতে দিন। সংসারে থাকিবার দিন যদি নিঃশেষ না হইয়া থাকে, ভগবানই আমাদের রক্ষার উপায় করিয়া দিবেন। যতক্ষণ জীবন থাকিবে, ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় সন্দিহান হইতে পারিব না।" বসন্তের কথায় আমার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল। চীৎকার করিয়া বলিলাম,— "বসন্ত! তুমি কি মৃত্যুকালে প্রলাপ বকিতেছ? এত

কষ্ট দিয়াও কি তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই? বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়াছি, আশ্রয়লাভের একটি তৃণখণ্ডও আমার জন্য তিনি সংসারে রাখেন নাই! সকলই সহ্য করিতে পারি, সহ্যও করিতেছি! কিন্তু তোমার এই অসহ্য যন্ত্রণা, আমার সম্মুখে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছায় তোমার এই মৃত্যু-আলিঙ্গন আর সহ্য করিতে পারি না! ইহা কি তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা, না মূর্ত্তিমান নৃশংসতা!!

বসন্ত অতি কষ্টে কম্পিত হস্তে আমার মুখ চাপিয়া বলিল,—"কেন আপনি ভগবানের প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিতেছেন? তাঁহার দয়া অসীম! জীবের কর্ম্মফল জীবেরই প্রাপ্য! তিনি সুবিচারক—জীবের প্রাপ্য যাহা, তাহা তিনি হরণ করিয়া লইতে পারেন না! স্থির-চিত্তে তাঁহার আদেশ পালন করুন। বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন ও দুঃখ কষ্ট অকাতরে সহ্য করাই তাঁহার আদেশ! তিনি মায়াময়, তাঁহার দয়ার নিদর্শন এখনই দেখিতে পাইবেন।"

আমি আবার চিৎকার করিয়া বলিলাম, "তাঁহার দয়ার নিদর্শন এই হতভাগ্যের সম্মুখে তোমার মৃত্যু-দর্শন এবং নিজ হস্তে আমার হৃদয়ের হৃৎপিণ্ড উৎপাটন।"

"নাথ! অধৈর্য্য হইবেন না! যদি তাহাই হয়, বুক পাতিয়া সে শোক সহ্য করিতে প্রস্তুত হউন, ইহাই দাসীর শেষ প্রার্থনা।"

অদূরে জল-কল্লোলের মধ্য হইতে "দাদা! দাদা!" এই প্রাণারাম সুধামাখা স্বর কর্ণে প্রবেশ করিল। প্রাণাধিক কনিষ্ঠের কণ্ঠস্বর ব্যতীত এরূপ স্নেহ-ভক্তি-আকুলতা মিশ্রিত হৃদয়-বিমোহনকারী স্বর আর কার হইতে পারে?

আনন্দে লম্ফ প্রদান করিয়া চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ এরূপ অবস্থায় ছিলাম মনে নাই। যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন দেখিলাম, আমার মস্তক বিকৃত হইয়াছে ভাবিয়া, কর্দ্দম-লুণ্ঠিত-দেহে একদিকে অতি কষ্টে হস্ত প্রসারণ করিয়া বসন্তকুমারী আমাকে ধরিতে আসিতেছে; অন্যদিকে অকূল সমুদ্রের ন্যায় জলরাশির উপর একটি জীর্ণ ডোঙ্গা ভাসাইয়া আমার কনিষ্ঠ দ্রুতবেগে শ্মশানভূমি সদৃশ আমাদের বাসভূমি লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া, পরস্পর যে আমরা এখনও জীবিত আছি, এই আনন্দেই তখন আমরা আত্ম-হারা হইয়া পড়িলাম। আমাদের চির আরাধ্য জন্মভূমির শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, প্রাণের সহোদর উদাস নয়নে চাহিয়া রহিল! হায়! ভ্রাতার ক্ষুদ্র হৃদয়ে তখন কি অসহনীয় যন্ত্রণা! এক রক্ত-মাংসে গঠিত ভ্রাতার হৃদয় ব্যতীত অন্যে কে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে? শোক দুঃখের

সময় অতীত ভাবিয়া এবং বসন্তের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শীতল বাগ্‌দী (আমাদের বাল্যের শীতল দাদা) আমাদিগকে ডোঙ্গায় তুলিয়া ডোঙ্গা বাহিতে লাগিল। এই সময় বসন্তকুমারী অস্ফুটস্বরে আমার কানে কানে একবার বলিল, "ভগবানের করুণা প্রাণ ভরিয়া একবার হৃদয়ঙ্গম করুন।"

অদূরে আমার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতার ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতল গৃহে কয়েক দিনের জন্য আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। হায়! সংসার বড়ই ভীষণ স্থান! এইরূপ ভয়াবহ ভীষণ স্থান অসীম ব্রহ্মাণ্ডে আর কোথাও আছে কি না জানি না! সকলেই স্বার্থরাশি বুকে করিয়া সংসারে বিচরণ করিতেছে! স্বার্থ ব্যতীত কেহ এক পদও অগ্রসর হইতে চাহে না! তাই বুঝি, মহাপুরুষগণ সংসারকে ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিয়া বনবাস আশ্রয় করিতেন। সংসারের লোক যে অপরকে সাহায্য করে, তাহা কেবল নিজ স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষে। মুখে যে যতই উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিউক, বিনা স্বার্থে যে যতই পরের উপকার করিতে অগ্রসর হউক, তাহাদের হৃদয়ের অন্তস্থলে বর্ত্তমান বা দূর ভবিষ্যতের স্বার্থলাভের আশাবহ্নি ধিকিধিকি জ্বলে না, সংসারে এরূপ মহাপুরুষ অতি অল্পই আছেন। আমরা বন্ধুত্বের ভাণ করি, স্বার্থের

গুপ্ত মন্ত্র হৃদয়ে লইয়া; সংসারে নিঃস্বার্থ, সরল, অকপট বন্ধু কাহার কয়জন আছে? যাহার আছে, তাহার ন্যায় সুখী কে? আমরা আত্মীয় প্রতিবাসীর বিপদে সাহায্য করিতে যাই—গরলপূর্ণ স্বার্থরাশি সঙ্গে লইয়া! প্রতিবাসী, বন্ধু, বান্ধবদের বিপদে সাহায্য করিতে যাইয়া কখন মনে করি, আমার অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিলে ইহারা সাহায্য করিবে; কখন ভাবি, বর্ত্তমান বা সুদূর ভবিষ্যতে ইহাদের দ্বারা কোন না কোন স্বার্থসিদ্ধি ঘটিবে। ধনবান আত্মীয় প্রতিবাসীর বিপদে সাহায্য করিতে যাইয়া লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করি! দীন দরিদ্র আত্মীয় প্রতিবাসীর সাহায্য করিতে যাই, লোকের প্রশংসা অর্জ্জনের জন্য অথবা তাহাকে বাধ্য করিয়া স্বকার্য্য সাধনের আশায়। হায়! নিঃস্বার্থ পরোপকার-প্রবৃত্তি সংসারে কয়জনের আছে? যাহার আছে, তিনি মানব কি দেবতা তাহাও ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে উপলব্ধি করিবার আমার সামর্থ্য নাই! প্রেম-ভালবাসা-পূর্ণ হৃদয়ের টানে, পবিত্র নিঃস্বার্থ প্রাণে প্রকৃত দুঃখিজনের আপন ভুলিয়া যে পরোপকার করিতে অগ্রসর হয়, প্রকৃত নিরাশ্রয় আতুর জনকে যে বিশাল পবিত্র বক্ষ পাতিয়া দেয়, জানি না তাঁহার আসন স্বর্গ রাজ্যের কোন্ উচ্চ স্থানে অবস্থিত! সংসারে এরূপ মহাপুরুষ বিরল হইলেও

যাঁহারা আছেন, তাঁহারাই এই দুঃখ ও অশান্তি-পূর্ণ সংসারের সুখ-শান্তির পথ নিজ পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতিফলে আবিষ্কার করিয়াছেন। স্বার্থপর পশু-প্রকৃতি মানবের মাঝে আত্মত্যাগী দেব-প্রকৃতি মানবের মুক্ত আত্মা বিপন্নের উদ্ধারের জন্য, পীড়িতের পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম্ম বা সত্যের মাহাত্ম্যরক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হয় না! আমাদের ন্যায় স্বার্থপর কুটীল পাপী-তাপীর নয়নে এরূপ মহাপুরুষদের দর্শন লাভ সহজে ঘটে না; তাই এই স্বার্থপূর্ণ সংসারে স্বার্থপর মানব-রাজ্যে বসন্তের সহিত আমার আকুল ক্রন্দনই সার হইতেছে। ক্রন্দন-রোল সংসারে কাহার কর্ণে নিমিষের তরেও প্রবেশ করিতেছে না।

আমার ন্যায় দীন নিরাশ্রয় ব্যক্তির দ্বারা বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে কাহার কোন উপকারের আশা ছিল না! সুতরাং আমাদের মাথা গুঁজিবার জন্য অন্য স্থানের অনুসন্ধান করিতে হইল! ইহার উপর ভীষণ চিন্তার অনল-শিখা অহরহঃ আমার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল! বসন্তকুমারীর প্রসবকাল আগতপ্রায়! হা ভগবান, কোথায় একটু আশ্রয় পাই? বিশ্বপাতার অসীম ব্রহ্মাণ্ডে কি আমাদের মাথা রাখিবার একটু স্থানও নাই? ভাবিয়াছিলাম, বসন্তের প্রসবকাল পর্য্যন্ত এই আশ্রয়দাত্রীর

গৃহেই অবস্থান করিব; কিন্তু আমার দুরাদৃষ্ট দুই বাহু বিস্তার করিয়া সে পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল! এজন্য আমি আমার দুরাদৃষ্ট ব্যতীত আশ্রয়-দাত্রীকে কখন দোষ দিই না! তিনি আমার বিপদে যেটুকু সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব। এক দিন বসন্তকুমারী অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল,—

"আর কত দিন ভিখারিণীর অধম হইয়া এরূপে অবস্থান করিব?"

বসন্তের বিষাদমাখা মলিন মুখ দেখিয়া, তাহার নয়নাশ্রু গোপন করিবার চেষ্টা দেখিয়া, প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না! কিন্তু অক্ষম অর্থহীন ব্যক্তির বুঝা না বুঝা কার্য্যক্ষেত্রে একই ফল! বসন্তের মুখের দিকে চাহিয়া আমার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল; দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, "বসন্ত! কেন তোমার জনক-জননী এই হতভাগ্যের হস্তে তোমাকে মন্ত্রপূতঃ করিয়া সমর্পণ করিয়াছিল?"

বসন্ত তাড়াতাড়ি আমার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"আবার কেন বিপদে অধৈর্য্য হইতেছেন? দিদি শুনিতে পাইলে কি মনে করিবেন? ভগবানে আত্ম নির্ভরতা নিরাশ্রয় জীবের একমাত্র সম্বল।"

বসন্তের পরামর্শে আমার চির আরাধ্য জনক-জননীর পুণ্যক্ষেত্র-বাসভবনে প্রত্যাগমন করাই স্থির করিলাম। স্থির করিলাম, কিন্তু সে সোনার বাসভূমির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মৃত্তিকাস্তূপ ব্যতীত আর কিছুই নাই! কেবল আমার দ্বিতল শয়নগৃহখানি অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় মৃত্তিকাস্তূপ ও পঙ্কিল কর্দ্দমরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছে! গৃহের মধ্যে বন্যার জল গভীর গহ্বর আশ্রয় করিয়া এখনও ভীষণকায় দামোদরের ভীষণত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে! প্রাণের সহোদরকে অন্তরালে ডাকিয়া সকল কথা বলিলাম। ভ্রাতা পরদিনেই গৃহখানিকে আমাদের ন্যায় দরিদ্রের বাসোপযুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। গৃহের মৃত্তিকাস্তূপ ও কর্দ্দমরাশি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ভ্রাতার অহোরাত্র পরিশ্রমের ফল স্বরূপ গৃহখানিতে কোনরূপে আমাদের একটু মাথা রাখিবার স্থান হইল। দুইদিনের পরেই বসন্তকুমারীকে লইয়া আমি সেই কর্দ্দমসিক্ত অর্দ্ধভগ্ন গৃহে প্রবেশ করিলাম। বসন্তকুমারী আমার অগ্রেই মনের আনন্দে তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিল। যে সমস্ত গহ্বরগুলি কনিষ্ঠ মৃত্তিকা দ্বারা সমতল করিয়া রাখিয়াছিল, বসন্ত আনন্দে অসাবধানে তাড়াতাড়ি গৃহ প্রবেশ করায় তাহার জানুদেশ পর্য্যন্ত কর্দ্দমে বসিয়া

গেল! বসন্ত আমার স্কন্ধে ভর দিয়া গৃহপ্রাঙ্গনে আসিয়া বলিল, "মাটিতে প্রবেশ করিলেও আমি আজ নিজের গৃহে আসিয়াছি।" বসন্তের রক্তহীন শুষ্কওষ্ঠে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

বসন্তকুমারীকে লইয়া আমরা যে গৃহে বাস করিতে লাগিলাম, তাহা লেখনী-মুখে ব্যক্ত হইবার নহে। কুক্কুর শৃগালও এরূপ কদর্য্য স্থানে অবস্থান করিলে চিৎকার করিয়া দূরে পলায়ন করিত। আমরা আজ কুক্কুর শৃগাল অপেক্ষাও অধম।

অস্বাস্থ্যের আকর, পূতিগন্ধপূর্ণ নরক সদৃশ আর্দ্র-ভূমিতে, বিষাক্ত মৃত্তিকাকীট ও মহিলতাপূর্ণ স্থানে এবং কর্দ্দম-পূর্ণ বন্যার জলপান ও উপযুক্ত আহারাভাবে গুর্ব্বিণী বসন্তকুমারীর প্রবল জ্বর দেখা দিল! এই প্রবল জ্বর ভোগ করিবার পরেই সাংঘাতিক পেটের পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণায় বসন্তকুমারী শয্যা গ্রহণ করিল! হায়! বসন্ত-কুমারীর সেই রুগ্ন-শয্যার কথা মনে হইলে আজও আমার হৃদয় শোক-দুঃখের প্রচণ্ড অনলে অহরহঃ দগ্ধ হইতে থাকে। কর্দ্দমসিক্ত ভূমিতে ছিন্ন মলিন আর্দ্র শয্যায় শায়িত উত্থানশক্তিরহিতা নিরাশ্রয়া বসন্তকুমারীর পবিত্র মূর্ত্তি আজও যেন আমার নয়ন-সমক্ষে ভাসিয়া বেড়াই-তেছে!

অবিরাম প্রবল জ্বরে এবং অহোরাত্র পেটের পীড়ার অসহ্য যন্ত্রণা অকাতরে সহ্য করিতে দেখিয়াও ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা বুঝি পূর্ণ হইল না। কয়েক দিবসের মধ্যেই বসন্তকুমারীর সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠিল; বসন্তের রোগক্লিষ্ট শীর্ণ জীর্ণ হস্তপদ ফুলিয়া এখন কদলিবৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে! হায় বসন্ত! একি করিলে?

বসন্তের অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ যেন জীর্ণ দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া কোথায় পালাইয়া গেল। প্রাঙ্গন-স্থিত কর্দ্দমরাশির উপর পড়িয়া আমি চিৎকার করিতে লাগিলাম! আমার হৃদয়ভেদী কাতর চিৎকারধ্বনি নিমিষ মধ্যে শূন্যে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না!!

একদিন বসন্ত আমাকে শিয়রে বসাইয়া অনিমেষ লোচনে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বসন্তের গণ্ডস্থল বহিয়া প্রবল বেগে নয়নাশ্রু প্রবাহিত হইতেছে! বসন্তের চক্ষের জল আমি কখন দেখিতে পারিতাম না। ইহা জানিয়া সহস্র যন্ত্রণা, অসহ্য দুঃখদৈন্য অকাতরে সহ্য করিয়া আমার সমক্ষে বসন্ত অশ্রুবারি গোপন করিয়া রাখিত। অন্তরালে দুঃখাশ্রু নির্গত করিয়া বসন্ত বিষাদ-মাখা মুখখানি লইয়া যেদিন আমার কাছে আসিত, পাছে আমি বসন্তের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারি, এইজন্য অতি

কষ্টে ম্লান দীপশিখার ন্যায় অধরোষ্ঠে হাসির রেখা ফুটাইয়া আমাকে বালকের ন্যায় ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। আজ বুঝি, বসন্তের চক্ষের জল রোধ করিবার ক্ষমতা ছিল না। আজ বসন্তের হৃদয়ে যে তুফান উঠিয়াছে, তাহা নিবারণ করিয়া রাখিবার বসন্তের বুঝি সামর্থ্যে কুলাইতেছে না।

বসন্তের নয়নের প্রবল অশ্রুবারি আমার হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও যেন ভাসাইয়া লইয়া গেল। অথবা বসন্তের নয়নের প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু আমার দেহের রক্তবিন্দুরূপে নির্গত হইতে লাগিল। কম্পিত হৃদয়ে, কম্পিত হস্তে বসন্তের অশ্রুবারি মুছাইতে গেলাম, পারিলাম না! মূর্চ্ছিত হইয়া বসন্তের সেই আর্দ্র মলিন শয্যা-পার্শ্বে পড়িয়া রহিলাম।

কতক্ষণ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম, জানি না। যখন আমার চেতনা হইল, তখন দেখিলাম, সেই উত্থানশক্তি-রহিতা, অর্দ্ধাঙ্গিনীর রক্তহীন ক্ষীণ স্থূল হস্ত দুখানি আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। মূর্চ্ছাভঙ্গে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসন্তকুমারীকে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলাম। বসন্তকুমারীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, অতি কষ্টে তাহার মুখে একটু জল দিবার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করিল! কর্দ্দম-মিশ্রিত বিষাক্ত বারি শত্রুর ন্যায় বসন্তের মুখে ঢালিয়া

দিলাম। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বসন্তকুমারী আমার হাত দুইখানি ধরিয়া বলিল, "স্বামিন্! আমার কাছে আজ একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।" আমি বসন্তকুমারীর অধরোষ্ঠে চুম্বন করিয়া বলিলাম, "কি প্রতিজ্ঞা বসন্ত?" বসন্ত অনিমেষ লোচনে আবার আমার মুখের দিকে কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "বলুন, ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়া আমার জন্য এরূপ আর অধীর হইবেন না?"

"ভগবানে বিশ্বাস যে আর থাকে না বসন্ত? অধীরতার অতল সাগরে আমার হৃদয় যে সবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। আমার আর সাধ্য নাই যে, এই অধীর হৃদয়কে নিজ আয়ত্তে ধরিয়া রাখি।"

"সকলই জানি স্বামিন্! কিন্তু কি করিব, আর উপায় নাই! বিধির বিচিত্র বিধানে মানবের ইচ্ছা ভাসিয়া যায়! আমার সাধ্য থাকিলে আপনাকে এই অকূল-সাগরে ফেলিয়া কোথাও যাইতাম না! জানি না, আমায় বিস্মৃতির আবরণে ঢাকিয়া বিধির বিধানে কোন্ অজানিত দেশে লইয়া গিয়া আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে।"

বসন্ত কি প্রলাপ বকিতেছে? বসন্তের কথার মর্ম্ম আমি যে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না! বসন্তকুমারীর বক্ষে মস্তক লুকাইয়া আমি বালকের ন্যায়

রোদন করিতে লাগিলাম। দুই হস্তে আমার গলদেশ বেষ্টন করিয়া বসন্তও আমার সঙ্গে রোদন করিতে লাগিল! জানি না, আমাদের সে রোদন সুখের কি দুঃখের! উভয়ে উভয়ের অশ্রু-প্রবাহে ভাসিয়া আমরা যেন কোন অজানিত রাজ্যে ভাসিয়া গেলাম! দেখিলাম, সে দেশে সুখের সীমা নাই, আবার দুঃখেরও বিরাম নাই! দুঃখের সমুদ্রে পড়িয়া সুখের স্নিগ্ধ সমীরণে সন্তরণ! উভয়ে উভয়ের দুঃখাশ্রু-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে, উভয়ে উভয়ের বাহুলতায় জড়িত হইয়া, উভয়ে উভয়ের হৃদয় বিনিময়ের বায়ু-হিল্লোলে আমরা কতক্ষণ অসীম সুখ ও অবিরাম দুঃখভোগ করিয়াছিলাম মনে নাই। অদূরে কাহার মধুর কণ্ঠস্বরে আমার দুঃখপ্লাবিত হৃদয়ের সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গেল। বাহিরে যাইয়া আমার প্রিয়বন্ধুর গলদেশ বেষ্টন করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"ভাই! বসন্তহারা হইয়া আমি মুহূর্ত্তমাত্রও জীবিত থাকিতে পারিব না! যদি প্রকৃতই আমার দুরাদৃষ্ট এই সীমাহীন দুঃখপাথারে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তখন দেখিবে, তোমার সম্মুখেই আমি হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিব! বসন্তহারা জীবন—প্রাণহীণ দেহ হইয়া ধরাধামে লুণ্ঠিত হইবে।"

"ভাই, অধীর হইও না। শোক, দুঃখ মানবের আয়ত্তা-ধীন নহে। যাহা কল্পনা করিতে হৃদয় শিহরিয়া উঠে, মানবকে সেই অসহনীয় শোকও সহ্য করিবার জন্য হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হয়।"

"ভাই, তুমি কি জান না, আমি কি লইয়া সংসারে আছি?"

বন্ধু বাধা দিয়া বলিল, "ভাই! সকলই জানি। তোমার হৃদয়ের অন্তস্তলের একটী গুপ্ত কথাও আমার অবিদিত নাই।"

মোহন আমার প্রাণের বাল্যবন্ধু। মোহন যে কেবল আমার বন্ধু তাহা নহে; মোহনের জনক-জননী আমার

পিতামাতার সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। বাল্যে উভয় বন্ধুতে একসঙ্গে আহার করিয়াছি, একত্রে বেড়াইয়াছি! মোহন কায়স্থ, আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, কিন্তু বাল্যে আমাদের জাতিবিচার ছিল না! একসঙ্গে, এক-পাত্রে বসিয়া আমরা মনের আনন্দে পান ভোজন করিতাম। মোহনের জননী আমাকে নিজ সন্তানের ন্যায় দেখিতেন। আমার পরমারাধ্যা জগদ্ধাত্রীরূপিনী জননী আমাপেক্ষাও মোহনকে অধিক ভালবাসিতেন, বন্ধু মোহনের নামে আমার জননীর স্নেহসিন্ধু যেন উথলিয়া উঠিত। হায়! সুখের সেই বাল্য-স্মৃতি, বাল্যের সেই নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব কি মধুর! হায়! এ জীবনের মত সে সুখ হারাইয়াছি! সে দিন আর ফিরিয়া আসিবার নহে! যখন আমরা উভয় বন্ধুতে সারাটির সেই হরিৎবর্ণ ক্ষেত্রে মনের আনন্দে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রেম-ভালবাসার বিনিময়, হৃদয়ে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতাম, তখন ভাবিতাম, আমাদের এই সুখ বাল্যকাল বুঝি চিরদিনই থাকিবে। কে জানে, ভবিষ্যৎ জীবনে কেবল এই স্মৃতিটুকুই আমাদের সম্বল হইবে? কতদিন এই উন্মুক্তক্ষেত্রে উভয় বন্ধুতে মনের আনন্দে গান গাহিয়াছি, গল্প করিয়াছি। বাল্যজীবনের সে প্রাণভরা উল্লাস, মনভরা স্ফূর্ত্তি লইয়া বন্ধুর সম্মুখে চন্দ্রালোকে বসিয়া কত ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনা করিয়াছি।

আজ আমি জীবনের শেষ অবস্থায়, অকালবার্দ্ধক্যের রেখা ললাটে লইয়া, মৃত্যুর সিংহদ্বারে আসিয়া জগতের চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছি, আমাদের সেই বাল্যের বন্ধুত্বের সহিত অন্য প্রেমের আর তুলনা করিতে পারিতেছি না! এরূপ প্রাণে প্রাণে মিলন, মনের একনিষ্ঠ ঐক্যতা, বাল্যকাল হইতে বন্ধুত্ব-প্রেমের পবিত্র বন্ধন, হৃদয়ের বীণা একসুরে বাঁধা, এককালে—এক রাগিণীর ঝঙ্কার ও আলাপ জীবনে আর কাহারও সহিত ঘটিল না। আমাদের এই বন্ধুত্ব-প্রেমের পবিত্র ছবি অল্পসময়ে কয়েক ছত্রে এই দুঃখের তুলিকায় অঙ্কিত হইবার নহে।

বন্ধু আমাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু আমার দূরাদৃষ্ট ভিন্নমুখগামী হইবার নহে ভাবিয়া, বন্ধু উদাসনয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে হতাশ হৃদয়ে বসন্তকুমারীর ন্যায় বন্ধুও আমাকে ভগবানে আত্মনির্ভর করিবার জন্য শেষ উপদেশ প্রদান করিল! বন্ধু আমাকে যতটুকু সাহায্য করিতেছিল, তদপেক্ষা অধিক সাহায্য করিবার বন্ধুর আর সাধ্য ছিল না।

আমি দুঃখের কঠোর হাসি হাসিয়া বলিলাম, "ভাই পার্থিব জগতে ইহকালের জন্য ভগবানে আত্মনির্ভর করিবার আমার আর কিছু নাই। বসন্তের শেষ নিঃশ্বাসের সহিত আমারও ক্ষুদ্র তপ্ত জীবনবায়ু মিশিয়া যাইবে।"

বন্ধুর চক্ষের বিন্দু বিন্দু অশ্রু ভূমিতে ঝরিয়া পড়িল; আমার সেই ভীষণ অবস্থার শোচনীয় দৃশ্য বুঝি আর চক্ষে দেখিতে পারিল না, শীঘ্রই আসিব বলিয়া চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য বন্ধু চলিয়া গেল। আমিও দ্রুতপদে আসিয়া কর্দ্দমসিক্ত পদে বসন্তের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া শয্যাপার্শ্বে পড়িয়া রহিলাম। চিন্তার পর চিন্তার তরঙ্গ আসিয়া হৃদয়ে বিলীন হইতে লাগিল! এক একটি দুশ্চিন্তার তরঙ্গ আসিয়া সজোরে হৃদয়ে ধাক্কা দিতেছে, আবার উঠিয়া বসিতেছি! অনেকক্ষণ অনিমেষনয়নে বসন্তের সেই রোগ-বেদনাক্লিষ্ট মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম। অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় বসন্তের পূর্ব্বের সেই হাসিমাখা মুখখানি মনে পড়িল। বসন্তের মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলাম না, দরবিগলিত ধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আবার শয্যায় পড়িয়া গেলাম। দুশ্চিন্তার তরঙ্গ আসিয়া হৃদয়ের অর্দ্ধভগ্ন পঞ্জরগুলি সজোরে দুলাইতে লাগিল। অসহ্য বেদনায় আবার উঠিয়া বসিলাম, চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম, জগৎ ধূ ধূ করিতেছে। আমার চক্ষে পৃথিবী আজ মানব-শূন্য; কাহাকেও দেখিতে পাই না! ধূম! ধূম! কেবল চারিদিকে ধূমরাশি! চক্ষে আর সহ্য হইল না, একবার আকাশের পানে চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলাম, মাথা ঘুরিতে

লাগিল। আবার বসন্তের পার্শ্বে পড়িয়া গেলাম। অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিলাম, আবার একটির পর একটি চিন্তা-তরঙ্গ আসিয়া হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল। দুশ্চিন্তা আমার কানে কানে কত কি বলিতে লাগিল! চমকাইয়া উঠিয়া বসিলাম! সত্যই কি বসন্ত আমায় ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবে? অসম্ভব! বসন্ত আমায় ছাড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্যও কোথায় থাকিতে পারিবে না! বসন্তকে চুপি চুপি কি জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া মুখের উপর মুখ লইয়া গেলাম! জিজ্ঞাসা করা হইল না! কতদিনের পর বসন্ত আজ একটু নিদ্রা যাইতেছে। বসন্তকে উঠাইতে পারিলাম না!

আবার বসন্তের শয্যাপার্শ্বে পড়িয়া রহিলাম, কত চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। কখন হাসিলাম, কখন কাঁদিলাম, কখন দুরাদৃষ্টকে ধিক্কার দিলাম, কখন স্বার্থপর জগতের লোকগুলাকে মনে মনে কত কথা বলিলাম। আবার বসন্তের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিলেও বসন্তের মুখ হইতে লাবণ্যের শেষ রেখাটুকু এখনও ঝরিয়া পড়ে নাই। আহা! বসন্তের মুখখানি কি সুন্দর! বসন্তের মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম, জগতের দারিদ্র্যের কথা! এমনি অসহায় ভাবে জগতের কত

হতভাগ্য নরনারী রোগের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ক্ষুধায় অন্ন নাই, তৃষ্ণায় জল নাই, রোগে ঔষধ নাই, যন্ত্রণায় শুশ্রূষা করিবার লোক নাই, থাকিবার স্থান নাই! কে কাহাকে দেখে, কে কাহার সন্ধান লয়? এমনি করিয়া হতভাগ্য স্বামীর পার্শ্বে না জানি কত রমণী পথ্য, ঔষধ ও চিকিৎসাভাবে মারা পড়িতেছে! সংসারে কেহ কাহারও সংবাদ লয় না। সংসারে সকলেই যে নিজ দগ্ধ উদর ও স্বার্থ লইয়া ঘুরিতেছে! আতুরের আর্ত্তনাদ শুনিবার তাহাদের সময় কোথা? কত বাবুর কত পয়সা চুরুটের সহিত ছাই হইয়া শূন্যে উড়িয়া যাইতেছে, কত জমিদারের কত অর্থ বিলাস-স্রোতে ন্যাক্কারজনক পথে ভাসিয়া যাইতেছে, কত ভদ্র ও শিক্ষিত নামধারী বাবুদের কত অর্থ রক্ত জবা চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে ভাসিতে উৎকট গন্ধপূর্ণ তরল পদার্থের খরস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে; আর জগতের কত নরনারী এইরূপ অসহায় অবস্থায় রোগশয্যায় বিনা ঔষধে, বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে, বিনা শুশ্রূষায় মারা যাইতেছে! হা ভগবান! তোমার এ কি বিচার? চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, বসন্ত, তোমার ভগবানের এ কি মঙ্গল ইচ্ছা?

হতভাগ্য স্বামীর চিৎকারে বসন্তের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। শান্তিদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে বসন্ত ক্ষণেকের তরে

অসহনীয় রোগ-যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল, আমি, তাহাতেও বাদ সাধিলাম। রোগ-যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিয়া অতি কষ্টে বসন্ত বলিল, "একটু জল।" বিষের ন্যায় বন্যার কর্দ্দমমিশ্রিত জল বসন্তের মুখে ঢালিয়া দিলাম। বসন্ত আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। এইরূপ করিয়া বসন্তের রোগ-শয্যায় মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দণ্ডের পর দণ্ড, প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর রাত্রি, আবার রাত্রির পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু বসন্তের পীড়া হ্রাস হইল না, দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতেই বসন্তের প্রসবের কাল উপস্থিত হইল। যাহাকে অতি কষ্টে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করাইয়া দিতে হয়, সে কি অসহনীয় প্রসব-বেদনা সহ্য করিতে পারে? জননীর সন্তানপ্রসবের যন্ত্রণা কি ভীষণ! ভাবিলাম, এই যন্ত্রণাই বুঝি বসন্তের শেষ যন্ত্রণা হইবে! উত্থানশক্তিহীনা নির্জ্জীব ক্ষীণ দেহখানির প্রসব-বেদনার যন্ত্রণা কল্পনা করিবামাত্র আমার হৃদয়ে সজোরে মুহুর্মুহু কে যেন ভীষণ শেল বিদ্ধ যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছে। কন্যাটি জীবিত! আমার আহ্লাদের সীমা নাই! ভগবান যথার্থই তুমি দয়াময়! ক্ষীণা, রোগাতুরা বসন্তকুমারী প্রসব-বেদনার ভীষণ যন্ত্রণা যে সহ্য করিয়া জীবিত থাকিবে, ইহা আমার ক্ষণেকের তরেও মনে হয় নাই।' প্রসবের পর সেই ক্ষীণজীবি কন্যাটির মুখের দিকে আমি একবারও দৃষ্টিপাত করি নাই! আমার আকুল সতর্ক-দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ পড়িয়া রহিয়াছে বসন্তের সেই রোগক্লিষ্ট রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণ মুখখানির উপর।

দুই দিন দুই রাত্রি কাটিয়া গেল। বসন্তের যে হস্ত পদ স্ফীত হইয়া কদলিবৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছিল, প্রসবের পর সর্ব্বাঙ্গের সেই ফুলাগুলি প্রায় শুষ্ক হইয়া সাধারণ আকার ধারণ করিয়াছে। বসন্ত এখন আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তা কহিতেছে! কিন্তু সেই মুখখানিতে ক্ষণিক বিদ্যুতের ন্যায় আমার প্রাণভরা সেই হাসির রেখা আর দেখিতে পাই না। ভাবিলাম, আর দুই একদিন পরে বসন্তের সেই হাসির রেখা আবার ফুটিয়া

বে। একে একে কত নূতন আশা নব নব মূর্ত্তিতে আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণ যত্নে নব উৎসাহের তীব্র উত্তেজনায় বসন্তের শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলাম। কনিষ্ঠের উৎসাহের সীমা নাই—একা শত কনিষ্ঠের বল ধারণ করিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

তৃতীয় দিবসে বসন্তের মুখ দিয়া যে সমস্ত বাক্য নির্গত হইতে লাগিল, তাহার অর্থ আমি কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। হৃদয় চমকিত হইয়া উঠিল; একদৃষ্টে বসন্তের মুখের দিকে চাহিয়া কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বসন্ত! কি বলিতেছ, ভাল করিয়া বল, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" বসন্তের মুখে আবার সেই অর্থহীন বাক্য! বসন্ত প্রলাপ বকিতেছে! হা ভগবান! আবার একি করিলেন! অতল সমুদ্রে ভাসিয়া অদূরে যে একটু তটভূমি দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছিলাম, তাহাও বুঝি এইবার দুঃখ-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল!

ক্রমশঃ বসন্ত সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল। বসন্তের এখন পূর্ণ বিকার। এখন আর ঘন ঘন প্রলাপ বাক্য নাই, মাঝে মাঝে একটি প্রলাপবাক্য বসন্তের মুখ দিয়া উচ্চারিত হইতেছে। বসন্ত কখন কখন দন্তে দন্ত ঘর্ষণ

করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "না না, আমাকে ছাড়িয়া এখন কোথাও যাইও না।" আমি ললাটে করাঘাত করিতে করিতে বসন্তের পার্শ্বে লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। বসন্তের এবং আমার এই ভাবেই দিবা অবসান হইয়া গেল। প্রাণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

কখন দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার কখন জগৎ আবৃত করিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, রজনীর প্রগাঢ় অন্ধকাররাশি আমাকে যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে। ভয়ে আমার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি, সংজ্ঞাহীনা বসন্তকুমারী একপার্শ্বে পড়িয়া আছে! বসন্তের আর সে প্রলাপবাক্য নাই, মুখের সে কমনীয় জ্যোতি নাই, সেই মৃদু মৃদু হাস্য ওষ্ঠোপরি এখন আর ভাসিতেছে না! বসন্তের সেই ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি কর্দ্দম-সিক্ত হইয়া ভূমে লুণ্ঠিত হইতেছে। বসন্তের মুখে রক্তের চিহ্নমাত্রও নাই; সেই টুকটুকে কষিত-কাঞ্চনের ন্যায় মুখখানির উপর কে যেন শ্বেতবর্ণের প্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছে! বসন্তের মুখের দিকে আর আমি চাহিতে পারিলাম না; চক্ষে সূচিবিদ্ধের যন্ত্রণা হইতে লাগিল; প্রতিমুহূর্ত্তে শত শত শানিত ছুরিকা কে

যেন কঠোর হস্তে হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করিতে লাগিল! আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম! প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-শলাকা কে যেন চক্ষে বিদ্ধ করিতে লাগিল; হা ভগবান! এ কি দৃশ্য! দুই হস্তে চক্ষু চাপিয়া গগনভেদীরবে চিৎকার করিতে লাগিলাম! চক্ষু ফিরাইয়া যে ভীষণ দৃশ্য দেখিলাম, সে ভীষণ দৃশ্য বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই! ভাষা এখানে সঙ্কুচিত হইয়া হৃদয়-কন্দরে লুকাইত হইতেছে! অভিধানেও এরূপ ভাষা নাই যে, এ দৃশ্যের বর্ণনা হইতে পারে! প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের লোহিত রঙ্গে আমার হৃদয়রূপ শ্মশান-পটে বিধির নির্ম্মম তুলিকায় এই ভীষণ দৃশ্যের চিত্রপট অঙ্কিত আছে! মানব ভাষা এ চিত্রপটের বর্ণনা করিতে অসক্ত! তোমরা এই চিত্রপটের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিও না, চক্ষু ঝলসিয়া একবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে, দৃষ্টিশক্তির লোপ হইবে, সংসারে ধিক্কার জন্মিবে, বিধির নিয়ম বিধান খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইবে, ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসহারা হইবে!

এ দৃশ্য বড়ই ভীষণ! বড়ই মর্ম্মভেদী! দেখিলাম, একদিকে আর্দ্র ভূমিতে আলুলায়িতা কর্দ্দমসিক্ত কেশা, বিবর্ণা, মুদিতনেত্রা, জ্ঞানহীনা বসন্ত ক্লেদশোনিতসিক্ত ছিন্ন জীর্ণ বস্ত্রাবৃত হইয়া নিরাশ্রয়া পথের ভিখারিণীর ন্যায়

লুণ্ঠিত হইতেছে, অন্যদিকে তাহারই রক্ত-মাংসে গঠিত অপুষ্ট, রোগ, তাপ, দুঃখ, দৈন্যে জর্জ্জরিত একটি তিন দিনের শিশুকন্যা অভাব দুঃখের মানস-পুত্রিরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া রক্তপিণ্ডের ন্যায় ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র হাত দুইখানি সঞ্চালিত করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে। এ দৃশ্যে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু জানি না, বিধির কি বজ্র শক্তিতে গঠিত আমার পাষাণ হৃদয়! এত শোকে এত দুঃখেও বিদীর্ণ হইল না! আহা! সেই রক্তপিণ্ডাকৃতি শিশুকন্যার মুহুর্মুহু শ্বাস-প্রশ্বাসে মৃত্যু যন্ত্রণার ব্যাকুলতা অব্যক্ত ভাষায় বাহির হইতেছে! হায়! আর বুঝি বিলম্ব নাই! চিরদুঃখিনী জননীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়া, দুঃখ-দৈন্যের দংশনে তিন দিনেই সংসারের খেলা ফুরাইয়া গেল! স্বর্গ হইতে একটি রক্তের পবিত্র ছবি আজ তিন দিন মাত্র মর্ত্ত্যধামে নামিয়া আসিয়াছে। কি পাপে ইহার এই মৃত্যু-যন্ত্রণা? এই ক্ষুদ্র ছবিখানি সংসারে কাহার কি করিয়াছে যে, ইহার এই ভীষণ মৃত্যু-যন্ত্রণায় পাপের শাস্তি হইতেছে! জানি না ভগবান, মানব কোথাকার কোন্ কর্ম্মফল সঙ্গে লইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করে। একদিকে প্রাণের প্রাণ সহধর্ম্মিণীর মুমূর্ষু লুণ্ঠিত দেহ—অন্যদিকে তিন দিনের শিশুকন্যার হৃদয়বিদারক মৃত্যু-যন্ত্রণা! জানি না, সংসারে এ দৃশ্য দেখিবার কতটুকু

হৃদয়বলের প্রয়োজন? আমার হৃদয় খণ্ড বিখণ্ড হইয়া অজস্র শোণিতরাশি প্রবলধারায় অশ্রুরূপে নির্গত হইতে লাগিল! আমার বিবর্ণ কম্পিতদেহ আবার লুণ্ঠিত হইয়া বসন্তের পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িল।

যখন আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, আমার প্রাণের সহোদর সেই রক্তপিণ্ডাকৃতি শিশু-কন্যাটিকে শোণিতসিক্ত ছিন্নবস্ত্রে আবৃত করিয়া অজস্র অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে করিতে যথায় আমার প্রিয়তম পিতা, স্নেহময়ী জননী, স্নেহের পুত্তলি ভগ্নি, আরও কত হৃদয়ের স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসার পাত্র প্রজ্জ্বলিত চিতায় নশ্বর দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছেন—সেই পানার পাড়ের পবিত্র শ্মশানে লইয়া যাইতেছে। ভ্রাতার ক্ষুদ্র হৃদয় তখন ভীষণ শোক-শেলে বিদ্ধ! ভ্রাতা প্রকৃতই তখন বাহ্যজ্ঞানহারা।

একই অবস্থায় বসন্তের আরও দুই দিন দুই রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। জ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না। আমি যে কি অবস্থায় আছি, তাহার বর্ণনা অপেক্ষা অনুমান সহজ। আমি জীবিত কি মৃত, সংসারে আমার কিছু অস্তিত্ব আছে কি না, তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারি না। বসন্তের জীবনীশক্তির সহিত আমারও জীবনীশক্তি যেন দ্রুত ক্ষয় হইয়া আসিতেছে! প্রভাত হইতে বসন্তের শ্বাস আরম্ভ হইল। সে কি যন্ত্রণা! যাঁহারা স্থিরচিত্তে

মানবের মৃত্যু-যন্ত্রণা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে জীবনী-শক্তি ক্ষয় করিয়া মানবকে কিরূপে দ্রুত মৃত্যুরাজ্যে লইয়া যায়। বসন্তের প্রত্যেক নিশ্বাস-প্রশ্বাসে আমার এক একখানি করিয়া বক্ষ-পঞ্জর খসিয়া পড়িতে লাগিল। কখন ভূমে লুণ্ঠিত হইয়া চিৎকার করিতেছি, কখন বসন্তের গলদেশ বেষ্টন করিয়া আমিও জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া বসন্তের মুখের একটী শেষ কথা শুনিবার জন্য তাহার চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছি। কখন বসন্তের মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখিতে না পারিয়া, পাগলের ন্যায় গৃহ-প্রাঙ্গনে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছি, এখনও আমি ভাবিতে পারি নাই যে, বসন্ত আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে। ভগবানের ন্যায়বিচার, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা জগতে কেবল আমারই জন্য কি সৃষ্ট হইয়াছিল? অসম্ভব! বসন্তের মৃত্যু—এ কথা আমার হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দু থাকিতে যেন কর্ণে প্রবেশ না করে। একটি দীনা দুঃখিনীকে লইয়া দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, তাহাতেও হৃদয়ে শান্তি ছিল! আর যে আমার অবলম্বন নাই! সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ ছোট ভাইটিকে লইয়া কোথায় ভাসিয়া যাইব? আর ভাবিতে পারিলাম না—উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম।

একি করিতেছি! ভাবিলাম একি করিতেছি! প্রাণ

ভরিয়া মুখখানি দেখিয়া লই! আর যে ইহ-জীবনে এই মুখখানি দেখিতে পাইব না। বৃথা ক্রন্দনে এই অমূল্য সময় নষ্ট করিতেছি! দৌড়িয়া আসিয়া একদৃষ্টে বসন্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, অনেকক্ষণ বসন্তের সেই মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম। আর দেখিতে পারিলাম না! বসন্তের মৃত্যু-যন্ত্রণা আর দেখিতে পারিলাম না! চক্ষু উৎপাটিত করিয়া, হৃদয় ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হইল।

প্রাঙ্গনে একটি তুলসী মঞ্চ ছিল। বন্যায় সকলই গিয়াছে, আমার জীবনের শেষ সম্বল বসন্তও যাইতে বসিয়াছে, কিন্তু এই তুলসীমঞ্চটী যায় নাই। এই তুলসী-মঞ্চের প্রতি বসন্তের অচলা ভক্তি ছিল। বসন্ত প্রাতে বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তুলসীতলা পরিষ্কার করিত, স্নানান্তে গলবস্ত্রে মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে তুলসী-মূলে জল দিত, সন্ধ্যার মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গললগ্নী-কৃতবাসে বহুক্ষণ ধরিয়া তুলসীমঞ্চে প্রণাম করিত। প্রণাম করিতে করিতে অশ্রুধারায় বসন্তের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। তুলসীমঞ্চের প্রতি ভক্তিদৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া ভক্তি-প্লুত হৃদয়ে, অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া, বসন্ত কতদিন স্বামী ও দেবরের কল্যাণের জন্য মানস করিয়াছে, কতদিন দুঃখ দৈন্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য

ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিয়াছে, কতদিন অন্নকষ্টের হাহাকার ধ্বনি দূর করিবার জন্য তুলসীতলায় মাথা কুটিয়াছে, কতদিন ক্ষুধায় একমুষ্টি অন্ন ও লজ্জা নিবারণের একখানি বস্ত্রের জন্য তুলসীতলায় করযোড়ে মুদিতনেত্রে ঋষি-তনয়ার ন্যায় ধ্যানাবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছে, স্বামী ও দেবরের রোগ-মুক্তির জন্য কত দিন বসন্ত এই তুলসীতলায় মস্তক রাখিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে। আমিও বসন্তের শেষ অবস্থা দেখিয়া সেই তুলসীতলায় মস্তক রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ চিৎকার করিয়াছিলাম, মনে নাই। চিৎকার করিতে করিতে যখন পিপাসায় হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া আসিল, বক্ষের স্পন্দন যখন রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যখন শিথিল ও অবশ হইয়া তুলসীতলায় ঢলিয়া পড়িল, তখন প্রাণাধিক কনিষ্ঠের "বউদিদি গো আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় গেলে গো" এই হৃদয়ভেদী আকুল স্বর আমার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। বুঝিলাম, এইবার সব ফুরাইল। দৌড়িয়া যাইয়া বসন্তকে বক্ষে তুলিয়া লইব ভাবিয়া উঠিতে গেলাম, শরীরের সমস্ত সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না! কে যেন একটা বৃহৎ লৌহমুদ্গর লইয়া আমার

মস্তকে সজোরে আঘাত করিল, অচিন্তপূর্ব্ব সেই ভীষণ আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া তুলসীতলায় পড়িয়া রহিলাম। তাহার পর কি হইল জানি না।

যখন আমার একটু জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, পূর্ব্বদিক ফর্শা হইয়া গিয়াছে। কাকের বিকট কা কা ধ্বনির সহিত বিহগকুলের চিৎকারধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। আমার অস্থিচর্ম্মসার দেহটা তুলসীতলায় কর্দ্দমোপরি শবের ন্যায় পড়িয়া আছে। যখন আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল, তখন বুঝিলাম, আজ আমার কি দিন! পূর্ব্বদিকের তরুণ অরুণচ্ছটা অনলশিখার ন্যায় আমার চক্ষু দুটা দগ্ধ করিতে আসিল, কাকের কা কা রব শুনিয়া যন্ত্রণায় চক্ষু মুদিয়া রহিলাম, ভাবিলাম, কাকগুলা প্রভাতে আনন্দরব করিতে করিতে বুঝি আমার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়িয়া খাইতে আসিতেছে। এইবার অদূরে লক্ষ্মণ সদৃশ প্রাণের ভাইকে দেখিতে পাইলাম। স্পষ্টাক্ষরে সকলই মনে আসিল, অজ্ঞানতা দূর হইয়া গেল, বজ্র নির্ঘোষে কাহার স্বর কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইয়া বলিয়া দিল, "বসন্ত আর নাই।" হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভাবিলাম, আর না, আর এখানে থাকিব না! বসন্ত অনেক যন্ত্রণা, অসহ্য দুঃখ সহ্য করিয়াছে; যে দেশে দুঃখ দরিদ্রতা নাই, অভাব নাই, যন্ত্রণা নাই, সেই দেশে

বসন্তকে বুকে করিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া যাই! আর লোকের মুখ দেখিব না. মানব-মুখ দর্শন চক্ষে অসহ্য! মানবের স্নেহ নাই, মমতা নাই, দয়া নাই, বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই! অসহ্য—অসহ্য! মানবের মুখ দর্শন, মানব-সংসর্গ অসহ্য! যে দেশে মানুষ নাই, সমাজ নাই, মানবের কুটীল হিংসাপূর্ণ কটাক্ষ নাই, সেই দেশে বসন্তকে লইয়া পলাইয়া যাই! জন্মভূমি, স্বদেশ, এরূপ জন্মভূমি, এরূপ স্বদেশ আমার ন্যায় তাপিতের তপ্ত নিশ্বাসে উড়িয়া যাউক, এরূপ দেশের ধূলিকণাও জগৎপৃষ্ঠে থাকিয়া জগতকে যেন কলঙ্কিত না করে। উঠিয়া দেখি, চতুর্দ্দিক আঁধার! আঁধারের ভিতর অদূরে ভ্রাতা নিশ্চল নিস্পন্দ! একি! ভ্রাতার মুখকমল এরূপ বিবর্ণভাব ধারণ করিল কেন? মর্ম্মভেদী শোক ও অপার দুঃখের উপর আর একটা কিসের যেন দুঃখ, ঘৃণা, আশঙ্কা ও ক্রোধের হৃদয়-দগ্ধকারী ভীষণ ছায়া ভ্রাতার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এ ছায়া ভীষণ, অতি ভীষণ! ভ্রাতার মুখের ভাব এমন হৃদয়ভেদী শোক, দুঃখ ও হতাশকে অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে অতি উর্দ্ধে উঠিয়াছে। ভ্রাতার এই ভাব শোকের অতীত, দুঃখের অতীত, হতাশের অতীত, ক্রন্দনের অতীত! ভ্রাতার কোমল বাল্য হৃদয় শোক, দুঃখ, ক্রন্দন হতাশের রাজ্য অতিক্রম করিয়া মূর্ত্তিমান নরক রাজ্যে উপ-

নীত হইয়াছে। এ রাজ্যে আর শোকের সান্ত্বনা নাই, দুঃখের স্পন্দন নাই, হতাশের ক্রন্দন নাই! এ রাজ্যে মানবগুলা দানব রূপে ভ্রাতাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, শবের উপর সজোরে খড়্গের আঘাত করিতেছে, মানব-রূপী দানবের সহানুভূতিহীন ভীষণ চাহনিতে ভ্রাতার অন্তরাত্মা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছে! ভ্রাতার চক্ষে জল নাই, কিন্তু ভীষণ শোকের তীব্র অনল-শিখা নয়নের দুই প্রান্ত দিয়া নির্গত হইতেছে! দুঃখের ক্রন্দন নাই কিন্তু অজস্র অশ্রুবারি শোকের দাহিকা-শক্তিতে শুষ্ক হইয়া এক একটি দীর্ঘশ্বাসে প্রচণ্ড অগ্নি-শিখার ন্যায় নির্গত হইয়া যাইতেছে। বাক্‌শক্তি তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু বজ্রাহত হৃদয়ের আকুল অব্যক্ত ভাষা ভ্রাতার শুষ্ক বিবর্ণ মুখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে! ভ্রাতার মুখের ভীষণ ভাব দেখিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে বিলম্ব হইল না!

আমরা গরিব, গ্রামের লোক সকলেই জানে; আমাদের দ্বারা কাহারও কখন উপকারের আশা নাই, সুতরাং এই কার্ত্তিক মাসের দারুণ শীতে তাহারা আমার ন্যায় হতভাগ্যের স্ত্রীকে দাহ করিতে আসিবে কেন? এতটা ত্যাগস্বীকার—এতদুর নিঃস্বার্থ উপকার সংসারে কে কাহার করিয়া থাকে?. সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই

আমার বসন্তকুমারী জানি না কোন্ শান্তিপূর্ণ, দুঃখশূন্য দেশে চলিয়া গিয়াছে, সেই হইতেই প্রাণের ভাই শোক-শেল বুকে লইয়া ছিন্ন ভিন্ন হৃদয়ে প্রতি ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, একজনের গৃহে দশবার গিয়াছে, কত সাধ্য-সাধনা, অনুনয় বিনয় আকুল ক্রন্দন! কিন্তু কেহই গৃহের বাহির হইতে স্বীকৃত হয় নাই। কেহ স্পষ্ট জবাবে ভ্রাতাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে; যাহাদের চক্ষুলজ্জা অধিক, যাহারা মিথ্যা ও কপটতাকে সঙ্গের সাথী করিয়া ভাবিয়াছে, মৃত্যু তাহাদের সম্মুখে কখন অগ্রসর হইবে না, তাহাদের কাহারও স্ত্রী গর্ভবতী, কাহারও তিন দিন জ্বর, কাহারও বক্ষে বেদনা! সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত ভ্রাতার সহস্র চেষ্টা, সহস্র মিনতিতে কাহারও কঠোর হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। তাই শোক দুঃখের সীমা অতীত হইয়া ভ্রাতার হৃদয় এখন মুহুর্মুহু বজ্রপতনের ন্যায় স্তম্ভিত! অতল সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গে পতিত হইয়া বিহ্বলচিত্তে লোক যখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে থাকে, সেই সময় ভীষণকায় জলজন্তু মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিলে মৃত্যু আলিঙ্গনকারীর যেরূপ হৃদয়ের অবস্থা হয়, সমুদ্রমধ্যে মৃত্যু অপেক্ষা আশু মৃত্যু সম্ভাবনায় যেরূপ হৃদয় অস্থির হইয়া উঠে, আমার ভ্রাতার হৃদয়ও কতকটা সেই ভাব ধারণ করিয়াছে।

ভ্রাতার অবস্থা দেখিয়া এবং গ্রামের লোকের নির্ম্মম নিষ্ঠুর ব্যবহারে আমি দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম। হায় দেশ! হায় স্বদেশী! হায় স্বজাতি! যেদেশে আমার ন্যায় অগণিত ব্যক্তি এইরূপ দুঃখ-বিপদে অহরহঃ রোদন করিতেছে, কাহারও একটু সহানুভূতি পাইতেছে না; যে দেশে এবম্প্রকার বা অন্য প্রকার দুঃখ-বিপদের অহরহঃ হাহাকার রব উত্থিত হইতেছে, সেই দেশের লোকই হেলায় বিলাস-স্রোতে গা ভাসাইয়া জলের ন্যায় অর্থব্যয় করিতেছে! এদেশের যদি অবনতি না হইবে, তবে আর কোন দেশের হইবে? কিছুদিন পরে এদেশের অস্তিত্ব থাকিবে, কি না কে বলিতে পারে? যে দেশের লোক চব্য চূষ্য লেহ্য পেয় ভোজনান্তে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে হাই তুলিতে থাকে, অদূরে স্বজাতি, স্বদেশী বা প্রতিবাসীর হাহাকার ধ্বনি, আতুরের আর্ত্তরব—বিপদে কাতর চিৎকার তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না, জানি না, সে দেশের সে জাতির অস্তিত্ব আর কতদিন থাকিবে? ক্রোধে, দুঃখে, শোকে, অভিমানে চিৎকার করিতে করিতে আমার জ্ঞাতি ও প্রতিবাসীদিগকে উদ্দেশ করিয়া কর্কশ ভাষায় কত কি বলিতে লাগিলাম মনে নাই। আমি তখন শোকে দুঃখে অধৈর্য্য ও জ্ঞানহীন হইয়া পাগলের অধম।

বসন্তকুমারীর শবদেহ গৃহে পড়িয়া থাকিবে! আমি জীবিত থাকিতে তাহার দাহ হইবে না? অসহ্য—অসহ্য যন্ত্রণা! হায় গ্রামবাসী! তোমরা কি নিষ্ঠুর! কে কোথায় আছ ভাই, এ বিপদের সময় গরিব বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিও না; সমাজ, দেশ - চিরদিনই গরিব বলিয়া গরিবকে ঘৃণা করে। এখনও করিবে? এ বিপদেও তোমাদের একটু দয়া একটু সহানুভূতি পাইব না! একবার তোমরা আমার হৃদয়ের ভিতরটা দেখ, দয়া হইবে। তোমাদের ত মানুষের প্রাণ, দেখ কি যন্ত্রণা! কি দাহ! দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া হৃদয় ভস্ম হইয়া যাইতেছে! একটি সান্ত্বনাবাক্য বলিয়া যন্ত্রণার লাঘব করিতে বলি না! জ্বলুক, চিরদিন জ্বলুক! কিন্তু আমার হৃদয়ের বসন্তকে শৃগাল কুক্কুরে আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে ছিঁড়িয়া খাইবে আর তোমরা তাহাই দেখিবে? ইহা আমার অসহ্য! দেখিতে পারিব না! তবে এখনও জীবিত কেন? হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়িয়া ফেলি। সজোরে বক্ষে আঘাত করিতে করিতে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

আমার কতক্ষণ মূর্চ্ছিত হইয়া ছিলাম মনে নাই। ভ্রাতার হৃদয়ভেদী ক্রন্দনের শব্দে আমার যখন মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন কি দেখিলাম? দেখিলাম, দুইখানি লম্বা কাঁচা বাঁশের উপর আড়া আড়ি কয়েকখানি খণ্ড খণ্ড বংশ

পাতিয়া বিচালির দড়ি দ্বারা বাঁধা, তাহার উপর আমার হৃদয়েশ্বরি বসন্তকে ছিন্ন একখানি মাদুর ও বসন্তের ছিন্ন মলিন একখানি বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া বিচালির দ্বারা দৃঢ়রূপে লম্বা দুইখানি বাঁশের সহিত বন্ধন করিয়াছে। পার্শ্বে একটি কলসী, একটি মৃন্ময় পাত্রে কড়ি ও আতপ তণ্ডুল ইত্যাদি রহিয়াছে।

দূর হইতে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম! চক্ষের পলক পড়িল না, এক বিন্দু অশ্রু ঝরিল না, কেবল ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস শূন্যে মিলাইতে লাগিল। দৌড়িয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম,—সেই অর্দ্ধ-ভগ্ন কর্দ্দম ও মৃত্তিকাস্তূপ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম, ইহজন্মের মত চাহিতে লাগিলাম। আবার বাহিরে আসিয়া বসন্তের মহাযাত্রা দেখিতে লাগিলাম। একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, মস্তক বিকৃত অথবা সম্পূর্ণ পাগল হইয়াছি ভাবিয়া কেহ আমার নিকট অগ্রসর হইল না,—কেহ ভয়ে একটি কথাও কহিল না। আমার অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্বপাড়ার চক্রবর্ত্তী বলিল, "এস আমরাই মড়া লইয়া যাইব।" "হরি বোল" "হরি বোল" বলিয়া বসন্তকে স্কন্ধে তুলিয়া পানাড়পান শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিল। আমিও পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলাম।

মনে পড়ে—এখনও মনে পড়ে, কাল মেঘের ন্যায়

বসন্তের সেই কেশ-রাশি! যখন হরিবোল রবে প্রান্তর মুখরিত করিয়া শ্মশানাভিমুখে বসন্তকে লইয়া যাইতেছিল, তখন সেই অযত্নে বর্দ্ধিত তৈলহীন কেশরাশি শবাধারের উপর দিয়া ঝুলিতেছিল। সেই কেশরাশি লক্ষ্য করিয়া প্রাণপণে দ্রুত—আরও দ্রুত ছুটিতে লাগিলাম।

চিতার অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আর দেখিতে পারিলাম না! এইবার অসহ্য হইল! দূরে—অতিদূরে দৌড়িয়া পলাইলাম! যাইব কোথায়? কোথায় যাইয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইব? যাওয়া হইল না!. আবার একটু নিকটে আসিলাম! অসহ্য হইল! সেই চিতাগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিব ভাবিলাম, কে যেন আমায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। ঘাড় গুঁজিয়া শ্মশানের উপর পড়িয়া রহিলাম।

অচৈতন্য, মোহ কি নিদ্রা বলিতে পারি না। পড়িয়া গিয়া আমি বাহ্যজ্ঞান হারাইলাম। স্বপ্ন কি সত্য ঘটনা, তাহাও আমার উপলব্ধি করিবার শক্তি হইল না। দেখিলাম, আমার সম্মুখে এক মহাতেজা সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান। আজানুলম্বিত বাহু জটাজূটধারী, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ সৌম্যমূর্ত্তি! আহা! কি করুণাপূর্ণ প্রশান্ত দৃষ্টি! স্বর মধুর করুণা ভরা! সন্ন্যাসী গম্ভীর করুণ মধুর স্বরে বলিলেন,—"এখনও তোমার ভোগের অবশিষ্ট অনেক আছে;

অধীর হইও না, ভগবানে বিশ্বাস হারাইও না! সহ্য কর! তোমার কর্ম্মফল কে ভোগ করিবে? তবে অধীর হও কেন? জানিও, কর্ম্মফল—কর্ম্মশক্তি তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতেছে! বড়ই কঠিন স্থান—সংসার বড়ই কঠিন স্থান, ইহা ভগবানের ন্যায় রাজ্য; অন্যায় তিষ্টিতে পারে না! সংসারের দেনাপাওনা মানবকে কড়ায়-গণ্ডায় চুক্তি করিতে হয়। বাবা! এখানে ফাঁকি চলে না!—তোমার পূর্ব্বের অন্যায়, ধর্ম্ম-বিগর্হিত কর্ম্ম-রাশি, তোমার পূর্ব্বের কর্ত্তব্যচ্যুত কর্ম্ম-স্রোত তোমাকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইতেছে! কে খণ্ডন করিবে? কর্ম্মফল খণ্ডন ভগবানেরও বুঝি অসাধ্য! স্থিরচিত্তে সময়ের প্রতীক্ষা কর! কালে এই শোক-জ্বালা সকলই বিস্মৃত হইবে কিন্তু বিস্মৃত হইও না কর্ম্মফল! বিস্মৃত হইও না মানবের কর্ত্তব্য. ভুলিও না ধর্ম্ম ও ভগবান।

"ভুলিও না ধর্ম্ম ও ভগবান" সন্ন্যাসীর এই গম্ভীর বজ্র নির্ঘোষ স্বরে আমার মোহ, নিদ্রা, স্বপ্ন বা অচৈতন্যতা দূর হইয়া গেল। চক্ষুরুন্মীলন করিবা মাত্র দেখিলাম, বসন্তের চিতাগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। স্বপ্নের দৃশ্য নয়নসমক্ষে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর সেই করুণামাখা তেজোব্যঞ্জকস্বর বার বার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! সন্ন্যাসীর এক একটি কথা স্মৃতিপথে

উদিত হইয়া আমাকে নব নব চিন্তা রাজ্যে ভাসাইয়া লইয়া গেল!

"এখনও আমার ভোগের অবশিষ্ট আছে।" সন্ন্যাসীর মিথ্যা কথা। সন্ন্যাসী বলিল, "এখনও আমার ভোগের অবশিষ্ট আছে।" ইহাপেক্ষা দুঃখভোগের আর কি অবশিষ্ট থাকিতে পারে? যতই অবশিষ্ট থাকুক, তাহা লঘু, অতি লঘু! জনক জননী হারাইয়াছি,—সুখ, সম্বল, শান্তি হারাইয়াছি,—রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্রতাকে চিরতরে হৃদয়ে আসন পাতিয়া দিয়াছি,—বাসস্থান, গৃহ, সহস্র শোক দুঃখের উপরেও একটু জুড়াইবার স্থান—তাহাও দামোদরের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, শেষ সর্ব্বশেষ দুঃখের সম্বল, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ডটাও ঐ দেখ প্রজ্জলিত চিতাগ্নিতে এখনও দগ্ধ হইতেছে! আর ভোগের অবশিষ্ট কি? চক্ষু দুটা উৎপাটন করিয়া লও, সন্ন্যাসী সে যন্ত্রণা ভোগ আমার কাছে তুচ্ছ অতি তুচ্ছ! শরীরের চর্ম্মমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিয়া লবণ প্রয়োগ কর, সে যন্ত্রণাও অতি তুচ্ছ! দেহের অস্থি সজোরে এক একখানি করিয়া খসাইয়া লও, সে যন্ত্রণাভোগ সন্ন্যাসী তোমার সমক্ষে হাসিয়া উড়াইয়া দিব। শানিত তরবারি দ্বারা এই মস্তকটা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঐ চিতাগ্নিতে আমার হৃদপিণ্ডের সহিত ভস্ম করিতে দাও, দেখিবে, কাটামুণ্ড তোমার সমক্ষে হো হো

করিয়া হাস্য করিবে! তবে "এখনও আমার ভোগের কিছু অবশিষ্ট আছে" বলিয়া সন্ন্যাসী কেন আমায় ভয় দেখাইতেছ?

"অধীর হইও না।" সন্ন্যাসী বলিল, অধীর হইও না। তুমি আমার হৃদয়ের যাতনা কি বুঝিবে সন্ন্যাসী? তোমার হৃদৎপিণ্ডটা ছিন্ন করিয়া যদি এই চিতাগ্নিতে দগ্ধ করিতে দিতাম, বুঝিতে, তুমি অধীর হইতে কি না? তুমি যেই হও, যত জ্ঞানী সংযমী হও, যতই ভগবৎ-ভক্ত হও, তুমি সন্ন্যাসী! বিভুনামে মাতোয়ারা হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া, বুঝিবা সংসারের শোক তাপ জ্বালার ভয়ে তুমি বনে বনে ঘুরিতেছ? হয়ত তুমি পরোপকারের জন্য—জগতের মঙ্গলের জন্য প্রাণপাত করিতেছ! কিন্তু যদি সংসারে থাকিয়া আমার ন্যায় শোক-জ্বালা সহিতে হইত, তোমার নিজেরই সম্মুখে নিজের হৃদ্‌পিণ্ডটা এইরূপ করিয়া পুড়িয়া ছাই হইত, তবে বুঝিতাম, সন্ন্যাসী, তুমি অধীরতাকে কি করিয়া হৃদয়ে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে?

"ভগবানে বিশ্বাস হারাইও না।" সন্ন্যাসী বলিলেন,—"ভগবানে বিশ্বাস হারাইও না।" আর তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখিয়া ফল কি? যাহার কিছু আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, সেই তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকে। আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা ঐ দেখ সন্ন্যাসী, ধূ ধূ করিয়া চিতাগ্নিতে

ছাই ভস্ম হইয়া যাইতেছে! আমি এখন উদ্দেশ্যশূন্য, লক্ষ্যহীন! আমার এখন তাঁহার প্রতি পূর্ণ অবিশ্বাস! আমার সুখ, শান্তি, স্বর্গ, নরক সকলই সমান! তবে আর বিশ্বাসে ফল কি সন্ন্যাসী?

"বল হরি. হরি বোল, বল হরি।"

কতক্ষণ ধরিয়া সন্ন্যাসীর কথা ভাবিতেছিলাম, মনে নাই। "হরি" "হরি" শব্দে আমার চমক ভাঙ্গিল! দেখিলাম. বসন্তের চিতা নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে! ভ্রাতা অতিকষ্টে কলসী করিয়া জল আনিয়া চিতায় ঢালিতেছে! বসন্তের আর চিহ্নমাত্র নাই,—কেবল আছে কাল অঙ্গার-রাশির সঙ্গে অর্দ্ধভস্ম অস্থি! হায়! সব ফুরাইল! ভাবিলাম, আর কেন? চক্ষু পথ-প্রদর্শক হও, চল, তোমার দৃষ্টির পশ্চাতে আশাহীন উদ্দেশ্যহীন ভারবহ জীবন ভাসাইয়া দিই। নয়ন, তোমায় জিজ্ঞাসা করিব না, কোন্ পথে—কোন্ দেশে যাইতেছ? সাগরে, বনে, কান্তারে, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপিত মরুভূমে, যে দিকে তোমার দৃষ্টি যাইবে, সেই দিকে সেই পথে যাইব।

ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিলাম। মাতৃহীন, পিতৃহীন, বন্ধুহীন, বান্ধবহীন, নিরাশ্রয় ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিলাম। ভাবিলাম, জনক-জননীর স্নেহের আদরের কনিষ্ঠ সন্তান, যাহার ধমনীতে এক রক্ত প্রবাহিত, যাহার অদৃষ্ট

এই হতভাগ্যের অদৃষ্টের সঙ্গে গ্রথিত, তাহাকে কোথায় রাখিয়া যাই? মনে মনে ভ্রাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, চল প্রাণের অনুজ, আমরা যেরূপ এক মাতৃদুগ্ধ খাইয়া উভয়ে পুষ্ট হইয়াছি, সেইরূপ এক শোক, দুঃখ, হতাশকে সঙ্গে লইয়া বিজন অরণ্যে এক বৃক্ষতলে উভয় ভ্রাতায় আশ্রয় গ্রহণ করি! অথবা এই পবিত্র শ্মশানে এস ভাই, চির বাসস্থান নির্ম্মাণ করি। শ্মশানের মত পবিত্র স্থান ত্রিভুবন অনুসন্ধান করিলেও কোথাও পাইব না!

শ্মশান জীবের পরিণাম স্থল। কি মধুর নাম! ধনী, নির্ধন, রাজা, প্রজা, সকলেরই ইহা পবিত্র পরিণাম স্থান! আহা! এরূপ মনোরম প্রাণারাম স্থান অবনীমণ্ডলে আর কি কোথাও আছে? সকলই একাকার! অহং-কারোন্মত্ত ধনী, একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ! তোমার রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা হইতে একদিন যে অন্ধ ভিখারিকে গর্ব্বোন্মত্ত হৃদয়ে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছ, আজ তাহারই সঙ্গে এক স্থানে শায়িত! এক স্থানে, একসঙ্গে, এক অবস্থায়, এক তৃণকাষ্ঠে, একই অনলে, একই ক্ষিতি, অপ, তেজে মিশাইয়া যাইতেছ! মানব! তুমি কিসের গর্ব্ব কর? গর্ব্ব করিবার তোমার কি আছে? একবার প্রাণ ভরিয়া অনিমেষ নয়নে এই শ্মশানের দিকে দৃষ্টিপাত কর,—ভাবিয়া দেখ,—দীন,

দরিদ্র অন্ধ আতুরের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য কি? তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিবার তোমার কতটুকু অধিকার আছে? জ্ঞানী শিক্ষিতাভিমানী! একবার শ্মশানের দিকে নিরীক্ষণ কর! অসীম জ্ঞানময়ের জগতে আসিয়া ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া আত্মাভিমানে আঘাত লাগিবার ভয়ে যাহার সহিত কথা কহিতে সঙ্কুচিত হইতে, চাহিয়া দেখ, বিশ্বনিয়ন্তার বিধানে তাহারই সঙ্গে এক তৃণশয্যায় শায়িত রহিয়াছ। অগাধ ধনৈশ্বর্য্যের অধিপতি তুমি—মুহূর্ত্তের জন্যও দীন, হীন, নিরাশ্রয় কাঙ্গাল আতুরের হাহাকার ধ্বনি তোমার কর্ণে প্রবেশ করে না, নিজ স্বার্থ সুখ লইয়া বিলাস-স্রোতে ভাসিয়াছ, তুমিও একবার চাহিয়া দেখ, কোথায় তোমার সেই ধনৈশ্বর্য্য? তোমার পুত্র পৌত্রাদিগণ তোমায় শ্মশানে ফেলিয়া মনে মনে ধনৈশ্বর্য্যের বিভাগ কল্পনা করিতেছে! ঐ দীন হীন কাঙ্গালগণের সঙ্গেই তোমার এক তৃণকাষ্ঠে ভস্ম করিয়া স্বধামে চলিয়া যাইবে। সংসারে আসিয়া চির জীবনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বার্থ অহঙ্কার ত্যাগ করিতে পার না, আজ সমস্তই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া দীন হীন পথের ভিখারির সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে হইয়াছে। মানব! সংসারী তোমরা, সংসারের একটি ক্ষুদ্র কার্য্য করিতে গেলে পরিণাম ভাবিতে পশ্চাৎপদ হও না, কিন্তু

মুহূর্ত্তের জন্য জীবনের পরিণাম ভাবিতেছ না? কেন সংসারে অসিয়াছ, জীবনের কর্ত্তব্য কি, জীবনের পরিণাম কোথায়? কোথায় আবার ধনৈশ্বর্য্য, বিলাস বিভ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে? ইহা একবার ভাবিলে না?

"চলুন দাদা!" রোরুদ্যমানকণ্ঠে বিষাদমুখে অনুজ আসিয়া আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "চলুন দাদা!" কনিষ্ঠ তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা; সুখ, দুঃখ সমস্তই আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিল, "চলুন দাদা!"

আমি কনিষ্ঠের কালিমামাখা বিবর্ণ মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে অনেকক্ষণ চাহিয়া মনে মনে বলিলাম, কোথায় যাইব ভাই? ত্রিভুবনে আমাদের জুড়াইবার স্থান আর কোথায় আছে? আমাদের সেই প্রেমময় স্নেহময় পিতা নাই যে, তাঁহার চরণে মাথা রাখিয়া দগ্ধপ্রাণ শীতল করিব। আমাদের সেই স্নেহময়ী, স্নেহের মন্দাকিনী সদৃশা জননী নাই যে, তাঁহার সুশীতল পবিত্র স্নেহবারিতে হৃদয়ের প্রজ্জ্বালত অগ্নি নির্ব্বাণ করিব। যাঁহার নিকট একদিন জননীর ন্যায় স্নেহ, গৃহিণীর ন্যায় যত্ন, দাসীর ন্যায় সেবা, সখীর ন্যায় দুঃখে প্রবোধ, বিষাদে আনন্দ, ভার্য্যার ন্যায় প্রেম ভক্তি ও ভালবাসা পাইয়া জীবিত ছিলাম, যাঁহার পুত্রাধিক স্নেহ-যত্ন-ভালবাসায় তুমি মাতৃশোক বিস্মৃত হইয়াছিলে, তাহাকেও আজ শ্মশানের

পবিত্র চিতায় দগ্ধ করিলাম। ভাই! আমাদের ন্যায় হতভাগা জগতে আর কে আছে? জগতে একবিন্দু স্নেহ আমাদের জন্য আর কাহারও হৃদয়ে সঞ্চিত নাই। আমাদের এই দরিদ্রতাময় জীবন রোগ শোক দুঃখের হাহাকারে, অনাহারের ভীষণ যন্ত্রণায় মৃত্যুতীরে উপনীত হইবে। চাহিয়া দেখ, জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডে, কাহাকেও তুমি দেখিতে পাইবে না যে, একবিন্দু স্নেহ-দানে মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদিগকে জীবিত রাখিবার প্রয়াস পাইবে! দুঃখে "আহা" করে, এরূপ একটি প্রাণীও ভগবান আমাদের জন্য রাখেন নাই! তবে কোথায় যাইব ভাই?

উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ভ্রাতা আবার বলিল, "চলুন দাদা!" ভ্রাতার কাতর ক্রন্দন ও বিবর্ণ মুখ-কমল আমার কর্ত্তিত হৃদয়ে লবণ প্রয়োগ করিতে লাগিল। আর আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। সোণার প্রতিমা চিতাগ্নিতে বিসর্জ্জন দিয়া, জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতল জলে ডুবাইয়া উদাস প্রাণে ভ্রাতার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। আমার অর্দ্ধদগ্ধ হৃদয়াভ্যন্তরে হাহাকার ধ্বনির মধ্য দিয়া চারিদিক হইতে বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জনের উচ্চবাদ্য ধ্বনি কর্ণপটাহ ভেদ করিয়া হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আমার সকলই ফুরাইয়া গেল! মানুষ জগতে ঘুরিয়া মরে আশার কুহকিনী মন্ত্রে! আমার আর কোন আশাই নাই। প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকে। সেই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া অকাতরে সংসারের তীব্র দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে। কাহার উদ্দেশ্য—আমি ধনবান হইব, কাহার উদ্দেশ্য—বিদ্যা অর্জ্জন করিব, কাহার উদ্দেশ্য—আমার স্ত্রীপুত্রের জন্য প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইব, মৃত্যুর পর তাহারা কষ্ট না পায়; কাহার উদ্দেশ্য—রাজা মহারাজা খেতাব লইব, কাহার উদ্দেশ্য—চির জীবন বিলাস-স্রোতে গা ভাসাইয়া জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ করিব। কাহার উদ্দেশ্য—দীন দুঃখীর সেবা করিয়া প্রাণপাত করিব। কাহার উদ্দেশ্য—পার্থিব সংসারের সকল মায়া ত্যাগ করিয়া পরম ব্রহ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিব। মানুষ এবংপ্রকার বা অন্য প্রকার উদ্দেশ্য বুকে লইয়া পরপীড়ন, নির্য্যাতন, অধর্ম্ম, অন্যের অনিষ্ট সাধন, চুরি ডাকাতি প্রভৃতি গর্হিত কার্য্য করিতে তিলমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না! আবার অন্যদিকে কত মহাপ্রাণ ব্যক্তি

নিজ নিজ সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য আত্মত্যাগ, আত্ম বলিদান, বিজন অরণ্যে বাস, আপন-পর অভেদ জ্ঞান, এবং পরোপকারের জন্য স্বাস্থ্য সুখ, এমন কি, জীবন বলিদান দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। যাহারা অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, একমুষ্টি চাউলের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপ মস্তকে লইয়া, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদেরও একটা উদ্দেশ্য আছে। তাহাদের উদ্দেশ্য— নিত্যভিক্ষায় কোন মতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া রাখিব, যাহাতে উত্থানশক্তিরহিত শয্যাসায়ী অবস্থায় অনাহারে ক্ষুধার যন্ত্রণায় প্রাণবায়ু বহির্গত না হয়। আমি ভিখারীরও অধম, আমার উদ্দেশ্যও লক্ষ্যহীন! জীবনের ভারবহন করাও এখন আমার পক্ষে অসহ্য!

গৃহে মুহূর্ত্তের জন্যও তিষ্ঠিতে পারিলাম না! আত্মঘাতী হওয়া মহাপাপ। এ পাপপঙ্কেও ডুবিতে প্রবৃত্তি হইল না। ভ্রাতার স্নেহ-মমতার বন্ধনে জড়িত হইয়া, সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেও প্রাণ চাহিল না! ভ্রাতাকে কোথায় রাখিয়া যাই? ভাবিলাম, ভ্রাতাকে সংসারী দেখিয়া, ভ্রাতার জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিয়া দিয়া, সংসারের দুঃখময় ভীষণ কুটীল বন্ধন চিরতরে ছিন্ন করিয়া ফেলিব। এ জীবনে সংসারের নিষ্ঠুর মুখ আর দেখিব

না! মরুময় জীবন লইয়া কলিকাতা নগরীর রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

অগ্রহায়ণ মাস। প্রচণ্ড শীত। রাত্রি দশ ঘটিকার পর প্রচণ্ড শীতে জনবহুল রাজপথে মাত্র দুই চারিটী লোক কম্পিত দেহে যাতায়াত করিতেছে। আমি নিত্য এই সময় নিমতলার শ্মশানে যাইয়া বসিয়া থাকিতাম। সমস্ত রজনীই অনিদ্রিত চক্ষে শ্মশানে বসিয়া মানব-জীবন ও মানব-জীবনের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে আলোচনা করিতাম। কখন কখন দুই একজন লোক আমার কাছে আসিয়া বসিত, আমি তাড়াতাড়ি দশহাত দূরে পলাইয়া যাইতাম। মানুষকে আমি কালসর্প অপেক্ষাও ভয় করিতাম, মানুষের সংসর্গ আমি বিষবৎ জ্ঞান করিতাম। মানুষ দেখিলেই আমি মনে করিতাম, কি ভয়ঙ্কর জীবই আমার কাছে আসিতেছে! মানুষ! মানুষ কে? ভগবানের রাজ্যে একটি শ্রেষ্ঠ জীব! মানব—জগতের পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ হেন মানব, হিংসা, দ্বেষ, কপটতা, ক্রূরতা, স্বার্থপরতা, নীচাশয়তা, নিষ্ঠুরতাতে পশু রাজ্যকেও পরাস্ত করিয়াছে! মানব সোণার সংসারকে কেবল দানবের লীলাভূমি করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, স্বর্গভূমিকে নরককুণ্ডে পরিণত করিয়াছে! মানব স্বার্থের জন্য করিতে পারে না, এরূপ কার্য্য জগতে নাই!

মানুষ নিজ উদর ও স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্য কপটতার তীক্ষ্ণ ছুরিকা হৃদয়ে লইয়া, সরলতায় সকলকে মুগ্ধ করিতেছে। মিথ্যার গরলরাশি হৃদয়ে পুরিয়া, স[illegible] ও সাধুতার ভানে সংসারের লোককে মোহিত করিতেছে! দীনের আর্ত্তরব, ক্ষুধার্ত্তের হাহাকার ধ্বনি মানবের কর্ণপটাহ ভেদ করিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতেছে না! এরূপ হৃদয়কে মানব-হৃদয় বলিতে পারি না! ইহারা মানবাকারে কি, তাহা জানি না! যাহারা সরল বিশ্বাসী, অকপট-চিত্ত লোককে ঠকাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, তাহারাই বুদ্ধিমান, সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি! ইহারাই দীন দুঃখীর নিকট মান-সম্ভ্রমের অধিক দাবী করিয়া থাকে।

মানুষ সব ভাবে —স্ত্রীপুত্রের কথা ভাবে, সংসারের কথা ভাবে, ধন অর্থের কথা ভাবে, গরিব রামশ্যামের ধন কূটবুদ্ধিবলে কিরূপে গ্রাস করিবে, এ কথা অহরহঃ ভাবে; কেবল ভাবে না, এই শ্মশানের কথা! এক দিন যে তাহার সর্ব্বস্ব এই শ্মশানে ছাই হইয়া যাইবে, কেবল ভাবে না এই কথা! মনে আসিলেও একথা উড়াইয়া দেয়।

মানুষ অনবরত অব্যাহত গতিতে পঙ্কিল সংসার-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, ভাবে না একবার যে, কোন্ পথে যাইতেছে! স্রোতের কুটার মত ভাসিয়া যাইতেছে,

ভাবে না, কোথায় যাইতেছে! মানুষ আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়া কোন অজ্ঞেয় সাগরে যাইয়া পড়িবে, তাহাও একবার চিন্তা করিয়া দেখে না। মানুষ ভূত-ভবিষ্যতের চিন্তা করিতেছে না, কেবল "আমার" "আমি" রবে চিৎকার করিয়া বর্ত্তমানের ক্ষণিক আনন্দে বিভোর হইয়া আছে! এই সব ভাবিতে ভাবিতে যখন আমি মানুষের সংসর্গ বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া দূরে পলাইয়া যাই, তখন লোকগুলা আমাকে পাগল মনে করিয়া আমার দিকে চাহিয়া থাকে।

নিত্যই রজনীতে নিমতলার শ্মশানে এইরূপ ঘটনা হয়। লোকগুলা আমার কাছে আসিলে নিত্যই আমি পলাইয়া যাই, লোকগুলা নিত্যই আমাকে পাগল মনে করিয়া আমার দিকে চাহিয়া থাকে।

একটি যুবক—আহা! কি অনিন্দ্য সুন্দর মূর্ত্তি! নিত্য শ্মশানে আসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। অপর লোক-গুলির ন্যায় যুবক আমার দিকে চাহিয়া থাকিত, কিন্তু সে দৃষ্টি ঘৃণাপূর্ণ নহে! রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত, ঘোর অন্ধকার, চারিদিক নিস্তব্ধ! নিমতলার শ্মশানভূমি পাঁচ ছয়টি প্রজ্জ্বলিত চিতার আলোকে আলোকিত! শোকা-তুর নর-নারীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে এবং শোকাশ্রুতে প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নি যেন নির্ব্বাণ হইয়া যাইতেছে! পুত্রহারা একটি

দরিদ্রা রমণীর মর্ম্মভেদী কাতর ক্রন্দনে পাষাণ বিদীর্ণ হইতেছে! দেখিতে দেখিতে হতভাগিনী পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। যুবক এতক্ষণ পতিতপাবনী জাহ্নবীর দিকে উদাস্থ নয়নে চাহিয়াছিল। মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া, দৌড়িয়া বৃদ্ধার শোকাতুরা, শীর্ণ, শুষ্ক দেহখানি নিজ ক্রোড়ে উঠাইয়া শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। বৃদ্ধা এতক্ষণ অচৈতন্য হইয়া মৃতার ন্যায় পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাকে ছিন্ন মলিন বেশা, ভিখারিণীর ন্যায় দেখিয়া কেহ একবার ফিরিয়াও চাহে না। বৃদ্ধার পুত্রকে যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধার কেহই আত্মীয় ছিল না। পুত্রের দাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সকলেই স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল। বৃদ্ধার অবস্থা ভুলিয়াও কেহ একবারও ভাবিল না।

ভাবিলাম, কে এই যুবক? এই ঊনবিংশ শতাব্দির যুবক-হিন্দুর প্রকৃত শিক্ষা, দীক্ষা ও সংযম অভাবের দিনে, আত্ম-সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া, রজনী তৃতীয় যাম অতীতে, নিবীড় অন্ধকারে বিলাস শয্যা ত্যাগ করিয়া শ্মশানভূমিতে একটি দীন হীনা পুত্রশোকাতুরা কাঙ্গালিনীকে ক্রোড়ে করিয়া বসিল কে এই যুবক? যুবকের ত সে চক্ষু নহে! কলিকাতার রাজপথে বিলাস-বিভ্রম কটাক্ষে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া যে সব ধনীর সন্তান ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা-

দের চক্ষুর সহিত যুবকের চক্ষুর যে অনেক প্রভেদ! যুবকের দৃষ্টিতে যেন দয়া, সহানুভূতি ও করুণা-মাখান! অনিমেষ নয়নে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

যুবক আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এই শোকাতুরা বিধবা। বৃদ্ধার জীবন রক্ষার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিবেন কি? পতিতপাবনী জাহ্নবীবারি একটু বৃদ্ধার মুখে দিন।"

আহা! কি নম্রতাপূর্ণ মধুর স্বর! বিনা বাক্যব্যয়ে শ্মশানের একটি মৃন্ময় কলস লইয়া অতিক্রতপদে পুণ্যতোয়া ভাগিরথীর পবিত্র বারি আনিয়া বৃদ্ধার মুখে দিতে লাগিলাম। যুবক নিজ বস্ত্রের দ্বারা বৃদ্ধার মস্তকে ব্যজন করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে বৃদ্ধার একটু চৈতন্য হইল। যুবকের আনন্দের সীমা রহিল না।

সম্পূর্ণ সংজ্ঞা লাভের পর বৃদ্ধা আবার পুত্রের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। যুবক নানা উপায়ে সান্ত্বনা করিয়া বৃদ্ধার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে বৃদ্ধা আবার চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। যুবক নানারূপ মিষ্ট বাক্যে বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল,—"মা! আজ হইতে আপনি আমাকে সন্তান বলিয়া মনে করিবেন। পরিচয় প্রদান করিতে যদি শোকাবেগ বৃদ্ধি হয়, বলিয়া কাজ নাই।

তবে পরিচয় পাইলে যদি আমাদ্বারা কিছু উপকার হয়, তাই জানিতে আমার আকুলতা বৃদ্ধি পাইতেছে।"

বৃদ্ধা রোরুদ্যমানা কণ্ঠে বলিল, "বাবা! আমি বড়ই দুঃখিনী। এরূপ মধুমাখা কথা অশীতি বৎসরের মধ্যে কখন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আহা! বাছার আমার মধুর "মা' মা" ধ্বনি আজ একবৎসর আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই! আহা, বাছা এমনই স্নেহভরে আমায় মা বলিয়া ডাকিত।" আবার বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। যুবক আবার বহুকষ্টে বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা করিল। যুবকের সহানুভূতিপূর্ণ মধুর বাক্যে এবং পুত্রের ন্যায় সান্ত্বনায় বৃদ্ধার ভীষণ পুত্রশোকের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল! বৃদ্ধা শোকাশ্রুতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে করিতে সংক্ষেপে নিজ পরিচয় প্রদান করিল।

তারকেশ্বর হইতে চারি ক্রোশ দূরে কোন ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে বৃদ্ধার বাস। বৃদ্ধার এই একমাত্র সন্তান। বৃদ্ধা জাতিতে বাগ্দী। পুত্রটি চাষ-আবাদ করিয়া বৃদ্ধা জননী, পত্নী ও দুইটি শিশু সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিত। দামোদরের ভীষণ বন্যায় চাষ-আবাদ উঠিয়া যাওয়ায়, ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করা কষ্টকর হইয়া উঠিল এবং কিছু দিনের মধ্যেই ইহাদের সুখের সংসারে অন্নাভাবের হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল।

পুত্রটি—বৃদ্ধা জননী, পত্নী ও দুইটি শিশুসন্তানের জীবন রক্ষার জন্য কলিকাতায় চাকরি করিতে আসিয়া, আজ এক বৎসর একটি ভদ্র-গৃহস্থের বাটিতে খোরাক পোষাক ও মাসিক দুই টাকা বেতনে চাকরিতে নিযুক্ত হইয়াছিল। অকস্মাৎ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া বৃদ্ধার জীবনের সম্বল আজ নিমতলার শ্মশানে আনীত হইল! তাহার নশ্বরদেহ চিতাভস্মে মিশাইয়া গেল।

বৃদ্ধার কথা শুনিতে শুনিতে যুবকের চক্ষু দিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যুবক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "মা, তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের আর অন্য কোন উপায় নাই?"

বৃদ্ধা বলিল, "না বাবা! সেই অপোগণ্ড শিশুদুটি আর তাহাদের হতভাগিনী জননীর জীবন রক্ষার আর কোন উপায়ই নাই।"

"মা, সে জন্য তোমাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। আর এখানে থাকিয়া তোমায় কষ্ট পাইতে হইবে না। আমি এখনই তোমায় বাটি পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।"

"কে বাবা তুমি? তুমি কি কোন দেবতা?"

যুবক সঙ্কুচিত ও লজ্জিত মুখে বলিল, "না মা! আমি তোমার আর একটি সন্তান।"

যুবক বিনয় নম্রস্বরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি যদি বৃদ্ধার নিকটে একটু থাকেন, আমি বড়ই উপকৃত হই। আমি এখনই ফিরিয়া আসিব।"

যুবকের করুণাপূর্ণ উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া আমি আশ্চর্য্য, স্তম্ভিত, এবং দুঃখও হর্ষে কেমন একপ্রকার হইয়া গিয়াছিলাম। যুবকের কথায় সম্মতিজ্ঞাপক একবার মস্তক সঞ্চালন করিয়া বৃদ্ধার পার্শ্বে বসিলাম। যুবক চলিয়া গেল।

আবার ভাবিতে লাগিলাম, কে এই যুবক? সংসারে অনেক যুবক, অনেক প্রৌঢ়, অনেক বৃদ্ধ দেখিয়াছি, এমন নীরবে নিঃস্বার্থভাবে দুঃখির জন্য কখন কাহাকেও কাঁদিতে দেখি নাই; যদি বা কখনও কাহাকেও দেখিয়া থাকি, তবে নিশ্চয় সে ক্রন্দন হৃদয়ের গভীরদেশ হইতে উত্থিত হয় নাই;— সে অশ্রুবারি দাম্ভিকতা ও স্বার্থপরতার ক্লেদ মিশ্রিত। এরূপ পবিত্র হৃদয়ের নির্ম্মল স্বচ্ছ অশ্রুবারি আমি জীবনে এই প্রথম দেখিলাম। আমার মানবের উপর যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব ছিল, তাহা তিরোহিত হইয়া গেল। নির্ম্মম নিষ্ঠুর মানব-সমাজে মানব-হৃদয়ের প্রকৃত মহত্ত্ব আজ দেখিতে পাইলাম। একি হইল! যুবককে একবার মাত্র দেখিয়া তাহার প্রতি আমার হৃদয় এরূপ সহধর্ম্ম পদার্থের ন্যায় আকৃষ্ট হইল কেন?

ভাবিতে লাগিলাম,—বৃদ্ধার সেই কঙ্কালসার দেহটি ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া তাহার শোকাশ্রু মুছাইতে মুছাইতে ভাবিতে লাগিলাম,—অল্পক্ষণ একবার মাত্র সাক্ষাতে হৃদয় কেন আকৃষ্ট হইল? প্রত্যেক মানব হৃদয়েই ঈশ্বর প্রদত্ত তাঁহার অংশ স্বরূপ সৎবৃত্তিগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই সৎবৃত্তিগুলি কাহারও জাগ্রত, কাহারও নিদ্রিত। জানি না, ইহা পূর্ব্বজন্মের পুণ্য কি সংস্কার অথবা উপযুক্ত পিতা মাতার শিক্ষা, দীক্ষা, সংসর্গ ও তাঁহাদের সাধনার ফল কি না? যাহাদের সৎবৃত্তিগুলি জাগ্রত, তাহারাই অপর হৃদয়ের সৎবৃত্তিগুলি জাগরিত করিয়া হৃদয়ে টানিয়া লইতে পারে। ভীষণ জীবন-সংগ্রামে স্বার্থ-কোলাহলে মানবের এই উচ্চ হৃদয়-বৃত্তিগুলি সর্ব্বক্ষণ সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে! যে নিঃস্বার্থতার পবিত্র সলিলে নিজ হৃদয়ের স্বার্থপরতা রূপ পঙ্কিলরাশি ধৌত করিতে পারে, তাহার হৃদয়ই প্রকৃত মানব হৃদয়

যুবক অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন হিন্দুস্থানী দ্বারবান সঙ্গে প্রত্যাগমন করিয়া বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মা। ইহার সঙ্গে গৃহে যাও, সমস্তই বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি, পথে কোনই কষ্ট হইবে না।"

বৃদ্ধা অনিমেষ নয়নে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কে বাবা তুমি?"

শ্মশানের পার্শ্বে রাজপথে একখানি সুন্দর ব্রুহামে সংযোজিত হইয়া দুইটি সুন্দর শ্বেতবর্ণের বলিষ্ঠ অশ্ব চালকের আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। যুবক দ্বারবানের সাহায্যে বৃদ্ধাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া, গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। গাড়িখানি হাওড়ার ষ্টেশনাভিমুখে পবনবেগে ছুটিয়া চলিল।

আমি অনিমেষ নয়নে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে প্রশ্ন করিলাম, এই স্বার্থপূর্ণ নির্ম্মম সংসারে দেবতার হৃদয় লইয়া কে তুমি মানব ধর্ম্ম প্রচার করিতেছ ভাই?

যুবক আমার হস্ত ধারণ করিয়া পতিতপাবনী জাহ্নবী-তীরের একটি নিভৃত স্থানে লইয়া গেল। স্থানটি অতি নির্জ্জন। দুই চারিখানি নৌকা বাঁধা আছে, তাহার উপর মাঝি-মল্লারা শান্তিদায়িনী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ক্ষণেকের জন্য সংসারের শোক, দুঃখ, অভাবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে।

এই নিভৃত স্থানে আসিয়া যুবক বলিল, "আপনাকে নিত্যই আমি এই শ্মশানে উদাসপ্রাণে ঘুরিতে দেখি। কত দিন আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়াছি, কিন্তু আপনার পক্ষে বিরক্তিকর হইবে ভাবিয়া এতদিন জিজ্ঞাসা করি নাই। যদি কোন বাধা না থাকে, যদি

আমাকে নিতান্ত পর বলিয়া মনে না করেন, তবে আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া কৌতূহল নিবারণ করুন।"

আত্ম পরিচয় কখনও কাহাকেও দিই নাই, দিবার প্রবৃত্তিও নাই। যুবকের অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। আমার জীবনের আদ্যোপান্ত দুঃখের কাহিনী যুবকের নিকট বর্ণনা করিলাম। একটি কথাও গোপন করিলাম না। পূর্বদিক অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, আমার জীবন কাহিনীও শেষ হইয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যুবকের নাম সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান হাওড়া জেলার অন্তর্গত কোন পল্লিগ্রামে সুরেন্দ্রনাথের বাসস্থান। সুরেন্দ্রনাথের পিতা কেবল স্বগ্রামের জমিদার নহেন, আরও দশ বারখানি জমিদারির মালিক কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথের পিতার তিন চারি রকমের কারবার আছে। প্রত্যেক কারবারে প্রায় লক্ষাধিক টাকা খাটিতেছে। সুরেন্দ্রনাথের পিতা অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, ব্যবসা করিয়া তিনি আজ উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতা সাধুতা ও সরলতাগুণেই কারবারের উন্নতি করিয়াছেন। সুরেন্দ্র-নাথের পিতা এখন বৃদ্ধ, তাই পুত্রের হস্তে ব্যবসা বাণি-জ্যের ভারার্পণ করিয়া জন-কোলাহলশূন্য নিভৃত পল্লিগ্রামে ধর্ম্মচিন্তায় রত থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতা বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া জমিদারির ভার উপযুক্ত কর্ম্মচারির হস্তে ন্যস্ত করিয়া সর্ব্বক্ষণই ভগবৎ চিন্তায় রত থাকিয়া পারত্রিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। উপযুক্ত সন্তান সুরেন্দ্র-

নাথ সাধুতাকে সঙ্গী করিয়া কারবারাদি পরিচালনা করিতেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ পিতার একমাত্র সন্তান। সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী শৈলবালাও তাঁহার পিতার একমাত্র কন্যা। শৈলবালার পিতা সহরের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। চিকিৎসা ব্যবসায়ে শৈলবালার পিতা মাসিক দুই সহস্র টাকার অধিক উপার্জ্জন করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার কলিকাতায় কয়েকখানি বাড়ী ও তেজারতি আছে। শৈলবালার পিতার বয়স যখন চল্লিশ বৎসর, তখন শৈলবালার মাতার মৃত্যু হয়। শৈলবালার বয়স তখন দশ বৎসর মাত্র। শৈলবালাই তাহার পিতার সর্ব্বস্ব। তিনি আর বিবাহ করেন নাই। সমস্ত বিষয় সম্পত্তি শৈলবালার পিতা শৈলবালার নামে উইল করিয়া রাখিয়াছেন।

শৈলবালা এখন পঞ্চদশ বর্ষীয়া যুবতী। শৈলবালা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী তুল্যা। সুরেন্দ্রনাথ এক বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবা পুরুষ। সুরেন্দ্রনাথের অঙ্গাবয়ব নিখুঁত, দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। শৈলবালার রূপচ্ছটায় তাহার পিতৃ-গৃহ সর্ব্বক্ষণ আলোকিত। শৈলবালার পিতা একমাত্র কন্যাকে এক দিনের জন্যও নয়নান্তরালে রাখিয়া থাকিতে পারেন না। শৈলবালা কাছে বসিয়া না থাকিলে পিতার আহারে মনোযোগ থাকে না, শৈলবালা পিতার আহারের

পর তাম্বুলের ডিবাটি সম্মুখে না ধরিলে পান খাইতে ভুলিয়া যান। কন্যা বারবার পিতাকে শয়নের জন্য অনুরোধ না করিলে তাঁহার পুস্তক পাঠেই রজনী অতিবাহিত হইয়া যায়। গলদঘর্ম্ম হইয়া রোগী দেখিয়া আসিবার পর শৈলবালা কোটের বোতামগুলি খুলিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ না করিলে ডাক্তার বাবু চেয়ারে বসিয়া উদাস নয়নে গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিতে থাকেন। এক এক দিন শৈলবালার পিতা তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে স্মরণ করিয়া যখন শয্যার উপর ছটফট্ করিতে থাকেন, তখন শৈলবালা পিতৃ-শিয়রে বসিয়া ব্যজন না করিলে অনিদ্রিত চক্ষেই রজনী অতিবাহিত হইয়া যায়। এই সমস্ত কারণে ডাক্তার বাবু কন্যাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠাইতে পারেন না। সুরেন্দ্রনাথের পিতাও কখন বধূকে লইয়া যাইবার জন্য জেদ করেন না। শৈলবালা বিবাহের পর একবার মাত্র দুই দিনের জন্য শ্বশুর-ভবনে গিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে রামবাগানে তাঁহার শ্বশুর গৃহে যাইয়া শৈলবালার সহিত সাক্ষাত করিতেন। নিত্য দর্শনের আশায় শৈলবালা স্বামীর পা জড়াইয়া কত কাঁদিত, কত অনুরোধ ও মিনতি করিত, সুরেন্দ্রনাথের শ্বশুরও জামাতাকে মাঝে মাঝে অনুরোধ করিতেন কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াই নিত্য শ্বশুর গৃহে যাইতেন না।

আজ ছয় মাস হইল আমি সুরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইয়াছি। এই ছয় মাস কাল সুরেন্দ্রনাথের সংসর্গে শোক-জ্বালা বিস্মৃত হইয়া আমি যেন নব জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আমি একদিন সুরেন্দ্রনাথকে না দেখিলে থাকিতে পারি না। একদিন সাক্ষাৎ না হইলে সুরেন্দ্রনাথও আমার অনুসন্ধানের জন্য লোক প্রেরণ করে।

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত। বৈশাখ মাস, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর রাত্রি। ফুল্ল জোৎস্নালোকে জগৎ উদ্ভাসিত। চন্দ্রিমা-কিরণে পবিত্র জাহ্নবী সলিল অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। গঙ্গাগর্ভে নৌকার উপর মাঝি মাল্লারা সুষুপ্তির ক্রোড়ে শায়িত। চন্দ্রিমা ও তারকারাজি জাহ্নবীর স্বচ্ছ পবিত্র সলিলে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মেঘহীন স্বচ্ছ আকাশ বিশাল দেহখানি লইয়া জাহ্নবী সলিলে স্রোতের উপর দিয়া কত দূরদূরান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। চারি দিক নিস্তব্ধ। কেবল আমরা গঙ্গা-সলিলের দুই হস্ত দূরে লৌহ সোপানে বসিয়া কথোপকথন করিতেছি এবং অদূর শ্মশান হইতে এক একবার করুণ ক্রন্দনধ্বনি আসিয়া ভীষণ নীরবতার মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছে। জগতের ন্যায় সুরেন্দ্রনাথ আমাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করে না, বরং আমার অপেক্ষা সুরেন্দ্রনাথ দীন ইহা কথায় ব্যবহারে আমাকে জানাইতে

চেষ্টা করে। সুরেন্দ্রনাথের কথা ও ব্যবহারে আমি মনে মনে হাসিয়া কৌতুকানুভব করি। সুরেন্দ্রনাথ এখন আমাকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ করে, হৃদয়ের বন্ধু অপেক্ষাও ভালবাসে। আর আমি—আমি যে সুরেন্দ্রনাথকে কি চক্ষে দেখি, তাহা ভাষায় বুঝাইতে পারিব না। নানারূপ কথোপকথনের পর আমার দক্ষিণ হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিল,—"ভাই! তোমাকে কত বুঝাইয়াছি, কত অনুরোধ করিয়াছি যে, শোক দুঃখে অধীর হইও না, কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে দেখিতে পাই, তোমার হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে তপ্তদীর্ঘশ্বাস নির্গত হয়। বন্ধুর অনুরোধ রাখিবে না ভাই? এখনও শোক দুঃখ বিস্মৃত হইবে না?" সুরেন্দ্রনাথের দুই বিন্দু অশ্রু আমার হস্তের উপর ঝরিয়া পড়িল।

"কবে তোমার কোন কথা রাখি নাই ভাই? আমার হৃদয়ের মলিনতা তোমার সহবাসে ধৌত হইয়াছে, তোমার অপকট স্নেহ, ভালবাসায় শোক-জ্বালা বিস্মৃত হইয়াছি। ভগবানে বিশ্বাস ও তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে শিক্ষা লাভ করিয়াছি! ভাই, তোমার সংসর্গ যদি না পাইতাম, তবে যে নরক-যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছিলাম," সেই যন্ত্রণাতেই অহরহঃ দগ্ধ হইয়া মরিতাম। সহস্র সাবধানের মধ্যেও মাঝে মাঝে পূর্ব্বস্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে, তাই

ভাই, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে তপ্তদীর্ঘশ্বাস এক একবার নির্গত হয়। সে তপ্তশ্বাস একবারও তোমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না কেন, ইহাই আশ্চর্য্য!"

সুরেন্দ্র।—ভাই, শোক দুঃখ করিবে কাহার জন্য? অস্থায়ীবস্তুকে স্থায়ী বস্তু মনে করিয়া তাহার ধ্বংসে ব্যাকুল হওয়া মূঢ়তার লক্ষণ! যদি বুঝিতাম, পার্থিব সংসারে যাহাকে প্রাণের প্রাণ নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে করি, তাহার ধ্বংস বা মৃত্যু নাই, তাহা হইলে শোক-দুঃখের কারণ ছিল। এই পার্থিব দেহ সকলকেই একদিন ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা যখন ধ্রুব নিশ্চয়, তখন তাহাতে আর দুঃখ কি?

"ভাই! দুঃখের স্মৃতি যে হৃদয় হইতে মুছিতে পারি না।"

সুরেন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে বলিতে লাগিল, "সর্ব্বক্ষণ ভগবানের চিন্তায় হৃদয়কে আলোকিত করিয়া রাখ, সকল স্মৃতি, সকল আঁধার ঘুচিয়া যাইবে। সংসারের ক্ষণিক সুখ আশা ও আসক্তি যতই কমাইতে পারিবে, ততই ভগবানের মহিমা প্রাণে প্রাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। মনকে পার্থিব সুখ ঐশ্বর্য্যরূপ গুরুভারে সর্ব্বক্ষণ নিষ্পেষিত করিয়া রাখিলে, ঊর্দ্ধে ভগবানের দিকে, মন উঠিতে পারে না।

যাহারা ধন ঐশ্বর্য্যের লালসা, সংসারের অতি আসক্তি ত্যাগ করিতে পারে, তাহাদের মনই ঊর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হয়। যাহারা দীন দরিদ্র, তাহাদেরই মন নির্ম্মল ; আর যাহারা অতুল ধনের অধিপতি হইয়া বিলাস মোহে ডুবিয়া আছে, ভগবানের চিন্তা তাহাদের মনে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় না। আমি শোক, দরিদ্রতা ও দুঃখকে ভালবাসি। সুখ ঐশ্বর্য্য আমি বিষের ন্যায় মনে করি। জগতে একটি অন্না-ভাবগ্রস্ত ভিখারির আসন শত শত ক্রোড়পতির আসন অপেক্ষা অনেক উচ্চে। দুঃখ-দৈন্যগ্রস্ত ভিখারির হৃদয় শোকতাপজ্বালা যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া, পবিত্র হইয়া উঠিতেছে, আর ঐ ক্রোড়-পতির হৃদয় নিত্য নব নব বিলাস-স্রোতে ভাসিয়া ক্লেদ ও পঙ্কিলময় হইতেছে। প্রচুর ধন-সম্পত্তি-শালী ব্যক্তিকে দেখিলে ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে, কিন্তু দুঃখ-দৈন্যগ্রস্ত ব্যক্তিকে অকম্পিত হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া প্রাণে শান্তি পাই। ধনির হৃদয় নিত্য নব নব পার্থিব সুখে ডুবিয়া থাকিবার জন্য আসক্তি, উৎ-কণ্ঠা, চিন্তা ও অশান্তি-অনলে দগ্ধ হইতেছে, সুখ-লালসা মিটিতেছে না, বিষয় ক্ষুধা নিবারণ হইতেছে না, বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া জগতে বিচরণ করিতেছে। ঈশ্বর-চিন্তা নাই, ভগবৎ-ভক্তি নাই, মৃত্যুভয় নাই, যেন চিরকালের জন্য চির আবাস নির্ম্মাণ করিয়া এই সংসারে তাহারা বিচরণ

করিবে। দীন, দরিদ্র, অভাব ও শোকগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদয় ধনীর হৃদয় অপেক্ষা উচ্চস্থানে বিচরণ করে। তাহাদের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কাতর স্বর নির্গত হইয়া সকলের অলক্ষিতে কাহাকে যেন সর্ব্বক্ষণ ডাকিতে থাকে। কাতর আহ্বানে, দুঃখ-দৈন্যের কষাঘাতে হৃদয় মন পবিত্র হইয়া তাহাদের আত্মা এত সুদূর উচ্চে উত্থিত হইতে সক্ষম হয়, যথায় ক্রোড়পতির ভোগসুখরত আত্মা উত্থিত হইতে সক্ষম হয় না। ভাই! শোক, দুঃখ, দরিদ্রতা ফেলবার জিনিষ নহে। ইহা ভগবানের দান মনে করিয়া বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে হয়। শোক, দুঃখ, দরিদ্রতা ধনীর রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা অপেক্ষা মূল্যবান, ক্রোড়পতির মণি-মাণিক্য অপেক্ষা শোক দুঃখ জীবের মঙ্গলদাতা ও অন্তিমের রক্ষাকর্ত্তা। ধনী ভিখারিকে ঘৃণা করে। হয়ত অবজ্ঞাভয়ে কখন কিছু দান করিতে যায় কিন্তু ভাবে না, কাহাকে অবজ্ঞা করিতেছি, ভাবে না কে অবজ্ঞার পাত্র। ধনী যদি ভাবিত, যে কত সাধনা করিলে, কতটুকু অহঙ্কার মাৎসর্য্য ত্যাগ করিলে, কতটুকু ভোগ লালসা পরিত্যাগ করিলে, এই ভিখারির হৃদয়ের সহিত নিজ হৃদয় বিনিময় করিতে পারে, তাহা হইলে কি ধনী ভিখারিকে ঘৃণা করিত? ধনী ভাবে না যে, এই ভিখারির ন্যায় হৃদয় পাইতে তাহাকে হয়ত কত যুগ যুগান্তর ঘুরিতে হইবে।

ভাই! শোক যে ভগবানের রাজ্যে কত মূল্যবান, তাহা কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ? আত্মীয় পরিজন বা বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু-জনিত শোকে ক্ষণেকের জন্য হৃদয়ের যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থা যদি স্থায়ী হইত, তবে মানব দেবপদবাচ্য হইতে পারিত, মানবের প্রকৃত মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইত। সেদিন এই শ্মশানে একজন পুত্র-শোকাতুর পিতাকে দেখিয়াছিলাম। যখন তাহার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, তিনি শোকাকুল হৃদয়ে সঙ্গীদিগকে বলিতে লাগিলেন, "আর কেন? সংসারে আমার আর কোন বাসনা নাই! কাহার জন্য সঞ্চয় করিব? অর্থ সম্পত্তি গাড়ী, বাড়ী আর কাহার জন্য? গৃহিণীর জীবিকার্জ্জনের জন্য কিঞ্চিৎ রাখিয়া পর-সেবায় দীন সেবায় ব্যয়িত করিব।" পুত্র শোকাতুর পিতার হৃদয়ে কি পবিত্র বৈরাগ্য ভাবের উদয়! কি বিবেক জ্ঞান!

বৃদ্ধের হৃদয়ে এই পবিত্রতর ভাব কতক্ষণ স্থায়ী হয় জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতুহল হইল। বৃদ্ধের আবাস স্থান জানিয়া লইয়া কয়েক দিন পরে তাঁহার বাটীর সম্মুখে ঘুরিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বৃদ্ধ পুত্র-শোক অনেকটা বিস্মৃত হইয়া তাঁহার কর্ম্মচারীর সঙ্গে বৈষয়িক বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। একটি অন্ধ একটি

স্ত্রীলোকের হস্ত ধারণ করিয়া ভিক্ষার জন্য চিৎকার করিতেছে, কিন্তু অন্ধের কাতর রব বৃদ্ধের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না, তিনি অতি মনোযোগের সহিত বৈষয়িক আলোচনাতেই ব্যস্ত আছেন। মনের দুঃখে বলিলাম, হায় স্বার্থময় বিষয়াসক্তি! বৃদ্ধ! কোথায় তোমার আজ পবিত্র শোক দুঃখ হইতে উদ্ভূত বিবেক-জ্ঞান? তুমি আবার যে তিমিরে সেই তিমিরেই মগ্ন হইয়া রহিলে!

সুরেন্দ্রনাথ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের একজন কর্মচারী একখানি পত্র হস্তে আসিয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ায়, সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কোন বিশেষ জরুরি সংবাদ আছে কি?"

কর্মচারী কম্পিত হস্তে পত্রখানি সুরেন্দ্রনাথের হস্তে অর্পণ করিয়া বিষাদমুখে প্রভুর আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ পত্রখানি পাঠ করিয়া বার বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখি, নয়ন-যুগলের অশ্রুরাশি গণ্ডস্থল বহিয়া সুরেন্দ্রনাথের প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে আসিয়া পড়িতেছে।

চিৎকার করিয়া বলিলাম, "কাহার চিঠি সুরেন্দ্রনাথ? কেন ভাই, কাঁদিতেছ কেন?"

সুরেন্দ্রনাথ কোন কথা বলিতে পরিল না। চিঠিখানি আমার হস্তে দিয়া পাঠ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

পত্রখানি পাঠ করিয়া আমি বিচলিত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, হে ভগবান! সুরেন্দ্রনাথকে আবার কি বিপদে ফেলিবেন?

চিঠিখানি সুরেন্দ্রনাথের পিতার জমিদারির কর্ম্মচারী মহাশয় লিখিয়াছেন। পত্রে লেখা আছে:—

মহাশয়!

দেশ ছারখার হইয়া গেল,—আপনার সোণার জমিদারী শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। পাছে আপনি কারবারাদি ত্যাগ করিয়া এই সংক্রামক স্থানে আসেন, এইজন্য আপনাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিতে পূজনীয় কর্ত্তা মহাশয়ের নিষেধ ছিল। আজ-কাল ম্যালেরিয়া জ্বরে নিত্যই দেশে লোকশূন্য হইতেছে, গৃহে গৃহে ক্রন্দন-ধ্বনি, প্রজাদের দুরাবস্থার সীমা নাই, ইহার উপর আজ সপ্তাহ কাল ভীষণ কলেরা ব্যাধির সংক্রামতা বৃদ্ধি হইয়া নিত্য শত শত প্রজা কাল-কবলে পতিত হইতেছে। নিতান্তই হতভাগ্য আমি যে, অনিচ্ছা স্বত্বেও আজ ইহাপেক্ষাও ভীষণ সংবাদ লেখনীসাহায্যে স্বহস্তে প্রেরণ করিয়া আপনার করুণ নির্ম্মম হৃদয়কে ব্যথিত, চঞ্চল ও শোকগ্রস্ত করিতে হইতেছে। কিন্তু না করিলেও আর উপায় নাই! ভগবান একি করিলেন! আমরা কর্ত্তার পায়ে পড়িয়া কত কাঁদিয়াছি, কত অনুরোধ বিনয় করিয়াছি, তিনি মৃত্যু

মৃদু হাসিয়া, এক একবার আকাশের দিকে চাহিয়া আমাদিগকে নিরস্ত করিয়াছেন। আমাদের সহস্র ক্রন্দন, অনুরোধ, বিনয় উপেক্ষা করিয়া আজ সপ্তাহ কাল অনিদ্র নয়নে ভীষণ সংক্রামক কলেরা রোগগ্রস্ত দীন প্রজাদের স্বহস্তে সেবা শুশ্রূষা করিয়া কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি ভীষণ ওলাউঠা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছেন। জানি না, কি হইবে, জানি না, ভগবান কি করিবেন? কয়েক জন চিকিৎসক কর্ত্তার শিয়রে বসিয়া আছেন। দীন দুঃখীর পিতা মাতাস্বরূপ আমাদের পূজনীয় পিতৃ-সদৃশ প্রভু কেবল "জল" "জল" করিতেছেন। আর কি লিখিব--- লিখিতে হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। আপনি মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া এখানে আসুন। আমরা অতল সমুদ্রের গভীর জলে নিমজ্জিত হইয়াছি।

আপনার ভৃত্য—

শ্রীরঘুনাথ মিত্র।

পত্রখানি পাঠ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথের গলদেশ বেষ্টন করিয়া রোরুদ্দমান কণ্ঠে বলিলাম, "সুরেন্দ্রনাথ! তুমি উপযুক্ত পিতার সন্তান! ধন্য তোমার পিতা! যিনি দরিদ্র প্রজাদের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া, নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছেন! সুরেন্দ্রনাথ, তুমি ধন্য যে, দেব-সদৃশ এমন

পিতা তুমি পাইয়াছিলে! জানি না, সুরেন্দ্রনাথ! কবে দেশের ভূম্যধিকারীগণ তোমার পিতার আসন অধিকার করিয়া দীন দুঃখী প্রজাগণের ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন?

সুরেন্দ্রনাথ, অশ্রুবিগলিত নয়নে, ভগ্নকণ্ঠে আমাকে বাধা দিয়া বলিল, "ভাই! পিতৃপদ দর্শনের জন্য আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, ঘন ঘন বজ্রপতনের ন্যায় দেশের হাহাকার রব মুহুর্মুহু কর্ণে প্রবেশ করিতেছে! আমি চলিলাম, পিতৃপদ দর্শনের আশায় ব্যথিত হৃদয়ে ছুটিতেছি, জানি না, কবে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।"

আমি সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু জানি না, কেন সুরেন্দ্রনাথ আমাকে সঙ্গে লইল না। সুরেন্দ্রনাথের প্রাণ অপেক্ষা কি আমার প্রাণ অধিক মূল্যবান? কি জানি কেন সুরেন্দ্রনাথ কিছুতেই আমাকে সঙ্গী করিতে চাহিল না।

দরবিগলিত ধারায় বক্ষঃস্থল ভাসাইতে ভাসাইতে সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেল। আমি নির্নিমেষ নয়নে যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল সুরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া যাইবার পর দিবস রজনী আমার

যে কি ভাবে অতীত হইল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না; হৃদয়ের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করা বড়ই কঠিন। বুঝি, হৃদয়ের সূক্ষ্ম ভাব ভাষায় কেহ ব্যক্ত করিতে পারে না,—পারিলেও অপরে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে কি না সন্দেহ। আমি অনিদ্র-নয়নে অনাহারে সুরেন্দ্র-নাথ ও তাহার পিতার সংবাদ জানিবার জন্য কার-খানের প্রত্যেক কর্ম্মচারিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কেহই নূতন সংবাদ দিতে পারিল না। কাহার নিকট কোন সংবাদ না পাইয়া, আমি পথে পথে উদাস প্রাণে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আর মুহূর্ত্ত ও তিষ্ঠিতে পারিলাম না। হৃদয়ের যাতনা বৃদ্ধি হইয়া প্রাণ মন হু হু করিতে লাগিল। চারিদিন অতীত হইয়া গেল কিন্তু এই চারিদিন আমার পক্ষে চারিযুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পঞ্চম দিনের বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কোন সংবাদ না পাইয়া সুরেন্দ্রনাথের দেশে যাইব স্থির করিয়া, দেশের ঠিকানা জানিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথের কলিকাতার প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। প্রধান কর্ম্মচারি মহাশয় আমার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিলেন। পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে অশ্রুজলে আমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পত্রখানি সুদীর্ঘ। পত্রের উপসংহার ভাগে এইরূপ লিখিতছিল।—

প্রাণের বন্ধু!

তুমি ব্যতীত অপরে আমার আজ হৃদয়ের তীব্র বেদনা বুঝিতে পারিবে না! যে শোকে লোক পাগল হয়, যে শোকদুঃখে মানুষের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়, সেই শোক আমি আকাশের দিকে চাহিয়া অকাতরে সহ্য করিতেছি। আমার সেই প্রেমময় স্নেহময় পিতা নিরাশ্রয় দীন দুঃখীকে রক্ষা করিতে গিয়া কালের কঠোর আঘাতে হাসিতে হাসিতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। আজ চারিদিন তিনি পার্থিব সংসার ত্যাগ করিয়া, পরলোকে বাস করিতেছেন, আজ চারিদিন ছিন্ন শুষ্ক লতিকার ন্যায় মা আমার ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন! ভাই! এদৃশ্য যে কি ভয়ঙ্কর হৃদয়-বিদারক তাহা বোধ হয় তোমার অবিদিত নাই? কিন্তু ইহাও আমি সহ্য করিতেছি!

আমি সর্ব্বক্ষণ কেবল ভগবানের নিকট হৃদয়ের বল প্রার্থনা করিতেছি। তিনি যেন আমায় বিনা অশ্রুপাতে বুক পাতিয়া সকলই সহ্য করিবার ক্ষমতা দেন। ভাই! আমি যে পিতাকে হারাইয়াছি, সে ক্ষতির পূরণ এই পার্থিব সংসারে আর হইবে না! এই ভীষণ শোকদুঃখে হৃদয় ধৌত হইয়া যদি ভগবানের করুণা উপলব্ধি করিতে পারি, তবে বুঝিব, সেই অপূরণ স্থানে পিতৃদেবের অমর আত্মার

আশীর্ব্বাদ সিঞ্চিত হইতেছে। আমার পিতা যে মঙ্গল ব্রত জীবনের সার করিয়াছিলেন, সেই ব্রত যদি পালন করিতে পারি, তবে বুঝিব, আমি পিতার পুত্র হইয়া তাঁহার আত্মাকে তৃপ্ত করিতে পারিতেছি। পিতা আমার পর-সেবায়—পরের জীবনরক্ষার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। জানি না, পিতার সেই পুণ্য ব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র জীবন দান করিতে পারিব কি না?

তুমি জান, আমি শোক, দুঃখ, অভাব ও দরিদ্রতাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি। পিতৃ-শোক ও জননীর দুরা-বস্থায় আমার হৃদয়ে যে দাবানলের সৃষ্টি হইয়াছে, জানি না, তাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ কি না? যদি এই প্রজ্ব-লিত ভীষণ শোকানলে আমার হৃদয়ের ক্লেদ ও মলিনতা ভস্ম হইয়া ভগবানের করুণাধারা সিঞ্চিত হয়, তবেই বুঝিব, আমার মানব-জীবন সার্থক।

ভাই! এই দুঃসময়ে আমার একটু উপকার করিবে না? আমার গুরুদেবের সহিত তোমার চাক্ষুষ সাক্ষাৎ না হইলেও তাঁহার অমানুষিক শক্তি ও করুণার কথা সকলই তোমাকে বলিয়াছি এবং তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থানের কথাও তুমি অবগত আছ। তিনি এখন কাশীর সেই নিভৃত যোগাশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। বোধ হয় শীঘ্রই

তিনি হিমালয়ের পথে যাত্রা করিবেন। তিনি দয়াময়, আমি যে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে উপনীত, একথা তিনি অবগত হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার চরণ দর্শন লাভ করিব। এই দুঃসময়ে একবার গুরুদেবের চরণ দর্শন না পাইলে কিছুতেই হৃদয় মন সংযত করিতে পারিতেছি না।

তুমি কালবিলম্ব না করিয়া কাশীধামাভিমুখে রওনা হইও এবং আমার অবস্থার কথা গুরুদেবের চরণে নিবেদন করিও।

পুনশ্চ—পাথেয়াদি যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, কলিকাতা হইতে গ্রহণ করিও। পথে যেন কোন কষ্ট না হয়।

তোমার হতভাগ্য বন্ধু
সুরেন্দ্র।

সুরেন্দ্রনাথের পত্রখানি পাঠ করিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। ভাবিলাম, ধন্য সুরেন্দ্রনাথ! ধন্য তোমার হৃদয়! শোকদুঃখ সহিবার জন্য তুমি যেরূপ ভাবে হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়াছ, সংসারে থাকিয়া এরূপ ভাবে কেহ কখন প্রস্তুত করিতে পারে না। হে কাল! তোমার পদে কোটী কোটী নমস্কার! তোমার বিচিত্র গতি হৃদয়ঙ্গম করা মানবের সাধ্যাতীত। তুমি কখন কাহাকে হাসাইতেছ, কখন কাহাকে কাঁদাইতেছ, কখন পথের

ভিখারিকে রাজ-সিংহাসনে বসাইতেছ, কখন রাজ-চক্রবর্ত্তীকে স্বর্ণ সিংহাসন হইতে উঠাইয়া ভিখারির বেশে রাজপথে বাহির করিতেছ! আজ যিনি ক্রোড়পতি, কাল তিনি উদরান্নের জন্য লালায়িত। আজ যিনি প্রভু, দুইদিন পরে তিনিই আবার ভৃত্যবেশে প্রভুর সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান! আজ যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত, দুইদিন পরে সেই ব্যক্তি অতুল ধনের অধিপতি। আজ যে রমণী পুত্র ক্রোড়ে লইয়া মনের আনন্দে হাসিতেছে, দুইদিন পরে সেই আবার পুত্রশোকে শ্মশানে লুণ্ঠিত হইয়া চিৎকার করিতেছে। কাল সুরেন্দ্র-নাথ হাসিতেছিল, আজ কাঁদিতেছে। সময়ের কথা যদি মানবে বুঝিতে পারিত, সময়ে কখন কাহার কি ঘটিবে মানবে যদি বুঝিতে ও জানিতে পারিত, তবে কাল! তোমার অজ্ঞেয় মহিমায় লোক কম্পিত হইত না। মানব, ধনমদে বা বর্ত্তমান সুখে অধীর হইও না। জান না তুমি, সময়ের আবর্ত্তনে তোমার কি দশা ঘটিবে! তোমার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটী মুদ্রা অসীম কালের এক ফুৎকারে উড়িয়া যাইতে পারে! তোমার ধন, জন, পুত্র, কলত্র কালই কালের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইতে পারে! তোমার রূপ—যে রূপের তুমি গর্ব্ব করিতেছ, কালই কঠিন পীড়ায় কুরূপে পরিণত হইতে পারে। আজ যাহাকে

গর্ব্বভরে ঘৃণা করিতেছ, দুইদিন পরে তাহার অপেক্ষাও তুমি হীন হইতে পার! আজ পুত্র, কলত্রে, ধন জনে, বন্ধু বান্ধবে বেষ্টিত হইয়া আনন্দের হাসি হাসিতেছ, দুই দিন বা দশদিন পরে হয়ত কালের স্রোতে সকলই ভাসিয়া যাইতে পারে! মানব! গর্ব্ব, অহঙ্কার, তেজ, দম্ভ করিবার তোমার কিছুই নাই! জল-বুদ্বুদের ন্যায় সংসারে আসিয়াছ, আবার ক্ষণেক পরে তুমি জলেই মিলাইয়া যাইবে। ভগবান মানবকে রোগ শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য-রূপ করুণা প্রকাশে গর্ব্ব অহঙ্কার ত্যাগ করিতে, হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে সর্ব্বক্ষণ ইঙ্গিত করিতেছেন! অবোধ মানব আমরা, ভগবানের ইঙ্গিত বুঝিতে পারি না, তাই আমরা উৎকৃষ্ট মানব জীবন প্রাপ্ত হইয়া নিকৃষ্ট পশু অপেক্ষাও হেয় কদর্য্য আচরণে হৃদয় মন কলুষিত করিতেছি।

আর চিন্তার সময় নাই! ভাবিলাম, চিন্তার সময় নষ্ট করিয়া কর্ত্তব্যচ্যুত হইতেছি। সেই সৌম্যমূর্ত্তি, সংসারত্যাগী, পরহিতাকাঙ্ক্ষী, আজানুলম্বিত বাহু, মহা-তেজা সন্ন্যাসীর চরণতলে যত শীঘ্র পারি, পৌঁছিতে হইবে। প্রাণ দিয়াও বন্ধুর উপকার করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিব। হায় সুরেন্দ্রনাথ! আমার হৃদয়ের তপ্ত শোণিত দিয়া যদি তোমার হৃদয়ের শোক দুঃখ ধৌত

করিয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার ন্যায় আজ সংসারে আর সুখী কে ?

অনতিবিলম্বে কাশীধামাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ইতিপূর্ব্বে বিশ্বেশ্বর দর্শন অদৃষ্টে কখন ঘটে নাই, পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম, কাশী অতি পবিত্র স্থান। রেল কোম্পানীর ব্যবসা জাল বিস্তারের সঙ্গে, জল নিকাশাভাবে বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর লীলাভূমি হইলেও ম্যালেরিয়া প্রকোপে বঙ্গের নর-নারী অস্থি-কঙ্কালসার হইয়া পালে পালে ঝাঁকে ঝাঁকে কীট-পতঙ্গের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেও দূর-দূরান্তরে অল্প সময়ে যাতায়াতের যে সুবিধা ঘটিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই!

দেখিলাম, পশ্চিম যাত্রীর তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদের লাঞ্ছনা! দরিদ্র বঙ্গবাসীর উপপাতক মহাপাতকের বুঝি সীমা নাই। অর্থ দিয়া এরূপ মহাপাতকের ভোগ বাঙ্গালীর আর কোন স্থলে ঘটে কি না জানি না! হ্যাট-কোটধারী কোন কোন রেলওয়ে কর্ম্মচারী চুরুটের ধূমরাশী উদ্গীরণ করিতে করিতে যাত্রীদিগকে মেষপালের ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে উঠাইয়া দিতেছে! যাত্রীর সুবিধা অসুবিধার দিকে তিলমাত্রও দৃষ্টি নাই! কি সুন্দর কৃতজ্ঞতা! যাহাদের শোনিত সম অর্থে রেল-কর্ম্মচারীগণ

ষ্টেশনরূপ মহারাজ্যে সুখের সিংহাসন লাভ করিয়াছে, নিত্য সহস্র সহস্র যাত্রীরূপ দীন প্রজাগণের উপর আধিপত্য করিতেছে, তাহাদিগকে মেষপাল ব্যতীত তাঁহারা আর কিছুই মনে করিতে পারেন না। জানি না, ইহাদের হৃদয় কোন্ উপাদানে গঠিত!

কাশীর প্রান্তসীমায় ভাগিরথীর পর-পারে এক নিভৃত অরণ্য-রাজীর মধ্যে সন্ন্যাসীর পবিত্র আশ্রম, ইহা আমি সুরেন্দ্রনাথের মুখে শুনিয়াছিলাম। জানি না, কি মহৎ উদ্দেশে তিনি ক্বচিৎ কখন দুই পাঁচ দিন এই আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেন। সন্ন্যাসী লোকালয়ে যাইতেন না, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইত না, দুইচারি জন ভক্ত শিষ্য ব্যতীত তাঁহার আগমন-বার্ত্তাও কেহ অবগত হইত না। সন্ন্যাসী নীরবে আসিতেন, আবার নীরবেই বহুদিনের পরে কোন্ দূর দূরান্তরে চলিয়া যাইতেন। তাঁহার ভক্ত শিষ্যগণও জানিতে পারিত না—মহাতপা সন্ন্যাসী হিমালয়ের কোন নিভৃত গুহায় ভগবৎ আরাধনায়,—ধ্যানযোগে রত আছেন।

কাশীতে অবতরণ করিয়াই আমি সন্ন্যাসীর দর্শন আশায় ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার আশ্রমের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। তিন দিন প্রাণপণ তাঁহার অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু সন্ন্যাসীর আশ্রম বা তাঁহার চরণ দর্শন অদৃষ্টে

ঘটিল না। একদিন অতি প্রত্যুষে হতাশ অন্তরে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। পা আর চলে না, কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; অনাহার, অনিদ্রা ও পথ-পর্যটনে দেহ ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর পবিত্র বারিসিক্ত ঊষার বায়ু হিল্লোলে আমি নব জীবন প্রাপ্ত হইলাম। ক্লান্তি শ্রান্তি দূর হইয়া গেল। ঊষাকালে দশাশ্বমেধ ঘাটের কি সুন্দর দৃশ্য! এ দৃশ্য জীবনে ভুলিতে পারিব না! "হর হর বোম্ বোম্" রবে কাশীবাসিনী বিধবাগণ স্নানান্তে পবিত্র জাহ্নবীবারিপূর্ণ-কমণ্ডলু হস্তে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে যথার্থই মনে হয়, কাশীবাসিনী বিধবাগণ আশা, আকাঙ্ক্ষা, দেহ, মন, সুখ, দুঃখ, ইহকাল, পরকাল সকলই যেন বিশ্বেশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া পার্থিব জীবন তাঁহারই উদ্দেশে বিলাইয়া দিয়াছেন। সংযম-হীন আচারভ্রষ্ট হিন্দুয়ানির দিনে দশাশ্বমেধ ঘাটে এই দৃশ্য দেখিলে হৃদয় মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। ব্রহ্মচর্য্যাপরায়ণা, কাশীবাসিনী বিধবাগণের স্নানান্তে "হর হর বোম্ বোম্" শব্দে আমার হৃদয় সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। একদিন এই হিন্দুর দেশ ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে যে ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, ভগবৎ ভক্তি বিরাজ করিত, আজকাল বুঝি তাহার ক্ষীণ স্মৃতি-

চিহ্নমাত্র এই কাশীধামে বিরাজ করিতেছে। আমাদের পিতৃ-পিতামহের যে গৃহ সর্ব্বদা ওঁকার ধ্বনি ও বেদ গানে মুখরিত হইত, আজকাল বুঝি তাহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতির সময় উচ্চারিত হয়। যে দেশ আমাদের পিতৃপিতামহগণ ধর্ম্মের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়া ছিলেন, যে দেশের উজ্জ্বল আলোকের প্রতি জগতের লোক চাহিয়া থাকিত, সেই দেশে পুণ্যাত্মা পিতৃ-পিতামহগণের পবিত্র গৃহে আমাদের ন্যায় অসংযমী অত্যাচারী হতভাগ্য সন্তানগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া একবারে অন্ধকারে আবৃত করিয়া ফেলিতেছে। যদি শুনিবার মত শ্রবণ থাকে তবে শুন হিন্দু, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময়ে আমাদের পুণ্যাত্মা পূর্ব্ব-পুরুষগণের বেদ গানের ক্ষীণ কণ্ঠের অতি অস্পষ্ট ক্ষীণ প্রতিধ্বনি! যে বেদগান আমাদের ত্যাগী, সংযমী, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, আসক্তিহীন সংসারী, নিঃস্বার্থ হৃদয়, আজানুলম্বিত বাহু, সাত্ত্বিক হৃদয় পূর্ব্ব-পুরুষগণের মুখ-নিঃসৃত হইয়া ধর্ম্মের দেশ ভারতভূমি ধর্ম্মের মহিমায় কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বেদগানের অস্পষ্ট নির্জ্জীব ক্ষীণধ্বনি পূর্ব্ব পুরুষগণের স্মৃতিচিহ্ন বুকে লইয়া বিশ্বেশ্বরের আরতির সময়ে উচ্চারিত হইতেছে। পূর্ব্ব পুরুষগণের এই স্মৃতিচিহ্নটুকুও আর হিন্দুর গৃহে দেখিতে পাই না। বিজন অরণ্যে হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গে

মহাতপা সন্ন্যাসীগণ কেবল তাঁহাদের এই স্মৃতিচিহ্নটুকু বুকে করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। যাও হিন্দু, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতির সময়ে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের বেদ গানের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া হৃদয় পবিত্র ও পুলকিত কর।

কাশী ধামের একদিকে যেরূপ ধর্ম্ম, পুণ্য ও পবিত্রতার অলোকে আলোকিত দেখিয়া হৃদয় মন পবিত্র হইয়া উঠিল, অপরদিকে তদ্রূপ মসীলিপ্ত অংশ দর্শন করিয়া হৃদয় ব্যথিত হইতে লাগিল। দেখিলাম, এই পবিত্র স্থানের অন্যদিকে পুতিগন্ধময় নক্কারজনক স্থান রহিয়াছে। দেখিলে হৃদয় সিহরিয়া উঠে! যে সমস্ত হতভাগিনী কুল-কলঙ্কিনী-গণের স্পর্শে এই পবিত্র স্থান কলঙ্কিত হইতেছে সে চিত্র অঙ্কিত করিতে আর ইচ্ছা নাই। যে পবিত্র স্থানে মহা-প্রাণ পুরুষ ও মহিমাময়ী রমণীগণ সংযম ব্রত অবলম্বন করিয়া যোগ সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই পবিত্র স্থান পাপবিষে দিন দিন জর্জ্জরিত হইয়া উঠি-তেছে! জানি না ভগবান, একি তোমার লীলা! জগ-তের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখি, পাশা পাশি তোমার দুইটি ভাব! একদিকে অন্ধকার, অন্য দিকে আলো। একদিকে অমৃত, অন্যদিকে বিষ। একদিকে করুণা, অন্যদিকে নিষ্ঠুরতা! একদিকে দিবা, অন্যদিকে

রজনী! একদিকে অমাবস্যার ঘোর ঘন ঘটা অন্ধকার, অন্য দিকে ফুল্লজ্যোস্না যামিনী! একদিকে অপরের ধন কেহ অপহরণ করিতেছে, অন্যদিকে নিজের ধন বিলাইয়া দিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছে। একদিকে মহাপ্রাণ ও মহিমাময়ী নরনারী পবিত্র হৃদয় লইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছে, অন্যদিকে কত নরনারী কলঙ্কিত হৃদয় লইয়া পাপ বিষে জর্জ্জরিত হইতেছে!

জানি না মঙ্গলময় বিধাতা, তোমার কি বিচিত্র বিধান! অজ্ঞান আমরা, তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য কি বুঝিব? কেন এ সংসারে আলোক আঁধার সৃজন করিয়াছ, তুমিই তা জান প্রভো! তোমার কোন্ মঙ্গল ইচ্ছা সাধন উদ্দেশে এই জগতের সৃষ্টি তা তুমিই জান? কেন জীবন, কেন মৃত্যু, কেন জন্ম, তাহা কে বুঝিবে? সে যতই পণ্ডিত হউক, তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য বুঝিবার কাহার সাধ্য নাই। তোমাকে বুঝিতে পারে কাহার সাধ্য। তোমার মঙ্গল ইচ্ছা উপলব্ধি করিতে পারে এমন শক্তি কার আছে? তোমার আলোকের নিকট অগ্রসর হইতে পারে এরূপ শক্তি কাহারও নাই। এই জন্যই কেহ বলে, আছ, আবার কেহ বলে, নাই! কেহ বলে, তুমি সব, কেহ বলে, "অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।" আবার কেহ বলে, ও সব কিছুই নয়! মানবের ক্ষুদ্র চিন্তায় যতটুকু

বুঝিতে পারে, ততটুকুই পাগলের ন্যায় বলিয়া যায়। এই জন্যই নানা মুনির নানা মত! তোমাকে দেখিবার মত কেহ দেখিতে পায় না, বুঝিবার মত কেহ বুঝিতে পারে না। দর্শনে তুমি নাই, তর্কের তুমি অতীত, বিজ্ঞানেও তোমায় পাওয়া যায় না। জ্ঞান, ধ্যান, জপ, তপ, পূজা, মন্ত্র, তন্ত্রেরও তুমি অতীত। জগতে তোমার প্রমাণ নাই, তুমি অপ্রমেয়! ভক্তির মধ্যেও তুমি নাই, তুমি ভক্তির অতীত বস্তু। কি করিয়া আমি বুঝিব দয়াময়। সংসারে আমি কেন আসিয়াছি, সুরেন্দ্র কেন আসিয়াছে, কেন এ বিপদ, কেন এ শোক, কেন এ আহ্লাদ? আবার আমরা কোথায় যাইব, কেন যাইব? সংসারের কেন এই কোলাহল? কেন এই মারামারি কাটাকাটি? কেন ধনী দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, ধন-মদে মত্ত হইতেছে, কেন দীন, অন্ধ--পথে পথে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে? মানুষে এ সব গুহ্য তত্ত্ব কখন বুঝিতে পারিবে না! দর্শন, বিজ্ঞান—মানবের অগাধ পণ্ডিত্য চিরদিন পরাজয় স্বীকার করিবে।

জগৎ সংসারের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম, প্রহেলিকাময় নিজ জীবনের কথা আলোচনা করিতে লাগিলাম, মহাপ্রাণ সন্ন্যাসীর কথা হতাশ হৃদয়ে বার বার ভাবিতে লাগিলাম, ক্ষুদ্র জ্ঞানে কিছুই মীমাংসা করিতে

পারিলাম না; হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল! দাখামধ ঘাটের প্রস্তরময় সোপানোপরি অস্থির দেহ লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিলাম! নিদ্রার কুহকিনী মন্ত্রে আমার জ্ঞান-চৈতন্য লোপ পাইল।

কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম, মনে নাই। নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, সুরেন্দ্রনাথের সতী সাধ্বি জননী হাসিতে হাসিতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পতির উদ্দেশে মহা প্রস্থান করিতেছেন! আবার একি! সুরেন্দ্রনাথ বিসূচিকা পীড়ায় আক্রান্ত! জীবনের আশা নাই! আলুলায়িত কুন্তলা, মলিনবেশা, রোরুদ্দমানা একটী যুবতী নির্নিমেষ নয়নে সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। কোমলপ্রাণা যুবতী নিশ্চল, নিস্পন্দ, বাক্‌শক্তি-রহিত। আরও কত কি শোচনীয় দৃশ্য দেখিলাম, মনে নাই। সুরেন্দ্রনাথের অবস্থা দেখিয়া চমকাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম।

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলাম, আমার শিয়রে একজন সন্ন্যাসী! এরূপ প্রশান্ত মূর্ত্তি সন্ন্যাসী অথবা মানবরূপী দেবতা জীবনে কখন দেখি নাই। আর কখন পাপচক্ষে সে মূর্ত্তি অবলোকন করিতে পাইব কি না, তাহাও জানি না। ইনি মানব—প্রকৃতই মানব, কিন্তু এরূপ মানবমূর্ত্তি জীবনে আর কখন দেখিতে পাইব না!

প্রকৃত মনুষ্যত্ব, যাবতীয় উচ্চ বৃত্তিগুলি এই মানব-হৃদয়ে বর্ত্তমান! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ইহাঁর নিকট বশীভূত—সঙ্কুচিত, বুঝি চিহ্নমাত্রও নাই! ক্ষমা, দয়া, করুণা, প্রেম, নিঃস্বার্থতা প্রভৃতি হৃদয়ে প্রস্ফুটিত! পূর্ব্বোক্ত ঋপুগুলির উপর এই সৎবৃত্তিগুলি যেন চিরতরে আসন গাড়িয়া বসিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ঋপুগুলির ক্ষমতা নাই যে, সন্ন্যাসীর হৃদয়কে পরাজিত করিয়া বাহিরে প্রকাশ হয়। এরূপ প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি, এরূপ মৃদু মৃদু হাসি, এরূপ ত্রিকাল-বেত্তা মানবে বুঝি সম্ভবে না! আহা! কি সুন্দর মূর্ত্তি! তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় দেহ! নয়নের কি জ্যোতিঃ! এ জ্যোতির দিকে চাহিতে পারে কাহার সাধ্য! কি দূরদৃষ্টি! সন্ন্যাসী বুঝি বহু যোজন দূরের ঘটনা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন। সন্ন্যাসী জটাজূটধারী! ক্ষুদ্র কৌপিন মাত্র কটীদেশে জড়িত! নয়ন-যুগলে যেন ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে! কিন্তু সে অগ্নির বিন্দুমাত্র দাহিকা-শক্তি নাই! শীতলতায় পূর্ণ, বরফমণ্ডিত! হিমালয়েও বুঝি এত শীতলতা নাই! সন্ন্যাসীর পাদপদ্ম দর্শন করিয়া হৃদয় জুড়াইল, প্রাণ সুশীতল হইল। কুলুকুলুনাদিনী জাহ্নবীর ন্যায় হৃদয়ের ভক্তি উছলিয়া উঠিয়া সন্ন্যাসীর পাদপদ্মে পড়িতে লাগিল! চির বিষাদ, চির অশান্তি, চির দুঃখ যেন হৃদয় হইতে কে

ধুইয়া মুছিয়া লইয়া গেল। প্রাণারাম বিমল আনন্দে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। বাক্‌শক্তিরহিত, চক্ষু স্থির! জগতের ক্ষুদ্র ধূলিকণার ন্যায় সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে পড়িয়া রহিলাম। ভয় যদি সন্ন্যাসী চলিয়া যান! কৃপাময়, আমার হৃদয়ের দেবতা, দাঁড়াও একবার! প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া মানব-জন্ম সার্থক করি! প্রাণপণে একবার উপলব্ধি করি দেব মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি? মানব-জীবন কত মূল্যবান! একবার ভাবিতে দাও দেব! মানব-জীবন কত উচ্চে উঠিতে পারে, মানব জগতের কেন শ্রেষ্ঠ জীব! যাইও না,—যাইও না সন্ন্যাসী, ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া ও রূপ দেখিয়া লই! হৃদয় শীতল হইল, চির বিষাদ, চির অভিশাপ, বুকের প্রজ্জ্বলিত অশান্তি অনল তোমার দর্শনে কোথায় গেল দেব? চাই না—রাজ-অট্টালিকা, চাই না রাজ্য সুখ-ঐশ্বর্য্য, কিছুই চাই না, ধন জন পরিজন কিছুই চাই না! চাই এই শান্তি! চাই—এই সুখ! চাই এই প্রাণারাম আনন্দ! সংসারের লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী স্বর্ণ, মুদ্রা! সে ত ক্ষুদ্র ধূলিকণা। সংসারের ধনৈশ্বর্য্য সে ত অশান্তির কালকূট! পুত্র-কলত্র, সে ত জলবুদ্বুদের ন্যায় ভাসিয়া আসিয়াছে, ডুবিয়া যাইবে! তবে চির সুখ—চির শান্তি কোথায়? মানব! তুমি কি সত্যই মানব? তবে মানবের চির শান্তি কোথা, একবার ভাবিয়াছ কি? কোন্

সুখের ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই, বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, ভাটা নাই, তাহা কি একবার ভাবিয়াছ ?

দাঁড়াও দাঁড়াও সন্ন্যাসী, একবার যদি দেখা দিয়াছ, ভাল করিয়া দেখিতে দাও! বড় জ্বালা দেব! হৃদয়ে আমার বড় জ্বালা! শান্তি! শান্তি! শান্তি! হৃদয় শান্তি পূর্ণ! মন শান্তিময়ের রাজ্যে যেন ডুবিয়া রহিয়াছে! বৃক্ষ তরু লতার স্বন্ স্বন্ শব্দে শান্তিবায়ু বহিতেছে! কুলু কুলু-নাদিনী কুলুকুলু শব্দে শান্তিবারি ছড়াইয়া দিতেছে! আর শান্তিময় তুমি দেব! তোমার হৃদয়ের শান্তিধারা এই ত্রিতাপ তাপিত জনের পাষাণ প্রাণ ধৌত করিয়া দিয়াছে! জগৎ সংসার একদিকে, আর এই সুখ এক দিকে! সন্ন্যাসী, তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি কি চাই ? জগৎ সাম্রাজ্য চাই না, স্বর্গরাজ্য তাহাও অকিঞ্চিৎকর, আমি চাই—এই অক্ষয় অব্যয় প্রাণারাম চির সুখ! মানবের এ সুখ অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় সুখ আর কি আছে দেব ?

বড় ক্ষুধা দেব! প্রাণ যেন সর্ব্বদা কি চায়! কি চায় তা জানি না। সুখী বলে, সুখ পাইনা - আরও সুখ, চায়! আরও সুখ আরও সুখ! ক্ষুধা মেটে না, তৃষ্ণা যায় না! প্রাণ যেন এই পার্থিব সুখের উপরেও আরও কি চায়! কিন্তু কেহ বুঝিতে পারে না, কোথায় সে সুখ! কোথায় সে

চির শান্তির স্বন্ স্বন্ প্রাণারাম বায়ু! প্রাণ সর্ব্বদা কেমন করে! কেন কেমন করে তা জানি না! কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না! প্রাণ চির শান্তির আবাসে যাইতে চায়! শান্তি! শান্তি! শান্তি! প্রাণ জুড়াইয়া গেল! স্থরেন্দ্র কোথায় আছ একবার দেখ ভাই! তোমার গুরুদেবের কৃপায় আমি আজ কি শান্তিরাজ্যে বিচরণ করিতেছি! আবার আকাশ কম্পিত করিয়া, মেদিনী কাঁপাইয়া মধুর প্রাণারাম স্বরে সন্ন্যাসী বলিলেন, শান্তি! শান্তি! শান্তি!

চির জীবনের চির ব্যথা, চির দুঃখ যাতনা সন্ন্যাসীর চরণে জানাইব ভাবিতেছি, পারিতেছি না! কণ্ঠরোধ, বাক্‌শক্তি-রহিত! হায়! হায়! কিছুই বলা হইল না! জীবনের এমন শুভ মুহূর্ত্ত আর পাইব না। কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলাম না! প্রাণ ছট-ফট্ করিতে লাগিল! কথা কহিবার কত চেষ্টা করিলাম, বৃথা প্রয়াস! কথা বাহির হইল না!

সন্ন্যাসী বলিলেন!—আহা, সন্ন্যাসীর কি করুণামাখা স্বর! কর্ণ জুড়াইয়া গেল! এরূপ অমিয় মাখা মধুর স্বর, এরূপ দয়া, স্নেহ করুণামাখা ধ্বনি কখন কাহার কাছে শুনি নাই! এরূপ অন্তরের স্নেহ দয়া করুণামাখা কথা কেহ কখন কাহাকেও বলিতে পারে না, বলিবার শক্তি

নাই, এই দুর্লভ শক্তি যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি মানব নহেন, দেবতা!

সন্ন্যাসী বলিলেন—আহা! কি মৃদু মৃদু করুণামাখা হাসি! বলিলেন—তুমি ব্যাকুলচিত্তে আমার অনুসন্ধান করিতেছিলে, তোমার ব্যাকুলতা, হৃদয়ের এই পবিত্র ভাব থাকিবে কি? না! না! সংসার-কোলাহলে সব ডুবিয়া যাইবে। বাবা! আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না, সুরেন্দ্র আমার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছে, আমি একবার তাহার কাছে চলিলাম। সুরেন্দ্র আমার রুগ্নশয্যায় ছটফট্ করিতেছে! সতী স্বাধ্বী বালিকা শৈল,—আহা! মা আমায় কাতরে বার বার ডাকিতেছে। যাই একবার, ভগবানের কি ইচ্ছা তিনিই জানেন। চলিলাম আমি, তুমিও চলিয়া যাও। সুরেন্দ্র তোমার জন্যও ব্যাকুল, রোগশয্যায় একবার সাক্ষাৎ কর।

আর দেখিতে পাইলাম না! পাগলের ন্যায় চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, কত ডাকিলাম, কত কাঁদিলাম, সেই সন্ন্যাসীরূপী দেবতাকে আর আমি দেখিতে পাইলাম না! আর কেন থাকিব? আর কি আশায় কাশীধামে থাকিব? সকলই যে অন্ধকার! বড়ই যাতনা রহিল দেব যে, আমার প্রাণের যাতনা তোমায় জানাইতে পারিলাম না! না না, তুমি

অন্তর্য্যামি, তুমি আমার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছ। ছুটিলাম, প্রাণপণে ছুটিলাম যদি সুরেন্দ্রর কাছে দেবতাকে দেখিতে পাই। সন্ন্যাসীর সেই দেবোপম পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে ধরিয়া ছুটিতে লাগিলাম। ধন্য সুরেন্দ্রনাথ তুমি—ধন্য তোমার ভক্তি যে এমন গুরু—দেবতা তুমি লাভ করিয়াছ!

আজ হইতে আমার জীবন ভিন্নপথগামী হইল। আমার অবশিষ্ট জীবনের কথা এখন আর বলিতে ইচ্ছা নাই। পুস্তকের কাহিনী এইবার গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বর্ণিত হইবে। আমার জীবনের অবশিষ্ট কথা "মানব-চিত্রের" উপসংহারে পাঠকগণকে শুনাইব।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।
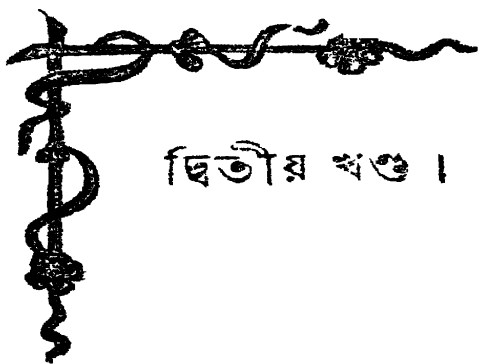
দ্বিতীয় খণ্ড।

মানব-চিত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"শশী বাবু প্রবল জমিদার, পিতার অতুল সম্পত্তির অধিপতি. তাহার সহিত বিবাদ বা শত্রুতা ঘটিলে ফল শুভ হইবে কি ?"

"কি করিব শৈল ? তুমি বুদ্ধিমতী, সকলই ত বুঝিতে পারিতেছ। শত্রুতা বা বিবাদ করা আমার অভিপ্রেত নয়। কয়দিনের জন্য সংসারে থাকিব, কাহার সঙ্গে শত্রুতা করিব ?"

নবীন, তাহার কন্যা সুরবালা এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য আপনি যদি একবার শশী বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে পরস্পরের মঙ্গলামঙ্গল বুঝাইয়া দেন, তাহাতে আমাদের কি মর্য্যাদাহানী ঘটিবে ?"

"মর্য্যাদাহানি না ঘটুক কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইবে না। শশী বাবু এখন যে স্রোতে ভাসিয়াছে, ভগবান না ফিরাইলে তাহাকে বুঝি মানবের ফিরাইবার সাধ্য নাই।"

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর পূর্ণ ৩ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, সুরেন্দ্রনাথের অট্টালিকার পশ্চাতে সুরম্য উদ্যানে বসিয়া সুরেন্দ্রনাথ শৈলবালার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে-ছেন। বৈশাখের অপরাহ্ন। দিবা অবসান প্রায়! প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড দেব জগৎবাসীর গলদ্-ঘর্ম্ম দেহ সান্ত্বনা করিবার জন্য বুঝি দ্রুতগতিতে পশ্চিমগগনে চলিয়া পড়িতেছেন! পবন দেব মার্ত্তণ্ড দেবের অভিলাষ বুঝিয়া মৃদুমন্দ হিল্লোলে জগৎবাসীকে স্নিগ্ধ করিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথের অন্দরের পশ্চাতে এই উদ্যানকে উদ্যান বলিব কি তপোবন বলিব, কি পবিত্রচেতা ঋষি-গণের আশ্রমস্থল বলিব, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ বিচার করিবেন। সুরেন্দ্রনাথের অন্দর সংলগ্ন এই উদ্যানটি সুরেন্দ্রনাথের পিতা প্রস্তুত করিয়া যান, সুরেন্দ্রনাথ ইহাকে পুনঃ সংস্কার করিয়াছেন মাত্র। উদ্যানের চারিদিকে চুাত, দাড়িম্ব, কাঁঠাল, নিচু বেল, গুবাক নারিকেল প্রভৃতি ফলের বৃক্ষ যথাক্রমে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রোপিত। উদ্যানস্থ ভূমি দশ বিঘার ন্যূন হইবে না। উদ্যানের

প্রথম শ্রেণীতে বিল্ব বৃক্ষগুলি এরূপ শ্রেণীবদ্ধভাবে পাশা-পাশি দণ্ডায়মান আছে যে, কোন জীব জন্তুর উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। কোন দস্যুরও সাধ্য নাই যে, বিল্ব বৃক্ষ অতিক্রম করিয়া অন্দরের এই উদ্যানে প্রবেশ করিতে পারে। বৃক্ষরাজীর সম্মুখস্থ ভূমিতে বেল, যুঁই, ঝাঁপি, রজনী গন্ধা, টগর, কামিনী, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পের উদ্যান। পুষ্পোদ্যানের সম্মুখে চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে তুলসী-মঞ্চ। তৎ-সম্মুখে পরিচ্ছন্ন সুপ্রশস্ত রাস্তা! রাস্তার পার্শ্বে সমতল দূর্ব্বাক্ষেত্র, এই দূর্ব্বাদলোপরি সমতল ক্ষেত্রে মৃগশিশুগণ মনের আনন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। হরিণ—শিশুগুলি শৈলবালার বড়ই আদরের সামগ্রী! শৈলবালাকে দেখিলেই মৃগশিশুগণ উর্দ্ধমুখে শৈলবালার পবিত্র মুখের দিকে চাহিয়া স্থিরনেত্রে দণ্ডায়মান হয়। শৈলবালা কোমল হস্তে কাহার গাত্রে হস্ত সঞ্চালন করিয়া, কাহাকেও চুম্বন করিয়া পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন। উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থলে বৃহৎ সরোবর। সরোবরে কাক চক্ষুর ন্যায় জল। জলে রোহিত বর্ণের বৃহদাকার রোহিত, মৃগেল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে এবং মনের আনন্দে রাজহংস ও হংসীগণ ক্রীড়া করিতেছে। পুষ্করিণীর পূর্ব্ব দিক অতি নিভৃত! এই নিভৃত স্থলে একটি পর্ণ-কুটীর। এই

স্থলে কাহার যাইবার আদেশ নাই। উদ্যান-রক্ষক মালী ও বাগানের ভৃত্যগণ সুরেন্দ্রনাথের বিনানুমতিতে কখন এই স্থলে পদার্পণ করিতে পারে না। পুষ্করিণীর দুই দিকে দুইটি বাঁধা ঘাট। কেবল অন্তঃপুরের মহিলারাই এই দুইটি ঘাটে স্নান করিয়া থাকেন। সুরেন্দ্রনাথ ও শৈলবালা এই পর্ণকুটীরে অধিকাংশ সময় যাপন করেন। যখন তাঁহারা ধ্যান নিমীলিত নেত্রে ভগবৎ উপাসনায় রত থাকেন, তখন তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। রমণী ব্যতীত কোন পুরুষ কস্মিনকালে এই উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। শৈলবালা ও সুরেন্দ্রনাথ অধিকাংশ সময়ই এই উদ্যানে ধর্ম্মালোচনায় যাপন করিয়া থাকেন।

শশীভূষণ রায় প্রবল প্রতাপশালী জমিদার। পিতার পরিত্যক্ত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। সুরেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী! শশীভূষণ সুরেন্দ্রনাথ জমিদারকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সুরেন্দ্রনাথ শশিভূষণকে কখন ঘৃণার চক্ষে দেখেন নাই, কিন্তু শশীভূষণের প্রজাগণের প্রতি পাশবিক অত্যাচার দেখিয়া ব্যথিত ও দুঃখিত। শশীভূষণের অত্যাচারে অনেক দীন প্রজা সুরেন্দ্রনাথের জমিদারিতে উঠিয়া আসিয়া রামরাজত্বে বাস করিতেছে। এইজন্য শশীভূষণ সুরেন্দ্রনাথের প্রতি ক্রুদ্ধ, বিরক্ত এবং

সর্ব্বতোভাবে অনিষ্ট-প্রয়াসী। কিন্তু ধর্ম্মবলে বলীয়ান সুরেন্দ্রনাথের এ পর্য্যন্ত শশীভূষণ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শশীভূষণের পিতা একজন ধার্ম্মিক ব্যবহার-জীবী ছিলেন। তিনি এই ব্যবসায় প্রচুর ধন সঞ্চয় ও জমিদারি ইত্যাদি করিয়া যান। শশীভূষণ এই অর্থের সহায়তায় পঙ্কিল বিলাস-স্রোতে গা ভাসাইয়াছেন।

নবীনচন্দ্র দত্ত শশীভূষণের প্রজা। জাতিতে তন্তু-বায়। আজ তিন বৎসর হইল নবীনের পত্নী তাহার একমাত্র কন্যা সুরবালাকে রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছে। সুরবালা বাল-বিধবা, বয়স ষোড়শ বৎসর, কন্যা সুরবালা ব্যতীত নবীনের আর কেহ নাই। সুর-বালা পরমাসুন্দরী, তাহার সুদৃশ্য অঙ্গাবয়বের আলোচনা করিতে বসিয়া কোন রমণীই এ পর্য্যন্ত একটু খুঁত বাহির করিতে পারে নাই। রক্তাভ সুন্দর বর্ণে তাহার অঙ্গের সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়া উছলিয়া উঠিতেছে।

সুরবালার পূর্ণ যৌবন, রূপ ঢল ঢল করিতেছে। প্রতিমার ছবিখানির ন্যায় সুরবালা নবীনের ভগ্ন গৃহ আলো করিয়া থাকিত। নবীনের অতি কষ্টেই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে নবীনের তাঁতের কাপড়ের বড়ই আদর হইয়াছে। পিতা পুত্রীর আনন্দ আর ধরে না, তাহারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ

করিয়া প্রায় দুই শত টাকা জমাইয়া ফেলিয়াছে! পাঠক পাঠিকাগণ ইহাদের একদিনকার কথোপকথন শ্রবণ করিলেই ইহাদের সংসারের ও পিতা পুত্রীর হৃদয়ের পরিচয় পাইবেন।

সুরবালা—বাবা! মায়ের বড়ই সাধ ছিল, তিনি চারি বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজা করিবেন। কিন্তু এমনই আমাদের পোড়া কপাল যে, তখন এক বেলা ব্যতীত দুই বেলা অন্ন জুটিত না। এখন বাবুরা স্বদেশী জিনিষের আদর করায় আমাদের, অন্নাভাব ঘুচিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় হইতেছে। যে টাকাগুলি জমিয়াছে, মায়ের নামে জগদ্ধাত্রী পূজা করাও না বাবা?

নবীন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। নবীন বুঝি এখনও তাহার প্রাণের ধাক্কা সামলাইতে পারিতেছে না। আহা, মূর্খ নবীন বেচারি তাঁত বুনিয়া এই সোনার বঙ্গদেশে দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতে না পারিলেও গৃহিণীকে নিজ তুচ্ছ প্রাণাপেক্ষাও বড় দেখিত। আজ তাহার জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া প্রাণটা উড়িয়া গিয়াছে, কেবল অর্দ্ধাঙ্গিনীর স্মৃতিচিহ্নটুকু সুরবালার মুখের দিকে চাহিয়া নবীন কলের পুত্তলিকার ন্যায় তাঁত বুনে, স্নানাহার করে, নিদ্রা যায়। এসব করিতে হয় বলিয়াই করে, না করিলে

সুরবালা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে বলিয়াই করে, নচেৎ নবীনের জগতে আর কিছু করিবার আছে বলিয়া নবীন মনে করে না। নবীন কেবল ভাবে, এই শোক-জীর্ণ হাড় কয়খানা মাটিতে মিশিয়া গেলেই বাঁচি, সুরবালার জননীকে দেখিতে পাই। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর দ্বিপ্রহর অন্ধকার রজনীতে নবীনচন্দ্র যখন শয্যায় শয়ন করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিত, তখন সুর-বালাও ভিন্ন গৃহে অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে থাকিত। ইহাদের পিতা পুত্রীর এই তপ্তশ্বাস ও অশ্রু অন্তর্য্যামী ভগবান ব্যতীত আর কেহ দেখিতে বা জানিতে পারিত না।

সুরবালার কথায় নবীনচন্দ্রের শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল। নবীনের মনে পড়িল, অন্নাভাবের সেই নিদারুণ কষ্ট! মনে পড়িল, সুরবালা-জননীর রুগ্ন ও মৃত্যু-শয্যা, মনে পড়িল, প্রজ্জ্বলিত চিতানলে সুরবালা-জননীর সোনার কান্তির ভস্মাবশেষ!

নবীনচন্দ্র অতি কষ্টে শোকাবেগ ও অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া কন্যার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রুক্ষ কেশগুলি অঙ্গুলি সঞ্চালনে যথাস্থানে স্থাপিত করিতে করিতে বলিল,—"মা! আমারও তাই ইচ্ছা—তোমার মায়ের নামে একটা কিছু ধর্ম্ম পুণ্য করি। কিন্তু দু'শ টাকায় কি করিয়া

জগদ্ধাত্রী পূজা হইবে মা! চারি বৎসরের পূজায় অন্ততঃ চা'রশ টাকাও ত চাই?"

সুরবালা।—কেন বাবা! আমরা কি তিন বছরে আর দু'শ টাকা খাইয়া পরিয়া জমাইতে পারিব না?

নবীন।—যদি তাঁতের কাপড়ের এইরূপ আদর থাকে, তবে ত জমাইতে পারিব মা! তা না হইলে পুনর্মূষিকো ভবঃ। সেই পূর্ব্বের দৈন্য দুর্দ্দশা আবার ফিরিয়া আসিয়া বঙ্গের তাঁতির ঘরে প্রবেশ করিবে।

সুরবালা।—না বাবা! তা আর হবে না! শৈল মায়ের কাছে শুনেছি, আমাদের দেশের যাঁরা রাজা, তাঁরা তাঁদের দেশের জিনিষ কত আদর ক'রে ব্যবহার করেন। আর আমাদের দেশের বাবুরা কি দেবতার সমান রাজার জাতির অনুকরণ করবেন না? রাজার প্রতি ভক্তি না করলে মহাপাপ হয়। শৈলবালা মায়ের কাছে শুনেছি, রাজা আমাদের দেবতার সমান। দেবতা যেরূপ হিন্দুর পূজার্হ রাজাও সেইরূপ পূজার্হ। শৈলবালা মায়ের কাছে আরও শুনেছি, হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়া রাজাকে সর্ব্বক্ষণ পূজা করতে হয়। তবে রাজা বা রাজার জাতি যাহা করেন, আমাদের দেশের শিক্ষিত বাবুরা তা' না করবেন কেন বাবা? যাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে হয়, তাঁহার সকল আদর্শ ইত গ্রহণ করিতে হয়। তাঁরা দেশের দীন

হীন জাতির প্রতি রাজার জাতির অনুকরণে সমবেদনা প্রকাশ না ক'রে আর কি আমাদের তাঁতের কাপড়ের হতাদর করতে পারেন ?

নবীন।—না মা! সুরেন্দ্র বাবুর মুখে শুনিয়াছি, দেশের শিক্ষিত বা ধনশালী ব্যক্তিদের সমবেদনা নাই! তাঁহারা নিজ নিজ সুখ, ঐশ্বর্য্য ও মান সম্ভ্রম লইয়াই ব্যস্ত! সুরেন্দ্র বাবু সেদিন অতি দুঃখে বলিতেছিলেন, ইঁহাদের হৃদয়ের ভাব "চাচা আপনা বাঁচা।"

সুরবালা।—না বাবা! আমি শৈল মায়ের মুখে যা শুনেছি, সে কথা তোমার সঙ্গে মিলে না।

পিতা পুত্রীর এবম্প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় শশী বাবুর প্রধান পাইক আসিয়া গৃহদ্বারে সাড়া দিল, "দত্তের পো ঘরে আছ?" পাইকের বজ্রনাদ শ্রবণ করিয়া সুরবালা কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। নবীন সশঙ্কিত হৃদয়ে ম্লানমুখে অগ্রসর হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দুই তিনবার ঢোক গিলিয়া বলিল, "বাঘের পো এসেছ—বস বাবা!" কম্পিত হস্তে নবীন একখানি শতছিদ্র কম্বল বিছাইয়া দিল।

"বাঘের পো" শশীভূষণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলবান পাইক। নাম কেনারাম সর্দ্দার, জাতিতে ডোম। কয়েকটি দাঙ্গা

জিতিয়া জমিদার-সংসারে কেনারাম "বাঘ" উপাধি লাভ করিয়াছে। কেনারাম সর্দ্দার একা তাহার সুদীর্ঘ বংশ-যষ্টির সাহায্যে শত শত প্রতাপশালী লঠিয়ালকে পরাস্ত করিয়াছে। শশী বাবুর বড় বড় ভোজপুরি দ্বারবানগণও কেনারামকে ওস্তাদজি বলিয়া সেলাম করে। এ হেন বাঘের পো গরিব নবীনের গৃহে সশরীরে উপস্থিত। গরিব নবীনের যে অন্তরাত্মা উড়িয়া যাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

"হুজুরের তলব!" ব্যাঘ্র মহাশয় সুদীর্ঘ গুল্ফ দুইটি অঙ্গুলি সাহায্যে একবার পাক লাগাইয়া বজ্র-গম্ভিরস্বরে আদেশ করিল, 'হুজুরের তলব!' নবীন দত্ত আমৃতা আমৃতা করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কথা আর বাহির হইল না। যে গৃহে অনাথিনী বিধবা সুরবালা কদলি-বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত-কলেবরে দাঁড়াইয়াছিল, নবীন সেই দিকে একবার চাহিল, আকাশের দিকে চাহিল, বাঘের মুখের দিকে বার বার চাহিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিল। ব্যাঘ্র মহাশয়ের আবার হুঙ্কারধ্বনি! "চলে এস?" নবীন সুরবালাকে কিছু বলিবার অবসর পাইল না, ব্যাঘ্রের পশ্চাতে দুর্ব্বল বৃদ্ধমেষের ন্যায় চলিতে লাগিল। নবীনের বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছে, বক্ষে জলধারা!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শশীভূষণ রায় জমিদার মহাশয় তাঁহার সখের বাগান-বাটিতে বসিয়া আছেন। উদ্যানটি দীর্ঘে প্রস্থে আট বিঘার কম হইবে না। আম্র, কাঁটাল, জাম, পেয়ারা, লিচু প্রভৃতি বৃক্ষে উদ্যানটি শোভা পাইতেছে। চারিদিকে নানাবিধ ফুলের গাছ, মধ্যস্থলে একটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর উত্তর দিকে একটি সুন্দর বাংলা। বাংলার সম্মুখে কতকগুলি বিলাতি কুকুর বাঁধা আছে। বাংলাটি অতি বৃহৎ, এবং বিলাতি-ধরণে সুসজ্জিত। নানাবিধ লজ্জাকর-জনক উলঙ্গ বিলাতি ছবিতে গৃহখানি পূর্ণ। ইহা ব্যতীত চেয়ার, টেবল সোফা, গদি, পালং দেরাজ, আলমারিতে বাংলাখানির শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। লালরংবিশিষ্ট তার-জড়ান কয়েকটি বিলাতি বোতলে পশ্চিম দিকের আলমারিটির শোভা যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের উদ্যান-বাটীর সহিত এই উদ্যা-নের তুলনা করিলে স্বর্গের সহিত নরকের তুলনা করা

হয়। সুতরাং আমরা তুলনা বা বর্ণনা করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। তবে এইটুকু বলিয়া রাখি যে, দুর্গন্ধময় পঙ্কিল স্রোতে ভাসিবার যাহা কিছু আবশ্যক, এই উদ্যানে তাহার কিছুরই অভাব নাই।

দশবার জন ইয়ার ও মোসাহেবে পরিবেষ্টিত হইয়া শশীভূষণ পালঙ্কের উপর বসিয়া আছেন। বাহিরে কয়েক জন দ্বারবান ও ভৃত্য প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়-মান। বাংলার পশ্চাতে রন্ধনশালায় মহা সমারোহে মাংসাদি রন্ধন চলিতেছে; মোসাহেববর্গ এক একবার পরিদর্শন করিয়া আসিতেছেন। বাবু উৎকণ্ঠিত ভাবে একজন ইয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ হে! বাঘ-বেটা এখনও যে ফিরিল না?"

"হয়ত তাঁতিবেটা বাড়ীতে নাই। আর একজনকে পাঠাব না কি?"

বাবু।—মাইরি ভাই, তোরা যা বলেছিস্ ঠিক! এমন সুন্দরী যুবতী যে আমার জমিদারিতে আছে, তা জান্‌তুম না!

১ই।—হাঁ হাঁ মাইডিয়ার, মনে কোরো না যে, কেবল তোমার অন্ন ধ্বংস কচ্চি, তোমার জন্য কতদিকে কত সন্ধানে ফিরি বাবা, তা কি জান না?

মোসাহেব।—বেটা তাঁতিকে এখানে আনিয়া ফল

কি, তা ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! বেটার তাঁত বুনে পেটের অন্ন জোটে না, তার পরম ভাগ্য যে, আমাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ জমিদার বাবুর সুনজর তার উপর পড়েছে। মিছে সময় নষ্ট, বাবুও উৎকণ্ঠিত হচ্চেন, একবারে মেয়েটাকে শুদ্ধ আস্‌বার হুকুম কর্‌লেই চুকে যেত লেঠা!

২ই।—না হে না! সেটা ঠিক নয়! ওর বাপ্‌ যদি রাজী হয়, তার চেয়ে সুবিধা আর নাই! টানা হেঁচ্‌ড়ায় লোক জানা জানি, সেটার দরকার কি বাপু?

বাবু।—তা' ত ঠিক কথা। গোলযোগ না করাই ভাল।

মো। তা বটেই ত! বটেই ত! এ সব কাজে কি গোলযোগ কর্‌তে আছে?

ঠিক এই সময়ে বাঘ মহাশয় নবীনকে আনিয়া হুজুরে হাজির করিয়া দিল। নবীন কম্পিত-কলেবরে ভূমে লুণ্ঠিত হইয়া বাবুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। লোহিত বর্ণ আঁখিযুগল নবীনের মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া, হাই তুলিতে তুলিতে জমিদার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে নবীন, ভাল আছত?" নবীন আবার একবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দুইবার ঢোক গিলিয়া বলিল,—"আজ্ঞে, হুজুর যেমন রেখেছেন।"

জমিদার বাবুর বিলম্ব সহিতে ছিল না, পার্শ্বের মোসাহেবকে বক্তব্য প্রকাশের জন্য ইঙ্গিত করিলেন। সে কথা লিখিয়া পুস্তক কলঙ্কিত করিতে আর ইচ্ছা নাই। জমিদারের আদেশবাণী শ্রবণ করিয়া নবীন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। একজন দ্বারবান মুখে জল দিয়া ও পাখার বাতাস করিয়া নবীনের চৈতন্য সম্পাদন করিল। শেষ নবীনের উপর হুকুম জারি হইল, "অদ্য রজনী একপ্রহরের মধ্যে সুরবালাকে বাগান-বাটিতে হাজির করিয়া না দিলে বাঘ যাইয়া তাহাকে শূন্যে উঠাইয়া লইয়া আসিবে এবং পরদিন গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া নবীনকে জমিদারী হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইবে।"

নবীন কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে আসিয়া গৃহিণীর জন্য উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। নবীনের বিশ্বাস, সুরবালার জননী জীবিত থাকিলে এরূপ বিপদ ঘটিত না। সে গৃহের লক্ষ্মী ছিল, লক্ষ্মীছাড়া হইয়াই তাহার এই বিপদ ঘটিতেছে। নবীন পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিল। গৃহিণীর সেই মুখখানি মনে পড়ায় নবীনের শোকাবেগ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল; নবীন আরও উচ্চৈঃস্বরে ভূমে লুণ্ঠিত হইয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

সুরবালা উৎকণ্ঠিত চিত্তে পিতার আগমন অপেক্ষায় একদৃষ্টে পথের পানে চাহিয়াছিল। এক্ষণে পিতাকে

ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া নবীনের গলা জড়াইয়া নিজেও ক্রন্দন করিতে লাগিল। হায় হায়! সুরবালার পিতা ব্যতীত, পিতার সুরবালা ব্যতীত জগতে যে আর কেহ নাই!

এদিকে সন্ধ্যাদেবী ক্রন্দনের অপেক্ষা না করিয়া পৃথিবীতে পদার্পণ করিলেন। সন্ধ্যাগমে পুরনারীগণ শঙ্খ-ধ্বনি করিয়া সন্ধ্যা দেবীর আগমন-বার্ত্তা অন্তঃপুরে প্রচার করিতে লাগিল। নবীনের এতক্ষণে চমক ভাঙ্গিল। পিশাচের পৈশাচিক রব বারবার কর্ণে প্রতিধ্বনিত করিয়া নবীনকে বলিতে লাগিল, "রজনী একপ্রহর পর্য্যন্ত সময়।" নবীন ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া পাগলের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল, একবার উঠিতে উঠিতে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। আবার উঠিল, আবার পড়িয়া গেল। আবার নবীনের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, "রজনী একপ্রহর পর্য্যন্ত সময়।"

সুরবালা পিতাকে ক্রন্দন সম্বরণ করিতে দেখিয়া নিজেও একটু প্রকৃতিস্থ হইল। সুরবালা নবীনকে রুদ্ধকণ্ঠে অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, এমন সময় নবীন সুরবালার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"সুর, মা আমার! তোকে বুকে ক'রে কোথায় পালাই মা! তোর মা গেল,

আমিও কেন তার সঙ্গে গেলাম না, তাহলে আমাকে আজ এ বিপদে পড়িতে হইত না! হা ভগবান! তুমি কি নাই! গরিবের উপর প্রবলের অত্যাচার কি চারিযুগই সমভাবে থাকিবে।"

নবীনের কথায় সুরবালা পিতার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পিতার দুঃখ ক্রন্দনের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা! অমন করিতেছ কেন? জমিদার বাবুর চরণে আমরাত কোনই অপরাধ করি নাই! তবে পাইক আসিয়া কেন তোমাকে ধরিয়া লইয়া গেল বাবা?

কন্যার প্রশ্নে নবীন কি একপ্রকার হইয়া গেল। ক্রোধে, ঘৃণায়, লজ্জায় মস্তকের অর্দ্ধপক্ক কেশগুলি টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গে দরদরধারায় স্বেদ নির্গত হইয়া চক্ষু দুটি দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল। সুরবালার নিকট হইতে কয়েক হস্ত পিছাইয়া গিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "কি বলিব মা! এ কথা তোকে শুনাইবার আগে আমার প্রাণটা বাহির হইল না কেন? যে ভীষণ হৃদয়-দগ্ধকারী কথা পিতা হইয়া কন্যার কাছে বলিতে পারে না, যে পাপ কথা পিশাচেও পিতার কাছে বলিতে কুণ্ঠিত হয়, যে পাপ কথা

শুনিলে হয় মারিয়া, নয় মারিয়াও হৃদয়ের জ্বালা দূর হয় না, আজ আমাদের পাষণ্ড জমিদার কেবল তাহাই বলিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, যদি তার আজ্ঞামত কাজ না করি, তবে রজনী দশ ঘটিকার পর তোকে জোর করিয়া সেই প্রেতালয় সদৃশ বাগানে ধরিয়া—

নবীন আর কিছু বলিতে পারিল না; সেইখানেই আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মাতৃহীনা অনাথা সুরবালা সকলই বুঝিল। এককালে শত সহস্র বৃশ্চিক আসিয়া যেন তাহার হৃদয় দংশন করিতে লাগিল। পরক্ষণে পিতার চৈতন্যহীন দেহ নয়ন সমক্ষে পতিত হইল। মনে মনে বলিল, "শৈল মা! তোমার কাছে শুনিয়াছি, যতদিন জগৎ ও চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন ধর্ম্ম ও ভগবান লোকচক্ষুর অন্তরালে জগতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবেন। 'ভগবান ও ধর্ম্ম কি এই অনাথিনী মাতৃহীনাকে রক্ষা করিবেন না? আর এই পাপস্থানে তিলার্দ্ধও থাকিব না, একবার শৈলমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যে দেশে প্রবলের অত্যাচার নাই, দীনের প্রতি পীড়ন নাই, অনাথিনী মাতৃহীনা বিধবার উপর পাষণ্ড জমিদারের লোলুপদৃষ্টি নাই, সেই দেশে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া পিতা পুত্রিতে জীবন ধারণ করিব। জগতে এরূপ স্থান যদি না পাই, তবে লোকালয় ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিব।"

পিতা-পুত্রীতে সেই অবস্থাতেই গৃহের বাহির হইল। যাইবার সময় তাহাদের বহুকষ্টার্জ্জিত সঞ্চিত অর্থগুলিও লইতে অবসর পাইল না। তাঁতের নিম্নে মৃত্তিকা-গর্ভে সেগুলি সযত্নে লুক্কাইত ছিল। পাছে সেগুলি উত্তোলন করিতে অধিক রাত্রি হইয়া যায়, পাছে জমিদারের পাইক আসিয়া চির জীবনের মত সর্ব্বনাশ সাধন করে, সেই ভয়ে সে ধনের দিকে আর ফিরিয়াও চাহিল না।

এই গ্রাম হইতে সুরেন্দ্রনাথের স্বগ্রাম জমিদারি সোজা পথে প্রায় এক ক্রোশ। পাছে তাহারা জমিদারের কোন লোকজনের নজরে পড়ে, এইজন্য পিতাপুত্রীতে গ্রাম্যপথ ত্যাগ করিয়া মাঠের উপর দিয়া ছুটিতে লাগিল। সুরবালার তাঁতের সাড়ী হইলেই. তাহা শৈলবালার কাছে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইত। শৈলবালা প্রথম প্রথম উচিত মূল্য দিয়া সুরবালার নিকট কাপড় ক্রয় করিত। যাতায়াত জন্য শৈলবালা সুরবালাকে দিন দিন স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। শৈলবালা—সুরবালা অপেক্ষা দুই এক বৎসরের বড় হইলেও সুরবালা জমিদার গৃহিণীর সম্মানার্থে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিত। একদিন শৈলবালা সুরবালাকে বলিল,—"তুই আমাকে শুধু মা বলিস্ কেন, শৈল মা বলিস্।" এই দিন হইতে সুরবালা শৈলকে কখন 'মা" কখন "শৈল মা" বলিয়া ডাকিত।

সুরবালার গুণে শৈল এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহাকে কন্যা বা ভগ্নি অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিত! গরিব কন্যা, অনাথিনী মাতৃহীনা, এজন্যও শৈলবালার কোমল হৃদয় তাহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিল।

রজনী দেড় প্রহর অতীত। শৈলবালা ও সুরেন্দ্রনাথ এইমাত্র তাঁহাদের উদ্যান কুটীর হইতে ঈশ্বরোপাসনা সমাপন করিয়া শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। পরিচারিকা আসিয়া ফল-দুগ্ধাদি যথাস্থানে রাখিয়া চলিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথের পিতা ৺নটবর বসু মহাশয় রাত্রে দুগ্ধ ও ফলাদি ব্যতীত অন্য কিছুই আহার করিতেন না। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র জমিদার সুরেন্দ্রনাথ বসুও সহস্র রাজভোগ ত্যাগ করিয়া উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য হইবার আশায় রাজর্ষির ন্যায় সংসারে সন্ন্যাসী হইয়া হৃদয় মন প্রস্তুত করিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথ আহারে বসিলেন, শৈলবালা কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিল। সংসারাশ্রমের নানাবিধ উচ্চ অংশের কথা-বার্ত্তা কহিতে কহিতে সুরেন্দ্রনাথ আহার শেষ করিলেন। স্বামীর ভোজন-পাত্রে ভুক্তাবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল শৈলবালা আহার করিল।

সুরেন্দ্রনাথের এই শয়ন-গৃহখানি দেব-মন্দিরের ন্যায়। গৃহখানিতে প্রবেশ করিয়াই মনে সাত্ত্বিক ভাবের

উদয় হয়। দেওয়ালে চারিদিকে বড় বড় নানাবিধ দেব-দেবীর ছবি। ছবিগুলি এরূপভাবে প্রস্তুত যে, দেখিলে অতি পাষণ্ডেরও মনে ভক্তির উদয় হয়। সুগন্ধি-তৈলপূর্ণ দুইটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, ধূপ, ধুনা ও গুগ্‌গুলের গন্ধে গৃহখানি আমোদিত। নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধে গৃহখানি স্বর্গীয়ভাবে ভোর হইয়া আছে। গীতা, ভাগবৎ, পাতঞ্জল, সংহিতা প্রভৃতি রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ গৃহখানিতে স্তরে স্তরে সাজান। উচ্চ অঙ্গের বাঁধান ইংরাজী পুস্তক-গুলিতে পশ্চিমদিকের আলমারিটী পূর্ণ। সুরেন্দ্রনাথের জনক-জননী ও পূজ্যপাদ গুরুদেবের তিনখানি বৃহদাকার ফটো সুরেন্দ্রনাথের মস্তকদেশে অতি যত্নে রক্ষিত। দেখিলেই মনে হয়, এই তিনখানি চিত্রকে যেন হৃদয়ের ভক্তির সহিত অহোরাত্র পূজা করা হইয়া থাকে। সুরেন্দ্রনাথের উদ্যানের নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য সুগন্ধি পুষ্প এই ফটো চিত্রের পাদদেশে রক্ষিত হইয়াছে, তাহারই গন্ধে গৃহখানি স্বর্গের নন্দন-কাননের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। শৈলবালার অতি আদরের কয়েকটি মৃগশিশু ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। গৃহের অপরদিকে একটি অনতি দীর্ঘ পালঙ্ক, পালঙ্কোপরি অতি সামান্য ভাবের শুভ্র শয্যা বিস্তৃত। শয্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহাতে যে কেহ শয়ন করে এরূপ বোধ হয় না। নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ

ও ধর্ম্মতত্ত্ব পাঠালোচনাতেই সুরেন্দ্রনাথ ও শৈলবালার রজনী অতিবাহিত হইয়া যায়। শৈলবালার পিতা একমাত্র কন্যাকে যে সুশিক্ষিতা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহার সে প্রয়াস সার্থক হইয়াছে। শৈলবালার সংস্কৃত শাস্ত্রে বুৎপত্তি সুরেন্দ্রনাথের অপেক্ষা অধিক। ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষার ভার শৈলবালার পিতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পিতার আন্তরিক যত্ন ব্যর্থ হইতে পারে না।

আহারান্তে একখানি কুশাসন বিস্তৃত করিয়া শৈলবালা গীতা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন, সুরেন্দ্রনাথ একাগ্রচিত্তে শৈলবালার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্যগুলি পর্য্যালোচনা করিতে করিতে তন্ময় চিত্ত হইয়া যাইতেছেন। রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত, দম্পতি-যুগল বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া ভক্তি-রাজ্যে ডুবিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় একজন পরিচারিকা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—"মা! যে তোমাকে কাপড় দিয়া যায়, সেই স্বরো নিম্নতলে আসিয়া কেবল কাঁদিতেছে। সে একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়।"

শৈলবালা পরিচারিকার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এত রাত্রে সেত কখন

আসে না, তার বাপের বুঝি কিছু অসুখ বিসুখ হইয়া থাকিবে?"

"তাইত মা, আশ্চর্য্য! সোমত্ত বয়েস, এত রাত্রে কি ক'রে ঘরের বাহির হইল? মেয়ের কি বুকের পাটা! আমিতো দেখেই "

শৈলবালা বিরক্তি স্বরে বাধা দিয়া বলিলেন,—"যাও, তাকে এই খানে লইয়া এস।"

পরিচারিকা চলিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ শৈলবালার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সুরো শৈলবালা?"

শৈলবালা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কি সুরবালাকে দেখেন নাই! সেই—গ্রামের নবীনের বিধবা কন্যা! মেয়েটীর হৃদয় বড়ই নির্ম্মল। পাপ, চাতুরী, হিংসা কুটিলতার ছায়া মাত্রও সেই হৃদয়-খানিকে কখন স্পর্শ করে নাই! কাপড়ের দাম তাহার পিতার অভাব দেখিয়া কখন চারি টাকা দিই, কখন পাঁচ টাকা দিই কিন্তু চারি টাকার বেশী কিছুতেই লইতে চায় না। কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া যখন বলি, তোর কাপড় আর কখন লইব না, আমার কথা না শুনিলে তোর মুখও আমি আর কখন দেখিব না, তখন কাঁদকাঁদমুখে টাকা কয়টী হাত পাতিয়া লয়, ভয়ে

আর কোন কথা বলিতে পারে না! কিন্তু আমি তার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখি, সেই টাকাটি তাহার কোমল হৃদয়খানিতে যেন কত বেদনা প্রদান করিতেছে। আমি তাহার হাত ধরিয়া যখন বলি, "সুরবালা! এই টাকাটি লইয়া যা, আবার যখন কাপড় আনিবি, তখন এক টাকা কম দিব, তখন সুরবালার অধরপ্রান্তে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে।

সুরেন্দ্র।—তুমি নিত্য এত কাপড় লইয়া কি কর শৈলবালা?

শৈল।—কেন, মানুষের কাপড়ে কি দরকার নাই?

সুরেন্দ্র।—মানুষের থাকিতে পারে, তোমাকে ত কোন দিন ভাল কাপড় পরিতে দেখি নাই!

শৈল।—আমার ভাল কাপড় পরিতে ইচ্ছা হয় না! যাহাদের একটু ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের জন্য লজ্জা নিবারণ হইতেছে না, তাহাদিগকে সুরবালার হাতের কাপড়গুলি দিয়া নিজে পরাপেক্ষা আমি অধিক সুখানুভব করি।

সুরেন্দ্রনাথের মুখ আনন্দে প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। সুরেন্দ্রনাথ আদর করিয়া শৈলবালাকে কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, সুরবালা সঙ্কুচিভাবে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান। শৈলবালা তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে গৃহে টানিয়া আনিল।

"একি সুরবালা! তোর মুখ এমন বিবর্ণ কেন? তুই কাঁদছিস কেন?" শৈলবালা নিজ কষায় বস্ত্রের অঞ্চলাগ্র-ভাগ দিয়া সুরবালার অশ্রুবারি মুছাইয়া দিতে লাগিল।

শৈলবালা ক্রন্দনের কারণ বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর পাইল না। ভাবিল, জমিদার বাবুর সম্মুখে সুর কোন কথা বলিতে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হই-তেছে, শৈল ইঙ্গিত করিবার পূর্ব্বেই সুরেন্দ্রনাথ বহি-র্বাটিতে চলিয়া গেলেন।

শৈলবালা অল্প চেষ্টাতেই সুরবালার নিকট হইতে সকল কথা বাহির করিয়া লইয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। মনে মনে বলিলেন, হে ভগবান! মানুষকে যখন আপনার মঙ্গল ইচ্ছার বশে কুবৃত্তিগুলি দিয়াছেন, তখন কুবৃত্তিগুলিকে সংযম করিবার ক্ষমতা সকলকে দেন নাই কেন?

এদিকে সুরেন্দ্রনাথ বাহিরে যাইবামাত্র নবীন সুরেন্দ্র-নাথের পায়ে পড়িয়া চিৎকার করিতে লাগিল। সুরেন্দ্র-নাথ অতি কষ্টে নবীনকে সান্ত্বনা করিয়া, শশীভূষণ জমি-দারের পাপ-কাহিনী শুনিতে শুনিতে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ ক্রোধ [illegible] লোচনে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আর ব[illegible] হইবে না নবীন, সকলই

বুঝিয়াছি। ধন-বল, লোক-বল, সুখ-সৌভাগ্য ও স্বাস্থ্য মানুষের হাতে আসিলে মানুষ পশুরও অধম হইয়া পড়ে। শশীভূষণও তাহাই হইয়াছে। মানুষ ভাবে না, এ সব কি? কোথা হইতে সে আসিয়াছে? কয়দিন থাকিবে? কি কার্য্যে এই সকল শক্তিকে নিয়োজিত করিলে মানব-জীবনের সদ্ব্যবহার হইয়া চিরশক্তি লাভ হইবে? আত্ম-ঘাতী হওয়া মহাপাপ, কেন সে পথে পদার্পণ করিতে চাহিতেছ নবীন? শোক দুঃখ ত্যাগ কর। ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাক, তিনিই কেবল নর-নারীর গুপ্ত অন্তর দেখিতে পান। তিনিই অত্যাচারির কবল হইতে তোমার বিধবা কন্যাকে রক্ষা করিবেন। তোমার বিধবা কন্যা আমার জননী-স্বরূপা, মা আজ পুত্রের আশ্রিতা! যতক্ষণ আমার স্বর্গীয় পিতা মাতার পবিত্র-রক্ত এই দেহে বিন্দু-মাত্রও প্রবাহিত থাকিবে, যতক্ষণ গুরুদেবের চরণ স্মৃতি-পথে জাগরুক থাকিবে, ততক্ষণ আমার মাকে স্পর্শ করিতে পারে কাহার সাধ্য! আমার দেহের শেষ রক্ত-বিন্দু শীতল হইবার পূর্ব্বে যদি কেহ জননীকে আমার স্পর্শ করিতে পারে, বুঝিব, আমার প্রেমময় পিতা, স্নেহ-ময়ী জননী, জ্ঞান ও ভক্তিময় গুরুর হৃদয়-নিঃসৃত আশীর্ব্বাদ হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছি।"

ঠিক এই সময়ে দ্বিতলে সুরেন্দ্রনাথের প্রকোষ্ঠে

শৈলবালা সুরবালাকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া বসনাগ্রে তাহার অশ্রুজল মুছাইতে মুছাইতে বলিতেছিলেন, "সুরবালা! তুই আবার কাঁদ্‌চিস্? তবে তুই যেখানে খুসী যা, তোর মুখ আমি আর কখন দেখিব না!" শৈলবালা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশের সঙ্গে বার বার নয়নাশ্রু মুছিতেছিলেন। সুরবালা সে পবিত্র অশ্রু একবারও দেখিতে পায় নাই। শৈলবালার নয়ন-যুগল দিয়া এবার কি এক দিব্যজ্যোতি বাহির হইতে লাগিল। আলোকময় গৃহ সেই জ্যোতিতে কি এক দিব্যভাব ধারণ করিল। এ দিব্য-ভাবের বর্ণনা ভাষায় স্ফুটিত হইতে পারে না। শৈলবালার মুখের দিকে চাহিতে চক্ষু যেন ঝলসিয়া যাইতেছে! কি এক অপার্থিব আনন্দে হৃদয় যেন ভরিয়া উঠিতেছে! শৈলবালার কপোলদেশে স্বেদবিন্দু! যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম গঙ্গাজলে সিক্ত হইয়া ভগবানের চরণোদ্দেশে ধাবিত হইতেছে! আহা! হিন্দুকুল-ললনা শৈলবালা তুমিই প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, পরোপকারিতা, সতীত্ব ধর্ম্ম ও ভগবৎ বিশ্বাস আয়ত্ত করিতে পারিয়াছ! ধন্য তুমি শৈলবালা!

শৈলবালার কৃত্রিম ক্রোধ দূর হইয়া গেল। শৈলবালা বলিতে লাগিলেন,—"সুর! তুই কি জানিস্ না, ঐ ঊর্দ্ধে কে একজন রহিয়াছেন! কে তা জানি না সুর!

কিন্তু জানি, একজন আছেন! জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে, অতল সাগরের তলে, উর্ম্মিমালায়, চন্দ্রে, সূর্য্যে, তারকায়, বিজন কান্তারে, হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে, ধ্যানরত নিমীলিতনেত্র যোগীগণের হৃদয়ে গিরিগুহায়, পাপী-তাপীর হৃদয়ে, তোমার আমার অন্তরে, আর সেই পাষণ্ড কামুক শশীভূষণেরও অতি নিকটে তিনি রহিয়াছেন। সুর! তোমার আমার ব্যাকুল ক্রন্দন কি ব্যর্থ হইবে? তিনি কি দেখিবেন না? হ'ক্ না সে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী, হ'ক্ না সে ধন-বলে লোক-বলে অদ্বিতীয়! হ'ক্ না সে অর্দ্ধভূখণ্ডের অধীশ্বর! তা বলিয়া সে দুর্ব্বলা অনাথার উপর অত্যাচার করিবে? জগতের সম্রাট, জগৎবাসীর অধীশ্বর, ধর্ম্ম অধর্ম্মের বিচারকর্ত্তা কি নিদ্রিত? যেদিন সংসারে পাপ পুণ্যের বিচার না থাকিবে, যেদিন পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার তাঁহার রাজ্য হইতে উঠিয়া যাইবে, সেদিন জগৎ ধূলিস্যাৎ হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে। কি করিতে পারে সে ক্ষুদ্র নরাধম শশীভূষণ! সুর! তোর হৃদয়ে যে শক্তি আছে, তাহার তা নাই! জগৎময় শশীভূষণ হউক,—জগতের সকল শক্তি তোর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হউক, লক্ষ লক্ষ শশীভূষণ এই মুহূর্ত্তে তোর সতীত্বধর্ম্ম হরণ করিতে অগ্রসর হউক, যদি আমার বিশ্বাস থাকে, এখনও ধর্ম্ম আছে, এখনও পাপপুণ্য বলিয়া

দুটি পৃথক জিনিষ আছে, আর সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অনাদি অপ্রমেয় ভগবান চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তবে সুর, তাঁর রাজ্যের একটি ধূলিকণার সহস্রাংশের এক অংশ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এই শৈলবালা একা তোকে রক্ষা করিবে। দেখি, কাহার সাধ্য হিন্দু-কুল-ললনার কৌস্তুভ-মণি সদৃশ সতীত্বধন তোর হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতে পারে!

পরক্ষণে শৈলবালার মুখে আবার হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। শৈলবালা কি বহুরূপী? গৃহের যেস্থলে বহুমূল্যবান স্বর্ণ খচিত হারমোনিয়ম রজত আধারে বহুমূল্য মখমল বেষ্টিত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল, শৈলবালা সুরবালাকে সেই স্থলে টানিয়া লইয়া গেলেন। হারমোনিয়ম সুমধুর প্রাণারাম সুরে ঝঙ্কার দিয়া মাতিয়া উঠিল। হারমোনিয়মটা শৈলবালার সুকোমল, পবিত্র করস্পর্শাভাবে যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল, পবিত্র করস্পর্শে নব জীবন লাভ করিয়া নব উদ্যমে নব সুরে নিথর নিস্তব্ধ যামিনীকে যেন নব প্রেম ভক্তিতে মাতাইয়া তুলিল।

সুরবালা গাহিতে লাগিল, আহা, কি অমিয়মাখা স্বর! কি প্রেম-ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস!—কি সুর-তান-লয়ের সুধামণ্ডিত" তরঙ্গ!—নিথর নিস্তব্ধ রজনীর অসীম আঁধার সাগরে ভাসিতে ভাসিতে শৈলবালার কণ্ঠ-

নিঃসৃত প্রেম-ভক্তি-পূর্ণ সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলি যেন বিশ্বপাতার চরণ উদ্দেশে পার্থিব সংসারের দেশদেশান্তর ছাড়িয়া ছুটিতে লাগিল।

কোথা ওহে পিতা, বিশ্বের আধার,
কোথায় রহেছ তুমি!
জানি না, দেখি না, বুঝি না তোমায়,
আজ্ঞানা রমণী আমি॥
নাহিক শকতি, ডাকিতে তোমায়,
নাহিক হৃদয় বল।
কি বলে ডাকিব, কি দিয়া পূজিব,
এতটুকু নাই শকতি বল॥
তব জ্ঞানাভাবে, অজ্ঞানে ডুবিয়া,
কত লোকে কত বলে।
কেহ বলে আছ, কেহ বলে নাই, কেহ বলে এক,
বহুরূপী কেহ বলে।
বিজ্ঞানের জ্ঞানে, অগাধ পাণ্ডিত্যে,
কোথাও তুমি ত নাই।
জ্ঞানের অতীত, বুদ্ধির অগম্য,
সম্পদের মাঝে কভু মিলে নাই।
মানব-জীবন লভিয়া আমরা,
কালস্রোতে বৃথা ভাসিয়া যাই।

মোহের আঁধারে স্বার্থ কোলাহলে,
কালকূট ভুলে পুলকে খাই।
তোমারে জানিলে, তোমারে ডাকিলে,
প্রকৃত জীবন লভিতাম মোরা।
জেনেও জানি না, ডেকেও ডাকি না,
ঠিক যেন সব মোরা দিশেহারা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গভর্ণমেণ্টের কার্য্যতৎপরতাগুণে এখন যেমন বাঙ্গালি শান্ত, শিষ্ট শিশুর মত নীরবে খেলা ধূলা করিয়া নিদ্রা যাইতেছে, তখন সেরূপ ছিল না। আমরা স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম অবস্থার কথা বলিতেছি। তখন সকলেই স্বদেশীর কথা কহিত, নিত্য সহরে মফঃস্বলে, গ্রামে, নগরে স্বদেশী সভা হইত। একজন মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিত, সহস্র সহস্র লোক নির্নিমেষ নয়নে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া উৎকর্ণ হইয়া পবিত্র স্বদেশী কথা শ্রবণ করিত। ঝড়, বৃষ্টি বিদ্যুৎ মানিত না, বাধা বিঘ্ন গ্রাহ্য করিত না, মুষলধারে বৃষ্টি জনসঙ্ঘ মস্তক পাতিয়া আহ্লাদে গ্রহণ করিত। তখন সকলেই আমাদের শিশু খ্যাদার ন্যায় আব্দার করিত, যা' তা বলিত, "এইতে" "ঐতে" করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। তখন খ্যাদার ন্যায় কেহ জানিত না যে, এ সব "দাদার" জিনিষ।

আমাদের দুই বৎসরের খাঁদা বড়ই দুষ্ট! পিতা মাতাকে মানে না। কাকাই তাহার জগতের মধ্যে প্রিয় বস্তু, কাকাকে পাইলে মাতৃস্তন্যও সমস্ত দিন ত্যাগ করিয়া হাসিয়া খেলা করিয়া কাটাইয়া দেয়, কিন্তু আব্দার ধরিলে কাকার তিরস্কার বা আদর সান্ত্বনা বাক্য বা মুখচুম্বন কিছুতেই কিছু হইত না। খাঁদা নিত্যই তার মায়ের আল্‌মারির কাচের পুতুলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলে, আরও কত কি নিত্য লোকসান করিয়া বসে। একদিন রোষ কষায়িত লোচনে তাহাকে বলা হইল, "এ সব দাদার জিনিষ।" সেই দিন হইতে দাদার জিনিষ শুনিলে খাঁদাকে সহস্র অনুরোধ বিনয় করিলেও সে জিনিষ আর স্পর্শ করিত না। ভয়ে জড়সড় হইয়া ব্যাকুল নয়নে চারি দিকে চাহিত। এখন দাদার নামে আমাদের খাঁদার ন্যায় বক্তা, শ্রোতা, কেরাণী, ছাত্র, লেখক, সম্পাদক যুবক, বৃদ্ধ সকলেই শান্ত, শিষ্ট হইয়াছে কিন্তু এক দিন খাঁদার পিতামাতা ও কাকার ন্যায় প্রবল প্রতাপ গভর্ণমেণ্টকেও উত্যক্ত হইতে হইয়াছিল। এখন আমাদের খাঁদা একটু খেলিয়া বেড়াইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই দুটি ভাত খায়, তার পর কাগজ কলম লইয়া কেরাণিগিরি করে, কখন সম্পাদক সাজিয়া সমাজ তত্ত্ব, দেহতত্ত্ব কত কি লেখে, অন্য কাজ হাতে না পাইলে বিধবা বিবাহ, প্রভৃতি সমাজ

সংস্কারের বিজ বিজ করিয়া বক্তৃতা করে, কখন কখন তাহার সঙ্গি "বেচারামকে" লইয়া সমাজ সংস্কারের দুই একটা সভারও আয়োজন করিতে ছাড়ে না। খাঁদা বেশ অবগত হইয়াছে, এ সব করিলে "দাদার" ভয় নাই। খাঁদা আমাদের জানে কেবল তাহার গৃহখানি আর আহার, নিদ্রা, শয্যা ও শয়ন। তাহার গৃহের বাহিরে সভা সমাজ সংস্কার, বক্তৃতা ও আরটিকেল লেখা ছাড়া আরও যে কিছু করিবার আছে, একথা খাঁদা মনেও করে না। খাঁদা জানে না, অথবা ভাবে না যে, দেশে অন্না-ভাবে, পীড়ায় ঔষধ ও চিকিৎসাভাবে কত লোক মারা যাইতেছে।* প্রতি চারি জনে যদি একজন নিরাশ্রয়

আমার হৃদয়ের ধন খাঁদাকে উপলক্ষ করিয়া যখন এই কথাগুলি মানব-চিত্রে লেখা হইয়াছিল, তখন আমার আত্মজ খাঁদা এই দুঃখ-পূর্ণ আঁধার সংসারে হাসির জ্যোৎস্না ফুটাইয়া স্বর্গের বিমল সুখ আমার ক্ষুদ্র সংসারে ছড়াইতে ছিল। হায়! সে সুখ-শান্তি আর আমার সংসারে নাই। খাঁদা তাহার হতভাগ্য জনক-জননী ও খুল্লতাতকে অশান্তির অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করিয়া একলা সেই ক্ষুদ্র শিশু কোন অজানিত লোকে গমন করিয়াছে! জানি না, বিধির কি অব্যথ বিধান! জানি না, আমা-দের হৃদয়ের রক্ত-বিন্দু খাঁদাকে শানিত ছুরিকা দ্বারা বক্ষ পঞ্জর ভেদ করিয়া দয়াময় ভগবান কাড়িয়া লইলেন কেন? জানি না, বিশ্বপিতার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে খাঁদাকে

দীনহীনের দুঃখ নিবারণ করিবার চেষ্টা করে, তবে দেশে অহোরাত্র এরূপ অন্নাভাব ও রোগ যাতনার হাহাকারধ্বনি

আমার থাকিতে না দিয়া তাঁহার কি মঙ্গল ইচ্ছা সাধিত হইল? জানি না, আমার ক্ষুদ্র খঁ্যাদার ক্ষুদ্র আত্মা কোথায় আজ কি অবস্থায় আছে। খঁ্যাদা আমার ভগবানের দান, তিনি দিয়াছিলেন—তিনিই লইয়াছেন, তাহাতে আর দুঃখ নাই, কিন্তু বুঝিতে পারি না, তিনি কেন সেই সুন্দর শিশুকে পাঠাইয়াছিলেন, কেন আমায় দিয়াছিলেন, আবার কেনই বা কাড়িয়া লইলেন! এই সব জানিবার জন্যই আজ হৃদয় কাতর হইতেছে। কেহ বলে, আমাদের কর্ম্মফল, কেহ বলে, পরমায়ু ছিল না, কেহ বলে, মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছার ভিতর ক্ষুদ্র মানব-বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না! তবে কি আমরা প্রকৃত সত্য জানিব না,—এই অন্ধকারেই থাকিব? শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠে ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষ দৈববলসম্পন্ন যোগীদের বাক্য আলোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে যাহা শেষ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি, আমার প্রণীত "জীবন ও মৃত্যু" নামক পুস্তকে তাহাই বর্ণনা করিয়াছি। আমার ভাগ্যবান শিশু খঁ্যাদাই আমাকে এই শান্তির পথ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছে। খ্যাদার আমার আধ আধ ভাষায় অমৃত সিক্ত হাসিমাখা কথাগুলিই জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন এই অজানা পথ ধরিয়া লইয়া যাইবে বাঙ্গালা সন ১৩১৫ সালের ২২শে ভাদ্র সোমবার রাত্রি ৭টা ২৭ মিনিটের সময় খ্যাদা আমার জন্মগ্রহণ করে। বাঙ্গালা সন ১৩১৭ সালের ১লা পৌষ শনিবার কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ নিশি, ৯ ঘটিকা রজনীতে

উত্থিত হইত না! যাও সমাজ সংস্কারক, এই বাহ্য চাকচিক্যময় কলিকাতা নগরী হইতে একবার পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আইস। অধিক দূর যাইতে হইবে না, তারকেশ্বর ষ্টেসনের ৪ ক্রোশ দূরে সারাটী, মায়াপুর প্রভৃতি পল্লীগ্রামে একবার পদার্পণ কর, দেখিবে,

---

খ্যাদা আমাদিগকে একটা নূতন পথ দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। খ্যাদার জীবনের কথা "জীবন ও মৃত্যু" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। খ্যাদা কি একটা দৈবশক্তি লইয়া এখানে আসিয়াছিল। তাহার সেই আধ আধ ভাষার সরল তেজপূর্ণ কথাগুলি অহরহঃ কর্ণে ঝঙ্কৃত হইয়া আমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে ভিন্ন পথে লইয়া চলিয়াছে। যে পথে জীবনে কখন চলিবার সুবিধা ঘটিত না, খ্যাদা সেই সুপথ আমাকে দেখাইয়া দিতেছে। খ্যাদার সেই "মনির ছব" "পান্নুগুমনি লক্ষী ছোনা" "বাবা বকাবকি বকাবকি" প্রভৃতি নানা অব্যক্ত ভাবপূর্ণ কথাগুলি প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে ভিন্ন পথে চালিত করিতেছে। প্রথম অসহনীয় ভীষণ পুত্র-শোকে কাতর হইয়া ভাবিয়াছিলাম, খ্যাদা চিরজীবনের মত আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু ভগবানের করুণায় এখন বুঝিয়াছি, খ্যাদার ক্ষুদ্র আত্মা পরলোকে খেলা করিতেছে! সময়ে সাক্ষাৎ হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য! আত্মার বিনাশ নাই, খ্যাদার আত্মাও বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই। মানুষ তাহার প্রিয়জনের আত্মাকেই ভালবাসে, শরীরটাকে ভালবাসে না। যদি শরীরটাকেই ভালবাসিবে, তবে আত্মা চলিয়া গেলে সেই

ম্যালেরিয়ায় পল্লীগ্রামবাসীগণ অস্থিচর্ম্মসার, দেখিবে উপযুক্ত খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায়,—দেখিতে পাইবে, জলাভাবে তাহারা কর্দ্দম মিশ্রিত বিষাক্ত জল পান করিতেছে। আরও দেখিবে, প্রতি বৎসর ভীষণ দামোদরের বন্যায় ক্ষেতের ধান বাসগৃহ সমস্ত ভাসিয়া যাইতেছে! এই সব পল্লীগ্রামের সহস্র সহস্র লোক অন্নাভাবে ক্ষুধার জ্বালায় কেহ বা বিনা চিকিৎসায় দেশকে অভিসম্পাত করিতে করিতে মৃত্যুস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে।

কোন্ কাজটা আগে বড়! আগে সমাজ-সংস্কার, না

শরীরটাকে দেখিয়া শোক দুঃখ হইবে কেন? সেই শব-দেহটা দেখিয়াই মানুষ সুখী হইতে পারিত। তাহা যখন পারে না, তখন ইহাই ধ্রুব সত্য যে, আত্মাকেই মানুষ ভালবাসে! সুতরাং আত্মার যখন বিনাশ নাই, তখন শোক দুঃখ কি? সকলকেই একসঙ্গে মিলিতে হইবে, পরস্পর প্রিয়জনদের সঙ্গে আবার দেখা সাক্ষাৎ হইবে, আমাদের প্রাণের খাঁদা মনির অমর আত্মাকেও আবার আমরা দেখিতে পাইব। অপ্রাসঙ্গিক বোধে খাঁদার জীবনের কাহিনী জন্ম ও মৃত্যু এবং জীবন মরণের কথা এস্থলে লিখিতে পারিলাম না, যাঁহারা শোক-সন্তপ্ত, যাঁহারা জীবন মৃত্যু ও পরকালের কথা জানিয়া শোক সন্তাপ দূর করিয়া অশান্তিপূর্ণ সংসারে শান্তি লাভ করতঃ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে চান, তাঁহারা একমাত্র ভগবানের চরণে নিজেকে বিলাইয়া দিন্।

আগে সমাজ-রক্ষা? মুষ্টিমেয় কলিকাতার অধিবাসী লইয়া ত সমাজ নহে! পল্লীগ্রামগুলি যে একবারে যায়! অন্নাভাবে জলাভাবে, ঔষধ ও পথ্যাভাবে, ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাসে তোমার স্বদেশী পল্লীগ্রামবাসীগণ যে মৃত্যু-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে! কত লোক জুড়ি হাঁকাইয়া বিলাসস্রোতে ভাসিতেছে, কিন্তু কোন দিন কাহাকেও বাহু প্রসারণ করিয়া একটি দিন পল্লীগ্রামবাসীকে মৃত্যু-স্রোতে হইতে বুকে তুলিয়া লইতে দেখি নাই! ইহাই কি মানবধর্ম্ম! যদি কেহ হৃদয়বান পাঠক থাক, তবে আমরা অনুরোধ করিতে পারি, তারকেশ্বর ষ্টেসন হইতে চারি ক্রোশ দূরে হুগলী জেলায় সারাটী মায়াপুর প্রভৃতি পল্লীগ্রামগুলির দুর্দ্দশা একবার যাইয়া স্বচক্ষে দর্শন কর, দেখিবে, দামোদরের বন্যায়, ম্যালেরিয়ার ভীষণ গ্রাসে রোগ শোক ও অন্নাভাবে হাহাকার করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে! অন্য আন্দোলন দূরে রাখিয়া, অগ্রে পল্লীগ্রামের দুরবস্থা মোচন করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় প্রদান কর!

আমরা পূর্ব্বকার কথা বলিতে বলিতে মনের আবেগে অন্য কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। যে রাত্রে সুরবালা ও তাহার পিতাকে সুরেন্দ্রনাথ ও শৈলবালা আশ্রয় প্রদান করিল, সেই রাত্রেই চরমুখে শশীভূষণ জমিদার এই সংবাদ জ্ঞাত

হইয়া রোষকষায়িত লোচনে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। চোবে, দোবে, রাম সিংহ, খেলাৎ সিং প্রভৃতি দ্বারবানগণ, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি পাইকগণ, রামা শামা প্রভৃতি সড়্কি-ওলাগণ জমিদার প্রভুর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত ত্রস্ত ও কম্পিত হৃদয়ে প্রভুর আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভাবিল, আজ দাঙ্গা রক্তারক্তি অনিবার্য্য। শশীভূষণ দোনলা কার্ত্তিজওলা বন্দুকটা আনিবার আদেশ করিলেন, একটা অন্দরের ফটকের দ্বারবান দুই লম্ফে বন্দুকটা বাহির করিয়া আনিল। জমিদার বাবু একবার ভাবিলেন, স্বয়ং যাইয়া বন্দুক ও কার্ত্তিজের সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বী সুরেন্দ্রনাথকে জগৎ হইতে সরাইয়া দিই, আবার কি ভাবিয়া বন্দুকটা রাখিয়া দিলেন। শশীবাবুর বহু প্রজাই সুরেন্দ্রনাথের জমিদারিতে উঠিয়া গিয়া বাস করিতেছে, কিন্তু তাহাতে ক্রোধের মাত্রা বা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি এতটা বৃদ্ধি হয় নাই! একটি নিঃস্ব প্রজা তাহার বিধবা কন্যাকে লইয়া পলাইয়া যাওয়ায় আজ যেন ক্রোধের মাত্রা এত বৃদ্ধি হইয়াছে?

শশী বাবুর জমিদারির আয় সুরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা দ্বিগুণ, অর্থবলও তদ্রূপ। লোকবল অর্থবল অপেক্ষাও অধিক। অন্যান্য পাইক দ্বারবান ব্যতীত শতাধিক পশ্চিমদেশের পালোয়ান শশী বাবুর দেউড়িতে অহরহ,

আটা ও সিদ্ধির শ্রাদ্ধ তর্পণ করিয়া লম্বা লম্বা গোঁপে অহরহঃ পাক লাগাইতেছে! থানার দারোগাবাবু, জমাদার ও কনেষ্টবলগণ জমিদার শশীবাবুকে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও মান্য করিয়া ছেলাম করেন। অধিকন্তু থানার প্রধান দারোগা যিনি তাঁহার অধীনস্থ পল্লীগ্রামগুলির দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তিনি শশীবাবুর সমপাঠী। পাড়া গেঁয়ে চাষা প্রজাগুলা বলে, আমাদের জমিদার বাবুর সঙ্গে দারোগা বাবুর "হরিহর আত্মা।" কতকগুলা পাড়া গেঁয়ে দুষ্টলোকে বলিত, দারোগা বাবু সপ্তাহান্তে একদিন যদি জমিদার বাবুর বাগানে না যাইতেন, তবে বাবু নিজে আসিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেন। আমরা কিন্তু টানিয়া লইয়া যাইতে কোন দিন দেখি নাই, তবে শশী বাবুর সঙ্গে বাগান-বাটীতে মধ্যে মধ্যে দেখিয়াছি। যাউক সে কথা।

এ হেন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ শশীভূষণ জমিদার কি ভাবিয়া বন্দুকটা রাখিয়া দিলেন। চারিদিকে চাহিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার বসিয়া পড়িলেন। আবার একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া একটা দ্বারবানকে সম্মুখে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত মাত্র আট দশ জন দ্বারবান ও কয়েকজন পালোয়ান আসিয়া করজোড়ে প্রভুর সম্মুখে কম্পিত-কলেবরে দণ্ডায়মান হইল। জমিদার বাবু একটা

দ্বারবানের কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন, দ্বারবানটা ঊর্দ্ধশ্বাসে থানাভিমুখে দৌড়াইতে লাগিল।

সেই দিন রাত্রেই জমিদার-বাবুর বাগান বাটিতে মজলিস বসিল। এক একবার হাসির স্রোত পঙ্কিল ঝঙ্কার-জনক স্রোতের ন্যায় বাঙলা হইতে উদ্যানের মাঝে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। চুপি চুপি, কাণে কাণে বহুক্ষণ ধরিয়া বহুরূপ পরামর্শ চলিল। রজনী তৃতীয় যাম অতীত হইয়া গেল। প্রভাতে সরকারি কাজে অনেক লেখা পড়া করিতে হইবে বলিয়া দরোগা বাবু হাস্মি-মুখে জমিদার বাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। থানায় ফিরিয়া তিনি ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে রিপোর্ট প্রেরণ করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ যুবক জমিদার, প্রবল প্রতাপশালী। দেশের ভদ্রলোক ও প্রজাগণ বিশেষতঃ স্কুলের ছেলে ও যুবকেরা উক্ত জমিদারের একান্ত বাধ্য! তাঁহার স্থাপিত হাট এখানকার মধ্যে প্রধান। সপ্তাহে দুই দিন এই হাটে বহু টাকার স্বদেশী ও বিদেশী মাল কেনা বেচা হইয়া থাকে। বিলাতী মাল তাঁহার হাটে যাইবার উপায় নাই। যাহাদের বিলাতী বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষ পত্র নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহাদের এজাহার ও নামের তালিকা হুজুরে প্রেরিত হইল।

এদিকে জমিদার বাবুর একজন বিশিষ্ট ধনবান প্রজা থানায় যাইয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে এজাহার প্রদান করিল।

"নবীনের কন্যা সুরবালা মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতে কাপড় বিক্রয় করিতে যাইত। অনেক দিন যাতায়াত করিতেছে, এই জন্য কাহারও তাহার উপর অবিশ্বাস ছিল না। কাল কাপড় বিক্রয় করিতে গিয়া আমার স্ত্রীর কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিয়া আনিয়াছে। আমার বিশ্বাস, তাহার পিতার গৃহ খানাতল্লাসী করিলে জিনিষগুলি বাহির হইতে পারে। তিনজন লোক তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

দারোগাবাবু কালবিলম্ব না করিয়া কয়েকজন কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া নবীনের গৃহাভিমুখে অভিযান করিলেন। নবীনের গৃহ অনুসন্ধান করিতে লিষ্ট মত স্বর্ণালঙ্কারগুলি বাহির হইয়া পড়িল। খানাতল্লাসির সাক্ষীর দস্তখত লইয়া স্বর্ণালঙ্কারগুলির ওজন ইত্যাদি লিখিতে লাগিলেন। এক জোড়া গিনি স্বর্ণের ব্রেসলেটের গঠন, শিল্প-নৈপুণ্যতা ও হাই পালিস দেখিয়া দারোগাবাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। ব্রেশলেটটিতে আবার সুন্দর অক্ষরে দম্পতিযুগলের নাম লেখা এবং নানাবিধ চিত্রাঙ্কিত। দারোগা বাবু ফরিয়াদির মুখের দিকে চাহিয়া আহ্লাদে আটখানা

হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সুন্দর গঠন ত কোথাও দেখি নাই, ইহা বুঝি সাহেববাড়ী হইতে গড়াইয়াছিলে?" ফরিয়াদি বলিল, "না বাবু! ইহা কলিকাতার বিখ্যাত * * জুয়েলারি ফারমে গঠিত! দারোগাবাবু আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "বল কি হে? বাঙ্গালির জুয়েলারি ফারমে এমন সুন্দর ব্রেশলেট প্রস্তুত হয়?" দারোগাবাবুর বহুদিন হইতে তাঁহার গৃহিণীর জন্য এইরূপ এক জোড়া নাম লেখা ব্রেশলেট গড়াইবার সাধ ছিল, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দারোগাবাবু মনে মনে কি ভাবিয়া একটা যেন নব আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন!

ফরিয়াদি দারোগা বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ইহা অপেক্ষাও ভাল জিনিষ বাঙ্গালির জুয়েলারি ফারমে প্রস্তুত হয়।"

দারোগাবাবু জিনিষের লিষ্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া সাক্ষীদের নাম লিখিয়া লইলেন এবং মকর্দ্দমার অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সুরবালাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। সেইদিনেই জমিদার বাবুর পক্ষ হইতে নবীনের নামে বাকি খাজনার নালিশ রুজু করিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। প্রেরিত কর্ম্মচারি মুন্সেফ কোর্টে উপস্থিত হইয়া দেখিল, জনৈক প্রজা নবীনের

নামে জমিদার বাবুর উকিলের দ্বারা হাতচিঠা বাবুদে স্থদে আসলে কতকগুলি টাকার দাবিতে নালিশ রুজু করিয়াছে। কর্ম্মচারি উকিলের মুখে শ্রুত হইল, শীঘ্র এক তরফা ডিক্রী করিয়া নবীনকে দেওয়ানি জেলে আবদ্ধ করা হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অদ্য একাদশী, প্রতি একাদশীর দিন সুরেন্দ্রনাথ ও শৈলবালা নিরম্বু উপবাস থাকিয়া অহোরাত্র ভগবৎ আরাধনায় কালযাপন করেন। এই দিন ইঁহারা হৃদয়ে অন্য চিন্তা স্থান দেন না, মুখে অন্য কথা উচ্চারণ করেন না। বিশেষ জরুরি বিষয় কর্ম্মের কথাও সুরেন্দ্রনাথকে সে দিন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার কোন কর্ম্মচারির ছিল না। এই একাদশীর দিন সুরেন্দ্রনাথের প্রধান বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রঘুনাথ সেন কতকগুলি কাগজপত্র হস্তে লইয়া প্রভুর নাম দস্তখত করাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। সেদিন উকিলের নিকট কাগজ পত্র ও দলিলাদি না পাঠাইলে দশ সহস্র টাকার মকর্দ্দমা একবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। অগত্যা রঘুনাথ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা জানিয়া কত কি ভাবিতে ভাবিতে অতি সঙ্কুচিতচিত্তে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রভুকে নিজ আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। রঘুনাথ সেন অতি ধার্ম্মিক, উন্নতমনা, বিশ্বস্ত কর্ম্মচারি। আবশ্যক পড়িলে অন্দরেও তিনি যাতায়াত করিতে পাইতেন। এই অধিকার কর্ত্তার

আমল হইতে রঘুনাথ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। রঘুনাথের আগমনে শৈলবালা সেস্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। রঘুনাথবাবু সসম্ভ্রমে একতাড়া দলিল প্রভুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। এই কাগজ পত্রে সুরেন্দ্রনাথকে কেবল যে দস্তখত করিতে হইবে তাহা নহে, প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহাকে নানা বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতে হইয়াছিল। কাগজ পত্র দেখিতে দেখিতে সুরেন্দ্রনাথের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। প্রায় দুই ঘণ্টার পর সুরেন্দ্রনাথ ম্যানেজার রঘুনাথ বাবুকে বলিলেন,— "রঘুনাথ! এই মকর্দ্দমা চালাইবার আবশ্যক নাই। কেন চালাইবার আবশ্যক নাই, সে কথা বলিবার পূর্ব্বে তোমাকে কয়েকটি কথা বলিব।"

রঘুনাথের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। রঘুনাথ আজ ১০ বৎসর বাবুর সংসারে চাকরি করিতেছেন, সুরেন্দ্রনাথকে আজ ১০ বৎসরকাল দেখিয়া আসিতেছেন! রঘুনাথ প্রভু-পুত্রকে চিনিবার মত চিনিয়াছেন, হৃদয়খানি দেখিবার মত দেখিয়াছেন! রঘুনাথ ভাবিলেন, কি সর্ব্বনাশ! তবে কি বাবু এতগুলি টাকা একবারে ছাড়িয়া দিবেন নাকি?

সুরেন্দ্রনাথ একবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ রঘুনাথ! আমরা বার মাস, ত্রিশ দিন,

বিষয় ও বৈষয়িক কথা লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছি। কিন্তু ভাবি না, বিষয় কি, অর্থ কাহার? ইহারা আমাদের জীবনের সঙ্গে কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারিবে? ইহারা মাটীর জিনিষ, মাটিতেই থাকিবে। তোমার আমার জীবনের সঙ্গে উর্দ্ধে উঠিবার ইহাদের ক্ষমতা নাই! বরঞ্চ জীবনটাকে মাটিতে ফেলিয়া নিষ্পেষিত করিবার জন্যই ইহারা চেষ্টা করিয়া থাকে এবং সে চেষ্টায় ইহারা কৃত-কার্য্যও হয়। তাই আমরা মাসের মধ্যে দুটি দিন ইহাদের বিষময় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, স্বার্থ-কোলাহল দূরে রাখিয়া; হৃদয়ের ময়লা-মাটি ধৌত করিবার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি। ভাবিতে গেলে হৃদয়টা কি অস্থির হয় না রঘুনাথ! আমরা কি অবস্থায় জীবনটাকে কাদামাটি মাখাইয়া ইহার শক্তিকে হ্রাস ও ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছি! জীবন যে একবারে সঙ্গিহীন! তবে কেন ধন, অর্থ, সম্পদ, স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসার পশ্চাতে পশ্চাতে জীবনটাকে ছুটাইয়া দিই, জীবনটাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখি। কেন বিরহ-বেদনা, রোদন? জীবন ত ইহাদের সঙ্গী নয়। এই জীবনের যেখানে আরম্ভ, সেইখানেই শেষ! কেবল মাঝখানটায় মোহ ঘোরে ডুবিয়া থাকে বৈ ত নয়! কে যেন জীবনটাকে অহরহঃ ডাকিতেছে! সর্ব্বদা কে যেন বলিতেছে, কাছে আয়, কাছে আয়! রঘুনাথ! আমার

যেন সর্ব্বদা মনে হয়, আমাদের এটা দেশ নয়, এটা যদি আমাদের চির আবাস স্থান হইত, তবে মাঝে মাঝে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত না! তাই রঘুনাথ মাসের মধ্যে দুইদিন সকলই ত্যাগ করিয়া ভাবি, আমরা কোথায় আছি, কোথায় আমাদের দেশ। ভাবিতে ভাবিতে বুঝিতে পারি, কে যেন সেই সর্ব্বনিয়ন্তার কাছ হইতে আমাদের ব্যবধান কতখানি, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছে। কেবল দেখাইয়া দেয় না! প্রাণারাম অমিয়-মাখা স্বরে বলিয়া দেয়, কেন তাঁর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছিস্? যতদিন বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবি, ততদিন ত্রিতাপ-তাপে দগ্ধ হইয়া যন্ত্রণায় হাহাকার করবি। তিনি ত আমাদিগকে ভুলেন নাই, কেবল আমরাই তাঁহাকে ভুলিয়া আছি। তিনি ত চিরদিন তাঁহা হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবেন না। কেবল আমরাই বিচ্ছিন্ন থাকিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। তিনি আমাদিগকে টানিয়া লইয়া আপনার করিবার চেষ্টা করিতেছেন. কেবল আমরাই তাঁহাকে পর ভাবিয়া ভুলিয়া আছি। রঘুনাথ! সংসারের এই মায়া-শৃঙ্খলে, এই স্বার্থ, মমতা, মোহ শৃঙ্খলে, এই সম্পদ বিলাসিতার ঝঙ্কার নিগড়ে কতদিন আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিবে? তিনি অহরহঃ ডাকিতেছেন! রঘুনাথ, তাঁর কি অসীম দয়া!

আমরা ভুলে আছি—আমরা পর মনে করিতেছি, কিন্তু তিনি ভুলেন নাই, তিনি আপনার ভাবিয়া স্নেহভরে ক্রোড়ের দিকে টানিতেছেন। তাঁর অহরহঃ ডাকের ভিতর যেদিন একটী ডাক কর্ণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিবে, সেই দিনই মোহ-শৃঙ্খল, স্বার্থের ঝঙ্কার নিগড় ছিন্ন করিয়া তাঁহার দিকে দৌড়াইব! দৌড়াইতে দৌড়াইতে যখন আর পশ্চাতের দিকে চাহিব না, যখন আর এক পদও পশ্চাতে হটিব না, যখন দৌড়াইতে দৌড়াইতে শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে পড়ি পড়ি হইব; তখনই তিনি ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। তখনই দেখিতে পাইব, তাঁহার সঙ্গে আর বিচ্ছিন্নতা নাই, নিজের দেশে নিজের গৃহে স্বস্থানে আসিয়া পৌছিয়াছি। যতদিন তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিব রঘুনাথ, ততদিন এই বিচ্ছিন্নতার যাতনা ভোগ করিতেই হইবে। ততদিন রোগ, শোক, দুঃখ তাপ আমাদিগকে সহ্য করিতেই হইবে। ভাসাইয়া দাও রঘুনাথ হৃদয়-মনকে সেইদিকে—সেই সর্ব্বনিয়ন্তার পথে ভাসাইয়া দাও, বড়ই আনন্দ পাইবে। মনকে এই পার্থিব সংসার হইতে, সরল স্বচ্ছ পথে, ঊর্দ্ধদিকে উঠাইয়া দাও। আর কেন? যাহাকে আমার আমার করিয়া ধরিতে যাইতেছ, সেই দূরে—অতি দূরে সরিয়া যাই-তেছে। ইহাতেই কি বুঝিতে পার না রঘুনাথ, যে

আমার বলিতে এ জগতে কিছুই নাই! আমার বলিতে কেবল একজন আছেন, যিনি পাপী তাপীকে, দুঃখী নিরাশ্রয়াকে, পথের ভিখারিকে মানুষের ন্যায় ঘৃণা না করিয়া একদিন ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। রঘুনাথ! নিত্য হৃদয় মন স্বার্থময় কূপে, মোহ অন্ধকারে ডুবিয়া আছে। একদিন সেই হুঙ্কারজনক কূপ হইতে, পূতিগন্ধ-পূর্ণ অন্ধকারময় স্থান হইতে মনটা পলাইয়া আসিয়া নির্জ্জনে যাপন করে! এখানেও সেই বিষাক্ত বিষয়-কীট-পূর্ণ দলিলের বোঝা লইয়া যন্ত্রণাময় জীবনটাকে বিষাক্ত বিষয় কীট দ্বারা দংশন করাইতে আসিয়াছ রঘুনাথ? আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই?"

রঘুনাথ সলজ্জ অশ্রুপূর্ণ লোচনে করযোড়ে বলিলেন, "না বুঝিয়া অপরাধ করিয়াছি, ভৃত্য বোধে ক্ষমা করুন।"

"তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে আসিয়াছ, ক্ষমা চাহিবার কার্য্য কিছুই কর নাই। যদি কখন ক্ষমা চাহিবার আবশ্যক হয়, ভগবানের কাছে ক্ষমা চাহিও। মানবের ক্ষমা করিবার বা দণ্ড দিবার কোন অধিকার আছে বলিয়া আমার মনে হয় না রঘুনাথ!"

রঘুনাথ।—আপনি আমার প্রভু, সহস্র অপরাধেও আপনি আমাকে ক্ষমা করিতে পারেন।

সুরেন্দ্র।—ভগবান প্রভু ও ভৃত্যরূপে সংসারে যে

পৃথক পৃথক জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ কথা তোমায় কে বলিল? কেবল কোন কোন প্রভু অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ভাবে, "আমি প্রভু" "আমি কর্ত্তা" আর "তুমি ভৃত্য" আমার অধীনস্থ জীব। সংসার নাট্যশালায় আমরা কেহ ভৃত্য, কেহ প্রভু সাজি, আবার সাজ পরিবর্ত্তন করিয়া কখন প্রভু ভৃত্য সাজে, ভৃত্য প্রভু সাজে। সংসারের প্রহেলিকা তুমি আমি কি বুঝিব? কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, তুমি কে, আমি কে, তুমি ও আমি বলিতে বাস্তবিক কোন জিনিষ এ সংসারে আছে কি না? এ সব প্রশ্নের মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হইল না! কখন হইবে কি না কে জানে? যাউক সে কথা। তুমি এই যে কাগজ লইয়া আসিয়াছ, এ সম্পত্তি এখন কাহার?

রঘু।—হুজুরের কি স্মরণ নাই, কর্ত্তার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের কলিকাতায় তুলার আড়ত হইতে রামজীবন চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক কর্ম্মচারি তহবিল ভাঙ্গিয়া কয়েক সহস্র টাকা লইয়া পলায়ন করে। কর্ত্তা বহু চেষ্টায় তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু বহু-লোকের অনুরোধ সত্ত্বেও তাহাকে ফৌজদারি সোপর্দ্দ না করিয়া তাহার বিষয়াদি বন্ধকি সত্ত্বে কোয়ালা লিখিয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন। কথা থাকে, আমাদের আসল টাকাগুলি দিলেই বিষয়াদি ছাড়িয়া দিবেন।

কিন্তু সে কিছুই দেয় নাই, দিবার ইচ্ছা করিলে দিতে পারিত।

সুরেন্দ্র।—সে ব্যক্তি এখন কি করে?

রঘু।—দুই বৎসর হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

সুরেন্দ্র।—এখন আর তাহার কে আছে?

রঘু।—বিধবা স্ত্রী ও দুইটি সন্তান।

সুরেন্দ্র।—তাহাদের বয়স কত?

রঘু।—একটি দশ বৎসরের, অপরটী তাহা অপেক্ষা ছোট।

সুরেন্দ্র।—কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ইহাদের বিষয়াদি বিক্রয় করিয়া লইলে তাহারা কোথায় দাঁড়াইবে রঘুনাথ?

রঘু।—তবে কি আমাদের টাকাগুলি লইয়া নিরাপদে তাহারা ভোগ করিবে হুজুর?

সুরেন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, "বিধবার স্বামী ও বালক দুটির পিতা যদি পাপ করিয়া গিয়া থাকে, সেই পাপের দণ্ডস্বরূপ কি আজ বালক দুটী ও তাহার বিধবা জননীকে পথে বসাইতে চাও রঘুনাথ? কাহার পাপে কাহাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইয়াছ? জানি না, রামজীবন চট্টোপাধ্যায় কি ভাবিয়া বা কোন্ অবস্থায় পতিত হইয়া এই দুষ্কার্য্য করিয়াছিল। বাহ্যিক কার্য্য দেখিয়া সে ব্যক্তি

পাপ কি পুণ্য কার্য্য করিয়াছিল কি করিয়া বুঝিব ? তাহার মনের ভাব ও উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহাও ত এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ রঘুনাথ, তুমি একটি ভীষণ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছ ! বিষয়াদি বিক্রয় করিয়া লইলে তাহাদিগকে পথের ভিখারি হইতে হইবে। বিধবা হয়ত পরগৃহে পাচিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিবে, ছেলে দুটি জ্ঞান ও বিদ্যা লাভের সুবিধা না পাইয়া হয় ত নিজ নিজ জীবনকে কতই অবনতির পথে লইয়া যাইবে। বিধবা দারিদ্র্য দশায় উপনীত হইলে আরও কতরূপ বিপদ ঘটিতে পারে ? জ্ঞানী পুরুষও মনের দুর্ব্বলতার জন্য যদি পাপপঙ্কে ডুবিতে পারে, তবে নিরাশ্রয়া, অর্থসম্পদহীনা একটি বিধবা নারীর মনের বল কতটুকু প্রলোভনের গুরুভার বহন করিতে সক্ষম হইবে, তাহাও ত ভাবিতে হইবে রঘুনাথ ! আমার মনে হয়, এই ব্রাহ্মণকে বিপদে ফেলিবার পিতৃদেবেরও ইচ্ছা ছিল না, যদি থাকিত, তবে তিনি জীবিতকালেই তাহার বিষয়াদি বিক্রয় করিয়া লইতে পারিতেন, সুতরাং আমার মনে হইতেছে, তিনি যেন ইঙ্গিতে বলিয়া গিয়াছেন, “ব্রাহ্মণের বিষয়ের লোভ করিও না সুরেন্দ্রনাথ !” ভগবান যাহা দিয়াছেন তাহাতে আমাদিগকে ত অনাহার যন্ত্রণায় মরিতে হইবে না রঘুনাথ ? তবে কেন একজনের পাপে

ক্রোধ, হিংসা ও লোভের বশবর্ত্তি হইয়া নিরাশ্রয়া বিধবা ও তাহার বালক পুত্র দুটিকে অনাহারে মারিতে উদ্যত হই-তেছ ? এই কার্য্যের পরিবর্ত্তে যদি পিতৃহীন বালক দুটিকে সৎশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত সংসারী সাজাইয়া ধর্ম্ম পথের পথিক করিতে পার, তবে এই সৎকার্য্যে ভগবানও তোমাকে সাহায্য করিবেন এবং বিধবার স্বামীর ও বালক দুটির পিতার পাপের শাস্তি স্বরূপ তাহার স্ত্রী পুত্রকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে। আর রঘুনাথ! হয়ত ব্রাহ্মণ রামজীবনের তপ্ত আত্মা এই বিচারে শান্তি লাভ করিবে। তুমি অদ্যাই আমাদের উকিলকে বিধবার বিরুদ্ধে সমস্ত দাবী উঠাইয়া লইবার জন্য টেলিগ্রাম কর। কিন্তু রঘুনাথ! বিধবা ও তাহার পুত্র দুটি কি অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে, তুমি যদি একবার স্বয়ং যাইয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে পার, বড়ই ভাল হয়।"

প্রভুপুত্রের বিশাল প্রশান্ত হৃদয়ের করুণা-মাখা দণ্ডাদেশের কথা শ্রবণ করিয়া উপযুক্ত প্রভুর উপযুক্ত কর্ম্মচারি প্রেমাশ্রুতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—"প্রভু! আপনার আদেশ—"

ঠিক এই সময়ে বহির্বাটিতে কিসের একটা কোলা-হল উত্থিত হইল। রঘুনাথ তাড়াতাড়ি প্রভুর নিকট

বিদায় গ্রহণ করিয়া বহির্বাটিতে উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ বৃথা কথায় সময় নষ্ট করিলেন ভাবিয়া শৈলবালাকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতপদে উদ্যান কুটীরে গমন করিলেন। সুরবালাও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

রঘুনাথ বহির্বাটিতে উপস্থিত হইয়া জনৈক কর্ম্মচারীর মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন এবং যথায় গোলমাল হইতেছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, থানার দারোগাবাবু লোকজন লইয়া সুরবালাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বহির্বাটিতে প্রবেশ করায় দ্বারবানগণ ও আমলাবর্গ ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া গোলযোগ করিতেছে। রঘুনাথ বাবু সকলকে চলিয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। রঘুনাথ বাবুর ইঙ্গিতে দ্বারবানগণ প্রশস্ত বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত করিয়া ভীষণ ক্রোধ ও ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে বার বার দারোগার দিকে চাহিয়া দেউড়িতে জমায়েৎ হইতে লাগিল। ম্যানেজার বাবু গভর্ণমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত পুলিস কর্ম্মচারিকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি চুরির প্রমাণ পাইয়াছেন ?"

দারোগা বাবু গর্ব্বিত হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া অবজ্ঞাভরে উত্তর করিলেন, "যথেষ্ট।"

রঘুনাথ।—চোরাই মাল বাহির হইয়াছে কি ?

দারোগা।—তাহাও হইয়াছে। আপনার কাছে

এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহি। আপনি সরকারি কর্ম্মচারির সময় নষ্ট না করিয়া শীঘ্র আসামীকে বাহির করিয়া দিন। আমি অবগত হইয়াছি, আসামী জমিদার বাবুর বাটিতেই আছে।

রঘুনাথ।—আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নন,—তবে কি আমি আপনার আসামীকে আপনার কাছে অনুসন্ধান করিয়া হাজির করিয়া দিতে আইনানুসারে বাধ্য?

দারোগা।—আপনারা কি সরকারি কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইতেছেন? জানেন, তাহার পরিণাম কি?

রঘুনাথ।—বিশেষ জানি দারোগা সাহেব! আরও জানি যে, তোমার ন্যায় কতিপয় কর্ত্তব্য-জ্ঞানবিশিষ্ট সরকারি কর্ম্মচারির জন্যই গরীব প্রজাদের পরিণাম দিন দিন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতেছে। ভারতের প্রজা রাজভক্তি-হীন নহে। যাহারা ধর্ম্মপ্রাণ যোগী তপস্বীর সন্তান, যাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ মহাতপস্বী যোগীগণ রাজাকে দেবতার আসনে বসাইয়া, হৃদয়ের প্রেম ভক্তি দিয়া পূজা করিবার জন্য বংশধরগণকে অনুমতি দিয়া গিয়াছেন, তাহারা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অথবা রাজ-কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য-কার্য্যে বাধা দিতে কখনই সচেষ্ট হইবে না। আপনাকে

প্রজা রাজাকে বা কর্ত্তব্য-পরায়ণ, উদারচেতা, উপযুক্ত রাজ-কর্ম্মচারীকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিয়া থাকে। ভারতের এরূপ হতভাগ্য মূঢ় প্রজা কেহ নাই যে, দেবী-স্বরূপিনী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বংশধর আমাদের দেবতার-স্বরূপ সম্রাট অথবা তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্মচারী-বর্গের প্রতি ভক্তিহীন হইতে পারে! তুমি যখন একজন ধার্ম্মিক নির্ব্বিবাদী, সংসার-আসক্তিহীন, রাজভক্ত জমিদারের প্রতি বিনা কারণে, নিজ স্বার্থসিদ্ধির আশায় অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার অট্টালিকার দ্বারে উপনীত হইয়াছ, তখন জানি না, তোমার ন্যায় আরও কতজন কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী ঊর্দ্ধতন সদাশয় রাজ-কর্ম্মচারির চক্ষুর অন্তরালে এইরূপে দীন প্রজার কুটীর-দ্বারে উপনীত হইয়া বিনা দোষে তাহাদের সম্মান নষ্ট করিয়া গৌরবমণ্ডিত রাজশাসন কলঙ্কিত করিতেছে! দীনের প্রতি অত্যাচার হইলে তাহাদের ক্ষীণ কাতর ক্রন্দন ঊর্দ্ধতন সদাশয় রাজ-কর্ম্মচারিদের কর্ণগোচর হয় না, রাজ-প্রতিনিধিগণ তাহাদের করুণ কাতর ক্রন্দনের তপ্ত অশ্রু দেখিতে পান না কিন্তু জানিও দারোগা সাহেব, তুমি আজ যে পাপকার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছ, ইহা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, ন্যায়-বিগর্হিত, রাজ-আইনের প্রতিকূল। ঊর্দ্ধতন রাজ-কর্ম্মচারিদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া

এই ভীষণ পাপ কার্য্য নীরবে কখনই সম্পন্ন করিতে পারিবে না। বৃটিশ শাসন ও বৃটিশ আইন নিরপেক্ষ মহৎ উদ্দেশ্য বুকে লইয়া উচ্চ বিচারালয়ের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। তোমার সাধ্য কি যে, নির্দ্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া পরিত্রাণ পাইবে! সাবধান দারোগা সাহেব! একবার ভগবানকে স্মরণ কর, ধর্ম্মকে বিস্মৃত হইও না; নিরাশ্রয়া দুঃখিনী বিধবার প্রতি অত্যাচার করিতে অগ্রসর হইও না। ধর্ম্ম জগৎব্যাপ্ত হইয়া ভগবানের মহিমা ঘোষণা করিতেছে, আমাদের দেবতা সদৃশ রাজার আইন শাসন উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্দ্ধন, এমন কি, দরিদ্রা নিরাশ্রয়া, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য বিহ্বলা, অনাথিনী সুরবালার জন্যও অপেক্ষা করিতেছে! তোমার ক্ষুদ্র শক্তির সাধ্য কি যে, এই সমস্ত অসীম শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পার। তোমার এই ঘৃণিত কলঙ্ক কাহিনী ঊর্দ্ধতন সদাশয় রাজ-কর্ম্মচারি, উচ্চহৃদয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনর ও দয়ালু রাজ-প্রতিনিধির কর্ণে যে দিন প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের করুণ হৃদয় মথিত করিবে, সে দিন জান কি দারোগা সাহেব, তোমার ক্ষমতার অপব্যবহার, তোমার এই ভীষণ অত্যাচারের প্রতিকার কোন্ কারাগারের নিভৃত অন্ধকারময় গৃহে সম্পন্ন হইবে? তখন যদি বিধির অব্যর্থ-বিধানে তোমার প্রাণ-প্রতিম

সহধর্ম্মিণী—সুরবালার ন্যায় নিরাশ্রয়া অবস্থায় পতিত হয়, আর তোমার ন্যায় কোন নির্ম্মম হৃদয় এইরূপে অত্যাচার করিতে অগ্রসর হয়, তখন তোমার সহধর্ম্মিণী যাঁহার শরণাপন্ন হইয়া কাতরে প্রার্থনা করিবে, সুরবালাও আজ উদ্যান-কুটীরের দ্বারদেশে বসিয়া তাঁহাকে প্রাণপণে ডাকিতেছে! তোমার সাধ্য কি দারোগা সাহেব, যে আইনের দোহাই দিয়া সুরবালাকে পাপিষ্ঠ শশিভূষণের বিলাস উদ্যানে লইয়া গিয়া তাহার লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত জন্মাইতে পার! তুমি রাজার দোহাই দিয়া—রাজ-ক্ষমতার অপব্যবহার করিবার জন্য নরাধম শশিভূষণের প্ররোচনায় ও প্রলোভনে কিরূপ জঘন্য ঘৃণিত কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছ, তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? একবার ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া, হিমালয় সদৃশ শুভ্র পবিত্র রাজার শাসন-বিধির দিকে সতর্ক নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া ভাব দেখি, এই কার্য্যের পরিণাম কি? তোমার অন্তরাত্মা কি কম্পিত হইতেছে না দারোগা সাহেব? চোর বলিয়া গ্রেপ্তারের অছিলায় অনাথিনী নিরাশ্রয়া বিধবা সুরবালাকে ভোগবিলাসে বর্দ্ধিত পাষণ্ড শশিভূষণের উদ্যান-বাটীকায় লইয়া যাওয়াই কি তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে? এই ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিবেক কি তোমার

হৃদয়ে বার বার আঘাত করিতেছে না? ধর্ম্ম ও ঊর্দ্ধে ভগবান আছেন, ইহা একবারেই কি বিস্মৃত হইয়াছ?

রঘুনাথ বাবুর চক্ষু দিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল! ক্রোধ, ঘৃণা ও দুঃখে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। ম্যানেজার বাবুর অবস্থা দেখিয়া পাইক, দ্বারবান ও ভোজপুরি দেউড়ি রক্ষকগণ রোষ-কষায়িত-লোচনে দারোগার মুখের দিকে চাহিয়া দন্ত কড়মড় করিতেকরিতে হস্তে হস্ত নিষ্পেষিত করিতে লাগিল। প্রভুর সম্মান রক্ষার জন্য, রঘুনাথ বাবুর চক্ষুর ইঙ্গিতে এখনই শত শত দ্বারবান, সহস্র সহস্র প্রজা, পাইক ও দেউড়ি-রক্ষকগণ অনর্থ কাণ্ড ঘটাইতে পারে; রঘুনাথ বাবু ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া সকলকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। সকলেই জ্বলন্ত ক্রোধানল বুকে লইয়া স্ব স্ব স্থানে সরিয়া গেল।

দারোগা সাহেব যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। যে যতই নিষ্ঠুর, নির্ম্মম ও পাষণ্ড হউক, ধর্ম্মের কথায় সকলেরই হৃদয় একটু না একটু স্পন্দিত হয়। দারোগার হৃদয় ধর্ম্মের কথায় স্পন্দিত হইতেছিল কি না জানি না, তবে যে একটা সম্মুখ বিপদের আশঙ্কায় দারোগার হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছিল, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

ক্রোধ কম্পিত কলেবরে দারোগা বাবু রঘুনাথ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভিরস্বরে বলিলেন, "বুঝিয়াছি, সহজে তোমরা আসামী গ্রেপ্তার করিতে দিবে না কিন্তু জানিও রঘুনাথ বাবু, তোমার প্রভু ইহার ফল হাতে হাতেই প্রাপ্ত হইবেন।" দারোগা বাবু আর কোনরূপ বীরত্ব প্রকাশ না করিয়া থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরেই সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার কলিকাতার প্রধান কর্ম্মচারির নিকট হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি জরুরি টেলিগ্রাম পাইলেন।

"পাটের ও তুলার গুদামে আগুন লাগিয়া প্রায় দুই লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। টেলিগ্রাম প্রাপ্তে মুহূর্ত্তমাত্র বলম্ব না করিয়া কলিকাতায় আসিবেন।"

সুরেন্দ্রনাথের পিতা পাটের ও তুলার ব্যবসাতেই বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যান। এই দুটি ব্যবসায়ই তাঁহার প্রধান লাভের ব্যবসা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া বিষণ্ণ অন্তরে কাছারি বাটি হইতে অন্দরে শৈলবালার নিকট উপস্থিত হইলেন। শৈলবালা তখন "বিধবার ব্রহ্মচর্য্য" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে বৈধব্য-জীবনে কর্ত্তব্য কি, সুরবালাকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন। স্বামীর বিষাদমাখা মুখচ্ছবি দেখিয়া শৈলবালার অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল! মুহূর্ত্তের জন্য আকুল নয়নে সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি বলিতে যাইতেছিলেন, পারিলেন না। মুহূর্ত্তের পর

মুহূর্ত্ত আর ও কয়েকটা মুহূর্ত্ত অতীত হইয়া গেল। শৈল-বালা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া জড়িত স্বরে বলিলেন, "কেন? কেন—হইয়াছে কি? দেখি, হাতে কি?" শৈলবালা এক নিশ্বাসে টেলিগ্রামটা লইয়া পড়িয়া ফেলিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—দেখিতে দেখিতে আবার কয়েকটা মুহূর্ত্ত শৈলবালার চক্ষের সম্মুখ দিয়া নিমিষে নিমিষে কাল স্রোতের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল; শৈলবালা আর সে মুহূর্ত্ত-গুলাকে দেখিতে পাইল না! হায়! হায়! এমনই করিয়া মানবের সম্মুখ দিয়া নিত্য কত মুহূর্ত্তই চলিয়া যাইতেছে! কেহ গণনা করে না, কেহ একবার মুহূর্ত্ত-গুলার জন্য চিন্তাও করে না, কেহ একবার ভাবিয়াও দেখে না যে, মুহূর্ত্তের সমষ্টি মাত্র অল্পকাল স্থায়ী মানব-জীবনে এই এক একটী মুহূর্ত্তের মূল্য কত? হায় ভ্রান্ত জীব!

শৈলবালা টেলিগ্রামখানা খাম সমেত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া জানালার গরাদের ভিতর দিয়া গৃহ-পশ্চাতে ফেলিয়া দিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ শৈলবালার মুখের দিকে চাহিয়া একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "কাগজখানার উপর অত রাগ কেন?"

"যে আমার প্রশান্তচিত্ত দেবতার মুখখানি এমন ম্লান বিবর্ণ করিয়া দিতে পারে, তাহার অসাধ্য কার্য্য কি আছে? তার উপর রাগ হবে না?

সুরেন্দ্র।—কাগজখানার অপরাধটাই কি তোমার কাছে এত গুরুতর হইল?

শৈল।—উহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। প্রত্যেক অক্ষরগুলা বিষাক্ত, নতুবা আপনার নির্ম্মল হৃদয়ে ঐ অক্ষরগুলার দাগ লাগিবে কেন?

সুরেন্দ্র।—বাস্তবিক শৈল, একটু দাগ লাগিয়াছে, অতগুলি টাকা গেল, ব্যবসায়ও পূর্ব্বের ন্যায় আর হয়ত জোরে চলিবে না।

শৈল।—আপনার মুখে আজ নূতন কথা শুনিতেছি। জগতের কোন্‌টা চিরদিন থাকে, কোন্‌টাই বা চিরদিন সমান চলে?

সুরেন্দ্র।—তোমার কাছে আজি হারি মানিলাম শৈলবালা।

শৈল।—যাহা সত্য তাহাকে মিথ্যার মোহে জোর করিয়া ধরিতে গেলেই হার মানিতে হয়। আপনার কাছেইত আমি শিখিয়াছি যে, অর্থ, সম্পদ, পার্থিব সুখ, স্বাস্থ্য এসব মিথ্যা, এগুলা কিছুই যে স্থায়ী নহে ইহা সত্য।

"আচ্ছা শৈলবালা, তোমারই জয়। আমার হৃদয়

তোমার হৃদয়ের কাছে আজ পরাজয় স্বীকার করিল।” এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ শৈলবালার দক্ষিণ হস্তটি নিজ ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন। শৈলবালা দৌড়িয়া গিয়া উহার আদরের হারমোনিয়মটা বাহির করিয়া আনিলেন।

“না শৈলবালা, গান গাহিয়া আর হৃদয় শান্ত করিতে হইবে না। তোমার একটি কথাতেই হৃদয় শান্ত হইয়াছে। বাস্তবিক সবই যে মিথ্যা। এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ আবার শৈলবালার দক্ষিণ হাতটি ধারণ করিয়া পার্শ্বে বসাইলেন। সুরেন্দ্রনাথ শৈলবালার মুখের দিকে চাহিয়া একটু যেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “এখন কর্ত্তব্যের অনুরোধে আজই কলিকাতা যাত্রা করিয়া দেখিতে হইবে, প্রকৃত ব্যাপারটা কি? কি বল শৈলবালা?”

সব পরামর্শ দিতে পারি কিন্তু এই পরামর্শটা দেওয়া শৈলবালার পক্ষে গুরুতর। চিকিৎসক রোগীর অঙ্গে অকম্পিত হৃদয়ে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারে, কিন্তু নিজের অঙ্গে বসাইবার সময় ভাবে, আরও একদিন পুলটিশটা দিই। রঘুনাথ বাবুকে আজ পাঠাইয়া দিয়া সংবাদ জানিলে হয় না? এই বলিয়া শৈলবালা ছল ছল নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুরেন্দ্র।—ইহার অর্থ এই তোমার যাইয়া কাজ

নাই, যাইলে থাকিতে পারিব না, রঘুনাথকে পাঠাইয়া তোমার ফাঁড়াটা কাটাইয়া দিই।

শৈলবালা হাসিয়া বলিলেন, আমার কথার কদর্থ করিলে আমি নাচার!

তবে সদর্থ এই যে, দুই এক, দিনের বিরহ শৈলবালার হৃদয়ে যেন দুই যুগের অসহ্য যাতনা।"

শৈলবালা তাড়াতাড়ি দক্ষিণ হস্তে সুরেন্দ্রনাথের মুখে ঢাকা দিয়া বলিলেন, সত্য, তামাসা নয়; ম্যানেজার বাবুকে পাঠালে হয় না?"

"আরে ছি ছি! শ্রীমতী শৈলবালার স্বামীকে কাছ ছাড়া হইতে হইবে! এমন কথা লইয়া শৈলবালার সঙ্গে তামাসা!"

শৈলবালা এবার দুই হস্তে স্বামীর মুখ ঢাকা দিয়া বলিলেন, "আগে শ্রীমতী শৈলবালা সাফ্ উত্তর চায়, তাহার স্বামীর পরিবর্ত্তে রঘুনাথ বাবু গেলে এমন কি ক্ষতি হতে পারে?"

"ক্ষতি হইবে না সত্য, তবে এরূপ একটা গুরুতর বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়া ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়। আজ ছয় মাসের অধিক হইল, কারবারের কি হইতেছে, লোকজন কে কি করিতেছে, কিছুই ত দেখা হয় না শৈলবালা?"

সেই দিনেই সুরেন্দ্রনাথ শৈলবালার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শৈল-বালা অতি কষ্টে, নীরবে অশ্রু মুছিতে মুছিতে স্বামীকে বিদায় দিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আর শয়ন-গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন না। শৈলবালার সকলই ভাল কিন্তু সুরেন্দ্র নাথের কোথাও যাইবার নাম হইলেই কান্নাকাটি করিয়া শুভ যাত্রা পণ্ড করিয়া দিতেন। আরও একটি প্রধান দোষ—সুরেন্দ্রনাথ শৈলবালার কাছ ছাড়া হইলে কোন কার্য্যই ঠিক সময়ে সম্পন্ন হইত না; ঝি আসিয়া স্নানাহারের জন্য বার বার অনুরোধ করিলেও শৈল-বালার সে অনুরোধ কর্ণে প্রবেশ করিত না। শৈলবালা কি একটা গভীর চিন্তাকে সঙ্গী করিয়া কালাতিপাত করিতেন। শৈলবালার সেই পবিত্র নির্ম্মল হাসি ওষ্ঠাধরে আর দেখিতে পাওয়া যাইত না, এমন কি, উদ্যান-কুটীরেও শৈলবালা যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। হয় বহু পূর্ব্বে, নয় অনেক বিলম্বে যাইয়া চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেন। সে ধ্যান তাঁহার ঈশ্বর সুরেন্দ্র নাথের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া সমাপন হইত। শৈল-বালার দেবতা সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেহ আছে এটা শৈলবালা হৃদয়কে বিশ্বাস করিতে দিতেন না।

সুরেন্দ্রনাথ আজ সপ্তাহকাল কলিকাতা গিয়াছেন।

প্রত্যহ প্রভাতে শৈলবালা আশা করেন, আজ স্বামীর পত্র পাইবেন, কিন্তু নিত্যই আশা ব্যর্থ হইয়া ব্যাকুলতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। কর্ম্মচারীদের কাছে কোন সংবাদ আসিয়াছে কি না, শৈলবালা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। পরিচারিকা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "না, বাবুর কোন পত্রাদি আসে নাই।" শৈলবালা অধিকতর চঞ্চল ও ব্যাকুলা হইলেন। পরদিন শৈলবালা কলিকাতা যাইবেন স্থির করিলেন।

শৈলবালার কলিকাতা গমনের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন হইয়া গিয়াছে, এমন সময়ে একজন পরিচারিকা শৈলবালাকে একখানি পত্র আনিয়া দিল। চিঠিখানি সুরেন্দ্রনাথের। অন্যান্য কথার পর সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন।

শৈল! যে মর্ম্মে টেলিগ্রাম পাইয়াছিলাম, এখানে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলাম, সে সব সত্য নহে। এখানকার প্রধান কর্ম্মচারী কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহিত মিলিত হইয়া মূলধন আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং নিজেদের বিপদমুক্তির জন্য গুদামে অগ্নি লাগাইয়া খাতাপত্র, বিল, রসিদ ইত্যাদি যাহা কিছু ছিল সমস্তই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। কর্ম্মচারি মহাশয় এক্ষণে চারি লক্ষ টাকার দেনা দেখাইতেছেন।

পাওনাদারেরা বলিতেছেন, সাত দিনের ভিতর সমস্ত টাকা চুকাইয়া না দিলে নালিশ করিবেন। আমাদের খাতা পত্র কিছুই নাই, সুতরাং উঁহাদের টাকা ডিক্রী হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। শৈল! একটা যেন কাল মেঘ আমার মস্তকের উপর ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেতেছে। ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না! তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

পুঃ—আমার চিঠি পত্র না পাইলে চিন্তা করিও না। কারবার ত গিয়াছে, যাউক,—একণে ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে শান্তি পাইতেছি না।

তোমার—সুরেন্দ্র।

শৈলবালা পত্রখানি পাঠ করিয়া অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আমাদের পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ শৈলবালার ন্যায় মূর্ত্তিমতী থাকেন, তবে আজ শৈলবালার হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। শৈলবালা আজ কি কারবারের জন্য ভাবিতেছেন? না। তবে কি অর্থগতপ্রাণ পাওনাদারের দেনার জন্য চিন্তা করিতেছেন? না, তাহাও নহে? শ্বশুরদেবের জীবন ব্যাপী চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমের কির্ত্তীস্তম্ভ স্বরূপ কারবারগুলি অধার্ম্মিকদের পাপচক্রান্তে চিরতরে ডুবিয়া গেল, এইজন্য আকুল প্রাণে কাঁদিতেছেন? না—না! সেজন্য শৈল-

বালার পবিত্র উচ্চ হৃদয় কখন অভিভূত হইতে পারে না! শৈলবালা ভাবিতেছেন, আমি যদি আজ স্বামীর পার্শ্বে থাকিতে পারিতাম, তবে তাঁহার হৃদয়কে এতটুকুও কম্পিত হইতে দিতাম না! শৈলবালা কেবল কাঁদিতেছেন, স্বামীর হৃদয়ের ব্যথা দেখিয়া! সুরেন্দ্রনাথ যদিও সন্তর্পণে, সতর্কে শৈলবালাকে পত্র লিখিয়াছেন, হৃদয়ের অনুমাত্রও কম্পিত ভাবের চিহ্ন যদিও সুরেন্দ্রনাথের পত্র মধ্যে নাই, তত্রাচ সতী পতির হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও ব্যথিত বেদনা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছেন। শৈলবালা মনে মনে বলিতেছেন, চিন্তা কি নাথ! যতই বিপদ আসুক, তোমার দাসী শৈলবালা সেই বিপদ দুঃখ বুক পাতিয়া লইবে, প্রাণ থাকিতে বিপদ দুঃখের ছায়া তোমার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে দিবে না! প্রাণের দেবতা! কেন আমি তোমার সঙ্গে গেলাম না? জানি না, ভগবান স্বামীকে আমার কি পরীক্ষায় ফেলিতেছেন। তুমি অন্তর্যামী প্রভু! সকলই ত জান! আমার স্বামী কখন কাহার উপকার ব্যতীত অপকার করেন না, কেহ সহস্র অপরাধ অনিষ্ট করিলেও স্বামী আমার হাসিমুখে ক্ষমা করেন! আমার নির্দ্দোষী ধর্ম্মপ্রাণ স্বামীর অনিষ্ট সাধন করিতে তাহাদের কি মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয় বিচলিত হইল না? আমার স্বামী মানুষকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, ইহাই কি

তাঁহার অপরাধ? মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করিবে না? মানুষ এতদূর বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে? আমিই ত স্বামীকে যাইতে দিই নাই! স্বামীর কাছে আমিই অপরাধী! আমার দোষেই স্বামী আজ এই বিপদজালে জড়িত! আমার মৃত্যু হয় না কেন? হে ভগবান! আমার স্বামীর চক্ষে অশ্রু দেখিবার পূর্ব্বে আমার যেন মৃত্যু হয়।

শৈলবালা আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, ভূমে লুণ্ঠিত হইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

আমরা এই পরিচ্ছেদ ত্যাগ করিয়া মানবচিত্র সম্পূর্ণ করিব ভাবিয়াছিলাম। "মানবচিত্রে" এই পাপ-চিত্র দেখাইবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না. কিন্তু পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় ভাবিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই ঘৃণাকারজনক পাপ চিত্র চক্ষু মুদিয়া পাঠক পাঠিকা-গণকে দেখাইতে হইল। ক্ষমা করিবেন পাঠক পাঠিকা-গণ! এই পাপ চিত্রের সম্পূর্ণ আবরণ উন্মোচন করিতে আমরা একান্তই অক্ষম, তবে যেটুকু না দেখাইলে নয়, কেবল সেইটুকুই দেখাইব।

পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথের কলিকাতার কারবারের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ। সুরেন্দ্রনাথের পিতা এই পাঁচকড়িকে আপন পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিতেন, পাঁচকড়ির পিতা নিঃস্ব ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন ঘটনা-সূত্রে পাঁচকড়ির পিতার সহিত সুরেন্দ্রনাথের পিতার পরিচয় হয়। পাঁচকড়িকে অতি বুদ্ধিমান ও শান্ত প্রকৃতি দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের পিতা ইহাকে লেখা পড়া শিখাইবার ভার গ্রহণ করেন। সেই দিন হইতেই পাঁচকড়ির বৃদ্ধ পিতা

পুত্রকে সুরেন্দ্রনাথের পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে গৃহে চলিয়া যান। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কোন এক পল্লীগ্রামে।

কিছুদিন পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল। সুরেন্দ্র-নাথের পিতা গঙ্গা-তীরেই পাঁচকড়িকে শ্রাদ্ধাদি করাই-লেন। পাঁচকড়ির জননী বহুদিন পূর্ব্বেই স্বামী পুত্রকে রাখিয়া অনন্তধামে গিয়াছিলেন। দেশে বিষয়াদি বা আত্মীয় পরিজন কেহ ছিল না, সুতরাং পাঁচকড়ি সুরেন্দ্র-নাথের পিতার নিকট লালিত পালিত হইতে লাগিলেন।

পাঁচকড়ি অতি উৎসাহ ও সুখ্যাতির সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম ডিভিজনে পাশ হইল। সুরেন্দ্রনাথের পিতা প্রায় ছয় সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া অতি ধূম-ধামের সহিত পাঁচকড়ির বিবাহ দিয়া কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। পাঁচকড়ি তিনবার চেষ্টা করিয়াও এফ-এ পাশ করিতে পারিল না। সুরেন্দ্রনাথের পিতা একদিন পাঁচকড়িকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা! আর কেন বৃথা প্রয়াস! জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। ব্যবসাদির নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করিবার চেষ্টা কর।" পরদিন হইতেই পাঁচকড়ি কারবারের কাজ-কর্ম্ম দেখিতে লাগিল। এই সময় হইতেই দুষ্ট লোকে বলিত, পাঁচকড়ি কলিকাতার ন্যক্কার-জনক পল্লীতে যাতায়াত করে।

পাঁচকড়ি বুদ্ধিমান ছিল কিন্তু চতুরতা বুদ্ধিমত্তাকেও মাঝে মাঝে নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিত। চতুরতা-গুণে অমায়িক প্রভু ও প্রতিপালকের একান্ত বিশ্বাসী হইয়া উঠিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই পাঁচকড়ি ওরফে পঞ্চু বাবু কারবারের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া পড়িল। কারবারের যাবতীয় কর্ম্মচারী এখন হইতে পঞ্চু বাবুর আদেশের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিত। সুরেন্দ্রনাথের পিতাকে শেষে পঞ্চু বাবু কৌশলে ও চতুরতা-গুণে এতই মুগ্ধ করিয়া ফেলিল যে, চেক, রসিদ, হুণ্ডি ও ব্যাঙ্কের সহিত যাবতীয় আদান প্রদানে পঞ্চু বাবু সত্বাধিকারির ন্যায় সহি করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। পিতার অনুমতি ও ইচ্ছাক্রমে সংসার-আসক্তিহীন, অমায়িক, সরলচিত্ত, ধর্ম্মপ্রাণ সুরেন্দ্রনাথ আজ পর্য্যন্ত এই অধিকার বজায় রাখিয়া নিজ সর্ব্বনাশ নিজেই ডাকিয়া আনিলেন। সুরেন্দ্র নাথের নির্ম্মল হৃদয় অর্থ-সম্পত্তি, ব্যবসার ভিতর ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসিত না। সুরেন্দ্রনাথের উন্মুক্ত প্রাণ ধ্যান, ধারণা, আরাধনা ও ভগবৎচিন্তাতেই সর্ব্বক্ষণ ডুবিয়া থাকিত।

সুরেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুর পর পঞ্চু বাবু কলিকাতার কারবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিল। পাপপঙ্কে একবার ডুবিলে মানুষের উঠিবার শক্তি

থাকে না! মানুষ তখন পশুর অধম হইয়া পড়ে। পঙ্কু বাবুরও তাহাই হইল। যে পাপকার্য্য এতদিন সন্তর্পণে, সতর্কে ও গোপনে সমাধা হইতেছিল, কর্ত্তার মৃত্যুর পর নির্ভয়ে প্রকাশ্যে তাহা সম্পন্ন হইতে লাগিল। পঙ্কু বিস্মৃত হইল তাহার পূর্ব্বাবস্থা, ভুলিয়া গেল তাহার জনক-জননীর দুর্দ্দশার কথা! পঙ্কু বিস্মৃত হইল, তাহার স্বর্গীয় পিতা কি অবস্থায় পুত্রের হাত ধরিয়া তাহার প্রতিপালক ও প্রভুর আশ্রয়প্রার্থী হয়। পঙ্কু ভাবিল না তাহার ধর্ম্ম-প্রাণ প্রভু-পুত্রের কি সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে! পঙ্কুর, একবার মনে হইল না যে, প্রভু-পুত্র বিশ্বাস করিয়া যাহার উপর কারবারের ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছেন, সেই ন্যায়পরায়ণ ভৃত্য তাঁহাকে কি ভীষণ বিপদ-স্রোতে ভাসাইতেছে।

হায় কলিকাতা নগরী! তোমার চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে এরূপ চিত্রকর বুঝি মর্ত্ত্যধামে নাই। যে যতই বিখ্যাত চিত্রকর হউক, কলিকাতার পাপ অন্ধকারময় চিত্র অঙ্কিত করিয়া মানবের নয়ন-সমক্ষে ধরিতে পারে, এমন সাধ্য কাহারও নাই। নিত্য আঁধার রজনীতে এই কলিকাতা নগরীতে যে কত অবর্ণনীয় পাপস্রোত বহিয়া যাইতেছে, তাহার কে সংখ্যা করিতে পারে? কত ধনীর সন্তান, কত জমিদার ও জমিদার-পুত্র, কত শিক্ষিত যুবক,

কত পল্লিগ্রামবাসী মধ্যবিত্তের সন্তান যে এই পাপস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহার কে সংখ্যা করিবে? বলিতেও হৃদয় অস্থির হইয়া উঠে, কত তরলমতি যুবক, কত হতভাগ্য জনক-জননীর অল্পবয়স্ক সন্তান এই পাপস্রোতে গা ভাসাইয়া প্রলোভনের আকর্ষণে প্রজ্জ্বলিত দীপশিখায় পতঙ্গবৎ ঝম্পপ্রদান করিয়া মৃত্যুর পথে দ্রুত ধাবিত হইতেছে! দিবাভাগে কলিকাতার দৃশ্যে যেমন ইহাকে পবিত্র বাণিজ্যের স্থান ও মানবের কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া মনে হয়, রজনীর অন্ধকারে ইহার পাপ দৃশ্যগুলি দেখিলে হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে বজ্র নির্ঘোষস্বরে বলিতে ইচ্ছা করে, কলিকাতার ন্যায় পাপ প্রলোভনের স্থল এজগতে আর কোথাও নাই। রজনীর অন্ধকারে কলিকাতার স্থানবিশেষে বিলাসী ধনিগণের প্রমত্তাবস্থায় বারাঙ্গনা সঙ্গে ঠমকে ঠমকে নৃত্য-হাস্যের ঝঙ্কার-লহরী, কলঙ্কিত হৃদয়ের পাশবিক উচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীতরব কর্ণে প্রবেশ করিলে মনে হয়, কোথায় আমার পবিত্র শান্তিময় শস্য শ্যামলাপূর্ণ পল্লীগ্রাম! তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় দাও। এই পাপ প্রলোভনে মজিয়া ডুবিয়া কত লোক যে পথের ভিখারি হইতেছে, কত বলিষ্ঠকায় বঙ্গীয় যুবক যে নিজ সুস্থ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহকে কুৎসিত পীড়ার লীলাভূমি করিতেছে, কত ধনীর সন্তান পিতৃ-পিতামহের কষ্টার্জ্জিত অর্থ পঙ্কিল

স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া পরিণামে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পথে পথে ক্রন্দন করিয়া বেড়াইতেছে, নিত্য কত সতী রমণীর পবিত্র অশ্রুবারিতে উপাধান সিক্ত হইতেছে, কত জনক-জননী পুত্রকে কুপথগামী দেখিয়া প্রাণের যাতনায় প্রতি-মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছে, কত জ্যেষ্ঠ প্রাণের কনিষ্ঠ সহোদরকে বিষপূর্ণ পাপস্রোতে ভাসিতে দেখিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, তাহার কে সংখ্যা করিবে? যদি কখন কোন হৃদয়বান মহাপুরুষ এই ধরা-ধামে জন্মগ্রহণ করেন, যদি কখন কোন মহাত্মা এই সমস্ত হতভাগ্য ও হতভাগিনীগণকে ধর্ম্মপথের পথিক করিবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে পঙ্কিল স্রোতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বুক পাতিয়া দিতে পারে, তবে হয় ত এই কলি-কাতা নগরীর প্রলোভনময় বিষপূর্ণ পাপস্রোত নিবারণ হইবে! নচেৎ এই সমস্ত নরনারী ও যুবক যুবতীর বুঝি উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। যতদিন কলিকাতা নগরী থাকিবে, ততদিন ইহার বক্ষ হইতে এই পাপ প্রলোভন কেহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না! প্রবল প্রতাপ রাজ-রাজ্যেশ্বরেরও বুঝি ইহা ক্ষমতার অতীত।

পঞ্চুবাবু বহুদিন হইতে একটি বারবণিতার গৃহে যাতায়াত করিতেছে। 'কেবল যাতায়াত নহে, রূপ-মোহে ডুবিয়াছে, মজিয়াছে। পঞ্চুবাবুর এখন নিজের কোন

অস্তিত্ব নাই। অস্তিত্বটুকু বারবনিতার রূপ-মোহে মিশিয়া গিয়াছে। পঙ্কু হাত পা ছড়াইয়া প্রবল-স্রোতে ভাসিয়াছে। পঙ্কু জানে না, ভাবে না, এই স্রোত কোথায় তাহাকে লইয়া যাইবে, পরিণামে কোন্ নরক-রাজ্যের তীরে লইয়া গিয়া পঙ্কুকে একা, নিঃসম্বল, নিরাশ্রয় অবস্থায় ছাড়িয়া দিবে।

এই বারাঙ্গনা কেবল পঙ্কুকে গ্রাস করিয়াছে তাহা নহে, ইতিপূর্ব্বে আরও দুটি জমিদার-নন্দনকে হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া যম-সদনে প্রেরণ করিয়াছে! তাহাদের তপ্ত-আত্মা সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া ঐ দেখ বারাঙ্গনার গৃহ-সম্মুখস্থ রাজপথ হইতে চিৎকার করিয়া বলিতেছে, "ডুবিও না, ডুবিও না! ডাকিনীর রূপ-মোহে ডুবিও না! এই দেখ, আমরা ঐ বিষপূরিত রূপে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি! ঐ পাপিনীর সংসর্গে আমাদের হৃদয় এত কলঙ্কিত হইয়াছে যে, আমাদের মলিন আত্মা ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিতেছে না! আমরা সর্ব্বস্ব হারাইয়া এখন সূক্ষ্ম দেহীর অধম শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি! ঐ শ্রবণ কর, আমাদের সতী, অর্দ্ধাঙ্গিনীদের কাতর ক্রন্দন! আমরা কেবল যে ধন, মান, কুল, ধর্ম্ম, সত্য, ন্যায়, ইহকাল, পরকাল, স্বাস্থ্য, বল, আরোগ্য, খ্যাতি সকলই হারাইয়া আসিয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি তাহা নহে,

আমাদের মুক্তিরও বুঝি উপায় নাই। ঐ শুন; আর এক-জনের সূক্ষ্মদেহ কাতরস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতেছে, "হে বিলাসী ধনির সন্তানগণ! রূপজ মোহ ও রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া এই জঘন্য পাপে লিপ্ত হইও না। আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া এই পাপ পথ হইতে মনুষ্যত্বের পথে ফিরিয়া যাও। কেন তোমরা মানবের পবিত্রদেহ ও অমরআত্মা কলঙ্কিত করিতে আসিয়াছ? তোমরা কি ভাবিতেছ না যে, বারাঙ্গনার সহবাস দ্বারা আপনাদিগকে উহাদের অপেক্ষাও অধম ও হেয় করিয়া তুলিতেছ? হায় অবোধ মনুষত্বহীন মানব! তোমরা কি বুঝিতেছ না যে, এই সব হেয় স্ত্রীলোকের সংসর্গে এরূপ কঠিন শৃঙ্খল পদে পরিতেছ যে, জীবনান্তে সহস্র চেষ্টা করিলেও এই শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারিবে না। তোমরা জানিও, মানবের বাক্য মুখ হইতে নির্গত হইয়া বায়ুতে বিলীন হইয়া গেলেও তাহা নষ্ট হয় না। হৃদয়ের চিন্তা হৃদয়ে বিলীন হইয়া গেলেও তাহার অস্তিত্ব যায় না! বাক্য ও চিন্তারও ছাপ এরূপভাবে হৃদয়ে থাকিয়া যায়, যাহা মরণান্তে স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই বাক্য ও চিন্তারও ফল বৃথা যায় না। চিন্তা ও বাক্যের ছাপ মরণান্তে সঙ্গে সঙ্গে ধাববান হয়, ইহা যখন ধ্রুব সত্য, তখন ভাবিয়া দেখ, এই গর্হিত কার্য্যের ছাপ তোমার সঙ্গে

যাইয়া কিরূপে তোমার অমর মানব-আত্মাকে দগ্ধ করিবে! আজ তোমরা বল, স্বাস্থ্য, আরোগ্য ও ধনমদমত্ত হইয়া আত্মার অকল্যাণের কথা চিন্তা করিতেছ না, এই অপরাধ ভগবানের ন্যায় বিচারে অমার্জ্জনীয়, ইহা নিশ্চয় জানিও। ভাবিয়া দেখ, তোমরা কত ভাল হইতে পার কিন্তু যে পথে তোমরা ভাসিতেছ, ইহার পরিণাম ভাবিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পরিতেছি না! হায়! তোমরা মোহের প্রলোভনে বিলাসস্রোতে ভাসিয়া, জানিয়া শুনিয়া যাহা হারাইতেছ, এঁ সব অমূল্যধন জানি না, আবার কত জন্মের পর ফিরিয়া পাইবে? অথবা এসব ধন আর পাইবে কি না, তাহাও নিশ্চয়তা নাই। তোমরা মনুষত্ব হারাইতেছ, ন্যায় ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেছ, দেহ, বল ও আরোগ্য সকলই ভাসাইয়া দিতেছ, এ সবের আর কি কখন পূরণ হইবে? হইতে পার তুমি ক্রোড়পতির সন্তান! কিন্তু জানিও, অর্থের বিনিময়ে পবিত্রতা আর ফিরিয়া আসিবে না, অথবা হৃদয়ের এই মসীপূর্ণ ছাপও মুছিয়া যাইবে না।

ঐ দেখ, একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান যে জীবিত-কালে কলুষিতা বারাঙ্গনা সংসর্গে ইহকাল পরকাল হারাই-য়াছে, তাহারই সূক্ষ্ম দেহ অপর একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তানকে চারিদিকে চাহিয়া সঙ্কুচিত হৃদয়ে সন্তর্পণে বারা-ঙ্গনা গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কি বলিতেছে

শ্রবণ কর! অনুতপ্ত প্রাণে ব্যথিত সূক্ষ্ম দেহ কাতরস্বরে বলিতেছে, "হে! মধ্যবিত্তের সন্তান! রূপ-মোহে মজিয়া কেন ইহকাল পরকাল হারাইবার জন্য বারাঙ্গনাগৃহে প্রবেশ করিতেছ? এ কার্য্যের পরিণাম বড়ই ভীষণ,—বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। তোমার ন্যায় আমিও একদিন বারাঙ্গনা-রূপে মজিয়াছিলাম, অথবা তাহার হাব, ভাব, ঠমকে ও বিষপূরিত কটাক্ষে এবং কৃত্রিম বাক্‌চাতুরিপূর্ণ ভালবাসাতে আমাকে মজাইয়াছিল। আমাকে এই ন্যক্কারজনক পঙ্কিলস্রোতে ভাসিতে দেখিয়া, আমার অগ্রজ ক্রোধে, দুঃখে ও ঘৃণায় অহরহঃ যন্ত্রণা পাইয়াছেন। আমাকে সুপথে আনিবার জন্য তাঁহার যত্ন, আগ্রহ, চেষ্টা ও করুণাপূর্ণ দৃষ্টি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে! আত্মীয়, বন্ধু, জননীসদৃশা অগ্রজ পত্নীর ও নিজ অর্দ্ধাঙ্গিনীর ব্যথিত প্রাণের তপ্তশ্বাস অহরহঃ আমার মস্তকে আসিয়া পড়িয়াছে, কিছুই গ্রাহ্য করি নাই, কাহারও নিষেধ শুনি নাই, প্রবল পঙ্কিল স্রোতে ভাসিয়াছিলাম। কাহারও করুণ কাতর দীর্ঘশ্বাসে আমাকে বাধা দিতে পারে নাই। গুরুজনদের ব্যথিত দীর্ঘশ্বাসে আজ আমাকে এরূপ দুরবস্থায় উপনীত করিয়াছে যে, কত যুগ-যুগান্তরের পর এই যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিব, তাহা ভগবানই জানেন।

আমাদের পঙ্কু বাবু গাঢ়তম ভাবে এই রূপমোহে

মজিয়াছে এবং তাহার ধর্ম্মপ্রাণ প্রভুকেও দুঃখ অভাব-রূপ মহাসমুদ্রের অতলস্পর্শ সলিলে ডুবাইয়াছে। বারাঙ্গনার সহিত পঞ্চু বাবুর একদিনকার কথোপকথন শ্রবণ করিলেই বুদ্ধিমান পাঠক পঞ্চু বাবু ও ধর্ম্মপ্রাণ সুরেন্দ্র-নাথের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্না রজনীর অর্দ্ধযাম অতীত হইয়া গিয়াছে। এইমাত্র পঞ্চু বাবুর সুহৃদ ও মোসাহেবের দল বারাঙ্গনা ও পঞ্চু বাবুর কর মর্দ্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছে; পঞ্চু বাবু নেশায় ঢুলু ঢুলু নেত্রে পালঙ্কের শুভ্র শয্যার উপর শায়িত! পঞ্চু বাবুর লোচনযুগল জবা-পুষ্পের ন্যায় লোহিতাকার ধারণ করিয়াছে। নানা রংয়ের লেবেলযুক্ত নানা বর্ণের হুইস্কির বোতল ও চপ কাটলেট ইত্যাদি ভোজনাবশিষ্ট খাদ্যগুলি গৃহের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রেতনৃত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পঞ্চু বাবুর স্বর জড়িত, তীব্র বিষ-সদৃশ, তরল পদার্থের কল্যাণে পঞ্চুবাবুর বাহ্যজ্ঞান অর্দ্ধেক তিরোহিত হইয়া গেলেও তাঁহার কলুষিত হৃদয় আজ স্ফূর্ত্তিতে ভরা! পঞ্চুবাবু যখন অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়া তাঁহার প্রণয়িনীর উদ্দেশে ঘৃণিত ভাব ও ভাষার সাহায্যে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিয়াছেন, প্রণয়িনী তখন পঞ্চু-বাবুর একজন যুবা বন্ধুকে বিদায় দিবার ছলে নিম্নতলে

আসিয়া প্রেমালিঙ্গনে পঞ্চুবাবুর প্রেম সঙ্গীতের উত্তর প্রদান করিতেছে।

পঞ্চুবাবু অনেকক্ষণ গুন্ গুন্ করিয়া বিরক্তি পূর্ণ জড়িত স্বরে ডাকিল, "রামচরণ!" পঞ্চুবাবুর জড়িত স্বরে একটু ক্রোধ ও সন্দেহের ভাবও মিশ্রিত ছিল।

রামচরণ বেহারা আসিবার পূর্ব্বেই বারাঙ্গনা উর্দ্ধ-শ্বাসে নিম্নতল হইতে দৌড়িয়া আসিয়া বাবুর পার্শ্বে পালঙ্কোপরি বসিয়া পড়িল।

পঞ্চুবাবু সন্দেহপূর্ণ কটাক্ষে বারাঙ্গনার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় এতক্ষণ ছিলে?"

প্রশ্নমাত্রেই বারাঙ্গনা হাসিতে হাসিতে বলিল—"তোমার বন্ধুটী কি ছাড়ে ভাই! কেবল তোমার সুখ্যাতি ও গুণের কথা শুনাইবার জন্য 'দাঁড়াও' "দাঁড়াও" বলিয়া বিরক্ত করিতেছিল! আমি তাহাকে রাগাইবার ও মন বুঝিবার জন্য যতই তোমার নিন্দা করি, সে ততই ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় আমাকে যেন দংশন করিতে আসে। এরূপ অকৃত্রিম বন্ধু—সরল অকপট সুহৃদ আর কোথাও পাইবে না। সেবারে তোমার পীড়ার সময় যখন তুমি শয্যাগত ছিলে, লোকটা যা করিয়াছে, বোধ হয় আমিও ততদূর করিতে পারি নাই! সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী যে বন্ধু, সেই বন্ধু নামের যোগ্য!

পঞ্চুবাবুর প্রাণটা গলিয়া গেল! ক্রোধ, বিরক্তি, সন্দেহ বারাঙ্গনার একটি বাক্য-কৌশলে,—কপটতা বিজড়িত ফুৎকারে কোথায় উড়িয়া গেল!

পঞ্চুবাবু একবার গবাক্ষের দিকে চাহিয়া বলিল, আহা, কি সুন্দর শুভ্র জ্যোৎস্না যামিনী। হারমোনিয়ম লইয়া একবার তোমার অমিয় কণ্ঠে সেই গানটা গাও ত ভাই!

বারাঙ্গনার হৃদয় এতক্ষণ ত্রাসে দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। পাপ যাহাদের হৃদয়ে আসন পাতিয়া বসিয়াছে, ভয় কেবল তাহাদের জন্যই ভগবান সৃজন করিয়াছেন। কপটতাপূর্ণ বাক্য-কৌশলে নিজেকে জয়লাভ করিতে দেখিয়া বারাঙ্গনা বিষ ভরা হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ গানটা?"

পঞ্চুবাবু ঢুলু ঢুলু নেত্রে জড়িতস্বরে বলিল, "সেই জ্যোৎস্না যামিনী, মধুর বায়ু—"

এইবার ঔষধ ধরিয়াছে ভাবিয়া, বারাঙ্গনা হারমোনিয়মের সুরে সুর মিশাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া, একবার দুইবার তিনবার গানটি গাহিয়া পঞ্চুবাবুর হৃদয় সেই জ্যোৎস্না যামিনীতে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল!

রজনীর তৃতীয় যাম এইরূপ ঘৃণিত, আনন্দেই অতিবাহিত হইল! পঞ্চুবাবুর হৃদয়টি এইবার সম্পূর্ণরূপে

আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে ভাবিয়া বারাঙ্গনা জিজ্ঞাসা করিল, "বরাহনগরের বাগান বাড়িটার যে আজ বায়না হ'বার কথা ছিল?"

পঞ্চুবাবু বলিল, "তোমার দ্বারবান আসিয়া সংবাদ দেয় নাই? বায়না ত হইয়া গিয়াছে।"

"দ্বারবান বলিয়াছিল, তবে কথাটা সত্য কি না তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। কত টাকা দর স্থির হইল?"

"ষাট হাজার টাকা।"

ষাট হাজার টাকার কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইবা-মাত্র পঞ্চুবাবুর হৃদয়টা যেন দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, অন্তরাত্মা শুখাইয়া গেল,—নিবিড় অন্ধকার যেন পঞ্চুবাবুর মুখের উপর জমাট বাঁধিয়া বসিল। বিবেকের তাড়নায় দুই তিনবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া পঞ্চুবাবু একদৃষ্টে বারাঙ্গনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইবার পর পঞ্চুবাবু বলিতে লাগিল;—

"আর আমায় কখন কিছু বলিও না! তোমার একটু হাসি দেখিবার জন্য, তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যাহা মানুষে করিতে পারে না, তাহাই আমি করিয়াছি। প্রভু-পুত্রের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তোমায় দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তি করিয়া দিয়াছি! তোমার তিনখানি

প্রকাণ্ড অট্টালিকার আয় মাসিক পাঁচ শত টাকারও অধিক। তোমার বহুমূল্য জড়োয়া অলঙ্কারের সহিত রাজপত্নীর অলঙ্কারেরও তুলনা হয় না! তোমার কোম্পানির কাগজের সুদ একটি নামজাদা জমিদারের আয়কেও লজ্জা দেয়! তোমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং এই বৃহৎ বাগান-বাটিটি কল্যই তোমায় ক্রয় করিয়া দিব। অগ্য নগদ ষাট হাজার টাকা এটর্ণির হস্তে প্রদান করিয়াছি, কল্যই রেজেষ্টারি হইবে। তুমি আজ অতুল ধনের অধিকারিণী, আমি আজ পথের ভিখারী! কেবল ভিখারী নহি, আমার ন্যায় প্রবঞ্চক, চোর, বিশ্বাসঘাতক বুঝি ভগবানের রাজ্যে আর দ্বিতীয় নাই! ধর্ম্মপ্রাণ প্রভুপুত্রকে, জীবনদাতা অন্নদাতার বংশধরকে নিজ হস্তে দুঃখের অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছি। এই হস্তে ধর্ম্মপ্রাণ প্রভু-পুত্রের চিরতরে সর্ব্বনাশ করিয়াছি—এই কলুষিত হস্তে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের মূলধন ও খাতাপত্র ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছি! অতুল ধনের অধিশ্বর আমার প্রভুপুত্রকে নিজ হস্তে ভিখারির বেশে সাজাইয়া আজ রাজপথে বাহির করিয়াছি! আর তুমি আমায় কি করিতে বল? তোমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছি, আর আমার নিকট কিছু চাহিও না! আর আমার কিছুই নাই! ন্যায়, ধর্ম্ম, ধন, অর্থ, ইহকাল,

পরকাল সকলই গিয়াছে, এখন আছে কেবল এই তপ্ত-প্রাণটুকু! আবার তোমায় পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, আমার কাছে আর কিছু প্রার্থনা করিও না!"

পঞ্চু বাবু সত্য সত্যই বারাঙ্গনার পদতলে পড়িয়া বিবেকের তাড়নায়,—হৃদয়ের যন্ত্রণায় চিৎকার করিতে লাগিল।

আহা, কি কর! কি কর! বলিয়া কপটতার প্রতিমূর্ত্তি বারাঙ্গনা পঞ্চুবাবুকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া নানা হাব, ভাব, কটাক্ষে কত কি, বলিতে লাগিল! দুই এক বিন্দু অশ্রুও বারাঙ্গনার আঁখি-কোণে দেখা গেল! তাড়াতাড়ি গোলাপ জলের বোতল আনিয়া পঞ্চুবাবুর মস্তকে সযত্নে ঢালিতে লাগিল! বারাঙ্গনা পঞ্চুবাবুর মনের অবস্থা সম্যক বুঝিতে পারিলেও ছলনা ও কপটতার প্রতিমূর্ত্তিরূপিণী পঞ্চুবাবুর প্রণয়িনী পঞ্চুবাবুকে নানা ভূমিকাসহকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, অতিরিক্ত মদ্য পানেই মস্তিষ্কে বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, সুতরাং মনটাও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে! বারাঙ্গনা কৃত্রিম ক্রন্দনের সুরে, কপট ক্রোধ ও অভিমানভরে দুই বাহু দ্বারা পঞ্চুবাবুকে বেষ্টন করিয়া বলিতে লাগিল, আমাকে মারিয়া ফেলিলেও আর কখন মদের বোতল গৃহে ঢুকিতে দিব না;—আমি বাঁচিয়া থাকিতে তোমায় মাতাল

বন্ধু-বান্ধবকে আর গৃহে আসিতে দিব না! আমার মাথার দিব্য, আর কখন মদ খাইও না। তাড়াতাড়ি পাখা লইয়া বারাঙ্গনা সজোরে পঙ্কুবাবুর মস্তকে ব্যজন করিতে লাগিল।

হরি! হরি! সব ফুরাইল! যে বিবেক জ্ঞানের ক্ষীণ রেখা পঙ্কুবাবুর নিবিড় আঁধার হৃদয়ে নিমিষের তরে উদিত হইতেছিল, বারাঙ্গনার কপট আদর, সোহাগ, যত্নে সেই পবিত্র বিবেকজ্ঞানের ক্ষীণ রেখাটুকু কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। পঙ্কুবাবু আবার যে তিমিরে সেই তিমিরে! ঐ দেখ, পঙ্কুবাবু বারাঙ্গনার পায়ে ধরিয়া আকুলি বিকুলি করিয়া বলিতেছে, "দাও ভাই! অন্তকার মত আর একটু হুইস্কি দাও, আর চাহিব না।"

এই পাপ দৃশ্য এই স্থলেই শেষ হউক! কলুষিতা-দের মুখ দর্শন করিলেও শরীরের পাপরাশি গর্জ্জিয়া উঠে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুরেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী আমাদের শৈলবালার সম্পূর্ণ পরিচয় পাঠকগণকে এখনও দেওয়া হয় নাই। শৈলবালার চরিত্রের আংশিক পরিচয় পাঠক ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছেন, তাহার পুনরুল্লেখ না করিয়া অবশিষ্ট কথা-গুলি এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিব। শৈলবালার পিতা ভিন্ন-প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত ভিন্নরূপ ছিল। তিনি বলিতেন, কন্যাকে সামান্য লেখা পড়া শিখান অপেক্ষা একবারে লেখা পড়া না শিখানই ভাল। অর্দ্ধ শিক্ষিতা করিয়া পাছে কর্ত্তব্যচ্যুত হন, এই জন্য শৈলবালার লেখা পড়ার প্রতি তিনি সর্ব্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। শৈলবালার পিতা প্রচুর অর্থব্যয়ে উপযুক্ত শিক্ষকগণের হস্তে কন্যার সুশিক্ষার ভার প্রদান করেন। শৈলবালা নবম বর্ষ বয়সের পূর্ব্বেই সুন্দররূপে ইংরাজী ও দেবভাষা সংস্কৃতে কথা কহিতে পারিত। দশ বর্ষ বয়সের সময় শৈলবালাকে অনর্গল শুদ্ধ ইংরা-জীতে কথা কহিতে দেখিয়া, অনেক ইংরাজ-মহিলা স্তম্ভিত হইয়া, শৈলবালার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। দশ

বৎসরের বালিকা শৈলবালা যখন শুদ্ধ ইংরাজীতে অনর্গল কথা কহিত, তখন তাহাকে ইংরাজ বালিকা বলিয়া অনেকেরই ভ্রম হইত। শৈলবালার পিতা শৈলবালাকে লইয়া একবার পশ্চিম ভ্রমণে বহির্গত হন; শৈলবালার বয়স তখন দশ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই। পশ্চিমের বহু তীর্থাদি পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া, শৈলবালার পিতা মধুপুরে কিছুদিন অবস্থান করেন। পিতার হস্ত ধারণ করিয়া শৈলবালা প্রত্যহই সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গত হইয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাইত। ঘটনাক্রমে একদিন শৈলবালার পিতা অন্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, শৈলবালা ডাক্তার বাবুর বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হন। বাঙ্গালায় প্রত্যাগমনকালে শৈলবালা দেখিতে পাইল, একটি ইংরাজ-রমণী সান্ধ্যবায়ু সেবনান্তে দ্রুতগতি বগিগাড়ী হাঁকাইয়া বাংলাভিমুখে ফিরিতেছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার সবেমাত্র ধীরে ধীরে জগৎকে ব্যাপৃত করিবার উপক্রম করিতেছিল। ইংরাজ-রমণীর অসাবধানতা বশতঃ গাড়ীখানি একেবারে শৈলবালার ভৃত্যের উপর আসিয়া পড়িল। করুণহৃদয়া বালিকা শৈলবালা ভাবিল, তাহার ভৃত্যের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। বালিকা শৈলবালা আশঙ্কা, দুঃখ ও ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে ইংরাজ-রমণীকে

তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিল। শৈলবালার তখনকার ভাষা অতি কঠোর ও বৃটিশ-রমণীর সম্মানহানীকর হইলেও, তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন না! অধিকন্তু ব্যথিত ও অত্যধিক লজ্জিত হইয়া সহিসের সাহায্যে শৈলবালার ভৃত্যকে সযত্নে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, সামান্য মাত্র আঘাত না লাগিলেও ভয়ে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরাজ-রমণী আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "বালিকা! সুখের বিষয়, তোমার ভৃত্য কিঞ্চিৎমাত্রও আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই।"

শৈলবালার ক্ষুদ্র হৃদয়ে দুঃখ, ক্রোধ ও অভিমান তখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। শৈলবালা বালিকা-সুলভ ক্রোধ ও অভিমানে আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। ইংরাজ-রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া শৈলবালা বলিল,—"আপনার যদি কিঞ্চিৎমাত্রও মনুষ্যত্ব থাকে, তবে এই ভৃত্যের নিকট বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করুন।"

ইং-রমণী।—তোমার ভৃত্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেই কি তুমি সন্তুষ্ট হও?

শৈল।—আমি সন্তুষ্ট না হইলেও ভৃত্য অপমানের কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ লইল বুঝিবে।

ইং-রমণী।—তোমার ভৃত্যকে গাড়ী চাপা দিয়া কষ্ট দিবার বা অপমান করিবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

শৈল।—ইচ্ছা না থাকিলেও এই গর্হিত কার্য্যের জন্য একমাত্র তুমিই দায়ী!

ইং-রমণী।—বালিকা! তুমি জানিয়া রাখ, এই স্থানের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নীর সহিত ভদ্র ব্যবহারের পরিবর্ত্তে তাঁহার সম্মানের হানি করিতেছ, কিন্তু বালিকা বোধে ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী এখনও ক্ষমা করিতেছেন।

শৈলবালা নির্ভিক ও সহজ ভাবে ক্ষুদ্র হাত দুখানি ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নীর মুখের দিকে তুলিয়া উত্তর করিল,—দোষী ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নীর কাছে নির্দ্দোষী শৈলবালা ক্ষমা চাহিতে কখন প্রস্তুত নহে।

ব্যাপার কোথায় যাইত কেবল এই ঘটনাটুকুতে বুঝা সহজ নহে! শৈলবালার বাঙ্গালায় ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া, ডাক্তার বাবু বহুপূর্ব্বেই কন্যার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি দূর হইতে শৈলবালার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সেই স্থলে দৌড়িয়া আসিলেন। শৈলবালার পিতা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নীকে চিনিতেন। বুদ্ধিমান ডক্তার বাবু দুই চারি কথা শুনিয়াই ঘটনাটি সম্পূর্ণভাবেই বুঝিয়া লইলেন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নীকে সান্ত্বনা করিবেন কি তেজস্বিনী বৃটিস রমণী বলিকার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, 'বাবু!

তোমার বালিকা কন্যার দয়া, সৎসাহস, আত্মসম্মান-জ্ঞান ও ভৃত্যের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমি আজ চারি বৎসর ভারতবর্ষে থাকিয়া বাঙ্গালীর প্রতি যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলাম, তাহা আজ অন্তর্হিত হইয়া গেল। তোমার বালিকা কন্যা আমাকে যে শিক্ষা প্রদান করিল, তাহা জীবনে কখন বিস্মৃত হইব না এবং বালিকা এই বয়সেই কিরূপে বিদেশী ইংরাজী ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিল, স্বদেশে ফিরিয়া গেলেও এ কথা বিস্মৃত হইতে পারিব না। পরদিনে বালিকাকে একবার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাঙ্গালায় লইয়া যাইবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী ডাক্তার বাবুকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার বাবু ধন্যবাদের সহিত দুঃখিত ভাবে জানাইলেন, অনিবার্য্য কারণ বশতঃ অদ্য রাত্রেই মেলট্রেনে তাঁহাদিগকে কলিকাতা যাইতে হইবে।

শৈলবালা কেবল যে বালিকাকালে আত্ম সম্মান-জ্ঞান, সৎসাহস, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে। পিতা ও শিক্ষকের জ্ঞানোপদেশে বালিকা-কাল হইতেই শৈলবালা অপার করুণাময় ভগবানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। পিতার উপদেশে বালিকা কাল হইতেই শৈলবালার

ভগবানের ধ্যান ধারণায় অধিকাংশ সময় অতীত হইত। যে বয়সে বালিকারা ধূলাখেলা করিয়া সময়াতিপাত করে, সেই বয়সে শৈলবালার ক্ষুদ্র প্রাণ ভগবানের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। ইহা শৈলবালার উপযুক্ত গুরুর শিক্ষার ফল।

শৈলবালার পিতার গুরুদেব সংসারত্যাগী চিরকুমার সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কোন দিন অরণ্যবাসী হন নাই। তিনি দেশ-বিদেশে লোকালয়ে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পরোপকারেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ধনীর প্রকাণ্ড অট্টালিকায় তিনি কখন প্রবেশ করিতেন না। যেখানে দীন দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাস, রোগ যাতনার কাতর ক্রন্দন, অনাহারের তপ্তশ্বাস শুনিতে পাইতেন, গুরুদেব সেই স্থলে যাইয়া দেহের রক্তবিন্দু দান করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। সেরূপ ত্যাগী যোগী সংসারে প্রকৃতই বিরল। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী সন্ন্যাসী কদাচ দেখিতে পাওয়া যাইত। কি ইতর কি ভদ্র সর্ব্বদেশে সকলেই তাঁহাকে "গুরু বাবা" বলিয়া সম্বোধন করিত ধনশালী ব্যক্তিরা কত অনুনয় বিনয় করিয়াছেন কিন্তু কেহই তাঁহাদের প্রকাণ্ড অট্টালিকায় "গুরু বাবার" পদ-ধূলি লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি অ।.৷১৫

ভাবে দীনের পর্ণ-কুটীরে উপস্থিত হইয়া নিরাশ্রয় রুগ্ন নরনারীর অশ্রুজল মুছাইয়া দিতেন। তাঁহার সুদীর্ঘ সবল বাহু সর্ব্বক্ষণ দীনের সেবার জন্যই প্রসারিত হইত।

শৈলবালার পিতা একদিন সাশ্রুনয়নে নতজানু হইয়া দেব-সদৃশ গুরুদেবকে বার বার প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, "গুরু ব্রহ্ম! অপার করুণাগুণে আপনি আমার শৈলবালাকে সৎশিক্ষা প্রদান করুন! আপনার কৃপাগুণে অজ্ঞানা বালিকা যাহাতে সংসারের উপযুক্ত পথে গমন করিতে পারে, দেব! আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। অদ্য হইতে শৈলবালাকে আপনার পদে সমর্পণ করিলাম।"

গুরুদেব একবার হো হো রবে হাস্য করিয়া বলিলেন, "সংসারের কোন ঝঞ্ঝাটের আমি ধার ধারি না, আজ আবার নূতন দায়িত্ব আমার মস্তকে কেন?"

"দেব! অধীনের প্রতি আপনার অপার স্নেহ ও করুণা-গুণেই শৈলবালাকে চরণে সমর্পণ করিতে সাহসী হইয়াছি, ভৃত্যের কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিবেন কি?"

শৈলবালার পিতার কাতরতা দেখিয়া "গুরু বাবা"

নির্নিমেষ নয়নে বহুক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া থাকিবার পর শৈলবালার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছ, ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক, তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

গুরু বাবার সম্মতি পাইয়া শৈলবালার পিতার আনন্দাশ্রুতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। পরদিন হইতে "গুরু বাবা" শৈলবালার শিক্ষা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তিনি অহোরাত্র অন্যস্থানে থাকিলেও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আসিয়া শৈলবালাকে ব্যাকরণ, কাব্য, পাতঞ্জল, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ পড়াইতে লাগিলেন। শৈলবালা বালিকা হইলেও তাহার পবিত্র সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে গুরুদেবের সরস সরল উপদেশরাশি ও গীতাদির তাৎপর্য্য হৃদয়ে এক একটি রক্ত-কণিকার ন্যায় মিশ্রিত হইতে লাগিল। শৈলবালা গুরু বাবাকে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। বালিকা-কাল হইতেই গুরু বাবার শিক্ষা, দীক্ষা ও উপদেশে শৈলবালার চরিত্র গঠিত হয়। গুরু বাবার প্রত্যেক বাক্য বেদ-বাক্যের ন্যায় শৈলবালা কেবল যে চির জীবন হৃদয়ে জাগরুক রাখিয়াছিল, তাহা নহে; নিজের ক্ষুদ্র জীবন-তরণীখানি গুরুদেবের অনুজ্ঞা-রূপ বায়ু-প্রবাহে সংসারের উত্তাল-তরঙ্গে ভাসাইয়া

দিয়াছিল। কত ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত, বাধা, বিঘ্ন আসিয়াছে, কিন্তু এই তরণীখানিকে কখন ডুবাইতে বা একটু হেলাইতে পারে নাই! উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত কে এই সংসারের ভীষণ ঝড় ঝঞ্ঝাবাতে নিজেকে ঠিক রাখিতে পারে! সংসারে রোগ, শোক, দুঃখ, অভাব, বিষাদ-রূপ ঝড় ঝঞ্ঝাবাতে জীবন-তরণী কয়জন সুনির্দ্দিষ্ট পথে চালাইতে পারে? কোন তরণী বিপথ-গামী হয়—কোনটী বা উত্তাল তরঙ্গে মগ্ন হইয়া তাহার অস্তিত্বটুকু বিলুপ্ত হইয়া যায়, কোনটা চড়ায় লাগিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কোনটা আবার গন্তব্য পথ চিনিতে না পারিয়া অপথ কুপথে ঘুরিয়া মরে! কাহার সাধ্য উপযুক্ত গুরু ও গুরু-কৃপা ব্যতীত এই সংসার-উত্তাল-তরঙ্গে জীবন-তরণী ভাসাইয়া প্রেমময়ের রাজ্যে যাইয়া লাগাইতে পারে?

উপযুক্ত গুরুর কৃপায় ও শিক্ষাগুণে শৈলবালার হৃদয়ের প্রত্যেক সৎবৃত্তিগুলি যথাযথরূপে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। শৈলবালা গুরু বাবার সহিত দুইবৎসর কাল নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। গুরু বাবার উপদেশে শৈলবালার হৃদয়-বল দিন দিন যেরূপ অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার শারীরিক বল তদপেক্ষা ন্যূন ছিল না! শৈলবালা দয়া, দাক্ষিণ্য,

সৎসাহস, হৃদয়বল, শারীরিক সামর্থ্য, স্বামিভক্তি, কর্ত্তব্য-জ্ঞান প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে গুরু বাবার কৃপাতেই লাভ করিয়াছিল।

গুরু বাবা শৈলবালাকে প্রত্যহ উপদেশচ্ছলে বলিতেন, মা শৈল! সংসারে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হও। সংসারে যাহারা সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, যাহাদের শক্তি, সামর্থ্য, ধর্ম্ম-বল অধিক, তাহাদের জয় অনিবার্য্য! ভীরু, দুর্ব্বল, ধর্ম্মবলহীন নরনারী সংসারে কখনও জয়লাভ করিতে পারে না—জগতে কীট-পতঙ্গের ন্যায় নীরবে আসিয়া নীরবেই তাহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে! এই ক্ষুদ্র গুরু বাবার কথা কখন বিস্মৃত হইও না। শৈলবালা! ধর্ম্ম-বল, হৃদয়-বল, সত্য-বল সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের করুণা ব্যতীত কখন লাভ করিতে পারিবে না! তাঁহার করুণা লাভ করিবার জন্য অশ্রুনীরে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দাও! কাতর প্রাণে তাঁহার দয়া ভিক্ষা কর! তিনি অতি দয়াময় শৈলবালা! সরল প্রাণে কাঁদিয়া ডাকিলে সংসারে দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে। যদি কাঁদিতে না পার, যদি তাঁহাকে ডাকিতে না পার, তবে সংসারের পঙ্কিল স্রোতে তৃণের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইবে, তোমার অস্তিত্বটুকু ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে

না। সংসারে নিজের জন্য কিছু করিতে চেষ্টা করিও না। সংসারে যদি কর্ত্তব্য পালন করিতে চাও, তবে পরের জন্য কাঁদিতে এই বালিকা কাল হইতেই শিক্ষা কর। ভগবান পরের জন্যই আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, নিজের জন্য আমাদিগকে সৃজন করেন নাই। যদি নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই তিনি মানবকে সৃষ্টি করিতেন, তবে জগতের অস্তিত্ব থাকিত না! শৈলাবালা, তুমি বালিকা হইলেও তোমার এই সব কথা বুঝিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তাই তোমায় বুঝাইতে চাই। সংসারে জনক-জননী, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-ভগ্নির দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর! সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে ও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলেই ভগবানের উদ্দেশ্য কি এবং আমাদের কর্ত্তব্য কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। স্বামী অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সুখী করিবার জন্য নিজ সুখকে তুচ্ছ করিয়া, অর্থের জন্য নির্জন অরণ্যে প্রবেশ করিতেছে; জলে, অনলে ঝম্প প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত নহে; জনক জননী, পুত্র-কন্যার জন্য হাসিমুখে সর্ব্ব সুখে বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত নহে! সংসারের যত কিছু গর্হিত কার্য্য সাধিত হইতেছে, সকলই পরকে সুখী করিবার জন্য! এই পর-সুখেচ্ছা সংসারের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ আছে! যেদিন এই ইচ্ছা জগৎময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, সেই দিনই ভগবানের ইচ্ছা মানুষ হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারিবে এবং মানুষের কর্ত্তব্য কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিবে। মা শৈলবালা! ভগবানের রাজ্যে প্রত্যেক নরনারী কর্ত্তব্য পালন করিতে বাধ্য। কর্ত্তব্য পালনে পুণ্য নাই, কিন্তু কর্ত্তব্য পালন না করিলে ভয়ঙ্কর পাপে লিপ্ত হইতে হয়! শৈলবালা! ভগবানের কাছে তোমার গুরু বাবা সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনা করিতেছে, সংসারে তুমি যেন কর্ত্তব্য পালন করিতে সক্ষম হও! আসক্তিবশে অথবা সুখ-দুঃখের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার যেন কর্ত্তব্য পালন করিতে আকাঙ্ক্ষা না হয়! ইহা আমার কর্ত্তব্য সুতরাং এই কর্ত্তব্য পালন করিতে আমি বাধ্য। এই কথাটি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক রাখিবে। সুখ-দুঃখ বা লাভ অলাভের চিন্তা হৃদয়ে রাখিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইও না।

এইরূপ ভাবে গুরুবাবা নিত্যই শৈলবালাকে উপদেশ দিতেন এবং উপদেশ দিবার কালে নিত্যই প্রেমাশ্রুতে গুরুবাবার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া যাইত।

গুরুবাবা আরও বলিতেন,—মা শৈল! সাবধান! বিষয়তৃষ্ণায় কখন অধীর হইও না! বিষয়-কীট তোমার পবিত্র হৃদয়কে কখন যেন দংশন করিতে না পারে! ওহো, সে দংশনের কি ভীষণ যন্ত্রণা! সে দংশন-যাতনায় অধীর হইয়া অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ন্যায়, ধর্ম্ম, চক্ষুলজ্জা সকলই

বিসর্জ্জন দেয়। হা অর্থ! হা স্বার্থ করিয়া সংসারে বিষের জ্বালায় তাহারা অকার্য্য কুকার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না! তাহারা ভাবে, চিরদিনের জন্য সংসারে আসিয়াছে ;—মৃত্যু, পরকাল অথবা নশ্বর ধাম ত্যাগ করিয়া আবার কোথাও যাইতে হইবে এ চিন্তা কখন তাহাদের হৃদয়ে উদিত হয় না।

তোমার স্বামীর হৃদয়ে বিষকীট ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে, ইহা যদি কখন জানিতে পার, বৈরাগ্যের পবিত্র বারী সেচনে সেই মুহুর্ত্তেই তাহাকে দূর করিয়া দিবে। আমাকে ধন দাও বলিয়া কখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিও না। সর্ব্বনিয়ন্তার কাছে এই প্রার্থনা বড়ই অকিঞ্চিৎকর প্রার্থনা! কর্ত্তব্য বোধে আসক্তিশূন্য হইয়া এবং সুখ দুঃখকে দূরে রাখিয়া প্রশান্তচিত্তে সংসারে কার্য্য করিয়া যাইবে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে দুঃখ, লাভ ক্ষতি, যাহাই আসুক, হাসিমুখে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবে! সুখ দুঃখে, শোক অভাবে কখন অভিভূত হইও না। ধনশালী ব্যক্তি বা তাঁহাদের গৃহিণীর সংসর্গ সর্ব্বদা ত্যাগ করিবে! ইহাদের সংসর্গে সংক্রামক বিলাস-ব্যাধি অলক্ষিতে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তোমাকে আক্রমণ করিতে পারে! মা! ধনশালী ব্যক্তিদিগকে আমি বড়ই ভয় করি। তবে যদি তাহাদের কাহাকেও সৎপথে

আনিবার জন্য তাহাদের সংসর্গে যাইতে হয়, বৈরাগ্য বিবেকের পবিত্র উজ্জ্বল জ্যোতিঃ হৃদয়ে জ্বালাইয়া সেই ভীষণ স্থানে গমন করিবে। সংসারে কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য কর্ম্ম হইতে কখন বিশ্রাম লাভ করিবে না! শরীর ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আহার নিদ্রার সময়টুকু সংক্ষেপ করিয়া পৃথক রাখিবে, কিন্তু অবশিষ্ট সময় ভগবানের দিকে চাহিয়া, জগতের ও নিজ আত্মার উন্নতির জন্য সর্ব্বদা সৎকার্য্যে ব্যয় করিবে। কর্ম্ম যেন তোমার মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সঙ্গের সাথী হয় এবং পরলোকেও যদি আত্মার কার্য্য থাকে, তবে তোমার অমর আত্মা সেখানেও যেন বিশ্রাম লাভ না করে। ভগবানের সৃষ্ট সকলই! তাঁহারই সৃষ্ট বস্তু ভোগ ও পান ভোজন করিয়া আমরা জীবিত আছি! জল ও বায়ু তিনি যদি সৃজন না করিতেন, এক মুহূর্ত্তও আমরা বাঁচিতে পারিতাম না! এজন্য সেই দয়াময়ের সমীপে প্রতি মুহূর্ত্তে ভক্তিচিত্তে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে, বিশ্বরাজ্যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের উপকার ও ভক্তির সহিত সরল প্রাণে তাঁহার প্রার্থনা ব্যতীত তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইবার আর অন্য উপায় আছে বলিয়া এই অধম "গুরু বাবা" তাঁহার দেব সদৃশ গুরুদেবের কাছে কখন শ্রুত হয় নাই। ভাবিয়া দেখ, তিনি কত মহৎ, কত দয়ালু, কত উচ্চ, কিরূপ সর্ব্বশক্তিমান! আমাদের

ক্ষুদ্র হৃদয়ের সাধ্য কি, যে তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি,—তাঁহার প্রদত্ত জীবের সুখ দুঃখের বিচার করিতে পারি! তাঁহার অপরূপ মহিমা, অনির্ব্বচনীয় দয়া স্মরণ পূর্ব্বক নীরবে অজস্রধারে অশ্রুত্যাগ ব্যতীত তাঁহাকে কিরূপে আর কৃতজ্ঞতা দেখাইব,—কিরূপেই বা প্রার্থনা করিব?

গুরুবাবা আর বলিতে পারিতেন না—ভগবানের অপার করুণা স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে অজস্রধারে রোদন করিতেন—শৈলবালা ভক্তিগদগদচিত্তে "কোথায় আছ দয়াময়, করুণাময়, সর্ব্বশক্তিমান প্রভু তুমি" বলিয়া গুরু-বাবার চরণতলে বসিয়া রোদন করিতে থাকিত! শৈল-বালার বালিকাকালের শিক্ষা, গুরুবাবার চরণতলে বসিয়া এইরূপেই সমাপ্ত হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"কেন বোন্ তুমি মৃত্যু-কামনা করিতেছ, তোমার অভাব কি? অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী তুমি, শত শত দাস-দাসী তোমার মুখের একটি আদেশের জন্য উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, আর তুমি দীনহীনার ন্যায় অহোরাত্র নীরবে অশ্রু ত্যাগ করিতেছ! অহোরাত্র এরূপ মনোকষ্ট ভোগ করিলে আর ক'দিন বাঁচিবে?"

"বাঁচিয়া আর সুখ কি গৌরি? অতুল ঐশ্বর্য্য, দাস-দাসীই আমার সুখের কণ্টক হইয়াছে? তুই ত কতদিন আমাকে কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিস্, সুখ ধনে নয়, মনে?

"সে যা'হক, তুই সমস্ত দিনের পর এই সন্ধ্যাবেলা পথ ভুলে কেন এখানে এলি বল্ দেখি?"

"তবে এই চল্লুম।"

"তাই ভাল! এখনই যা'! সব সুখ অতল জলে নিক্ষেপ করিয়াছি, তোর সঙ্গসুখটুকু গেলেই এখন আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। নিবীড় অন্ধকার রজনীতে ক্ষীণ বিদ্যুৎ-রেখা কেবল পথিকের চক্ষে ধাঁধা লাগায়!"

কৃত্রিম অভিমানভরে যুবতী চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। অপরা যুবতী তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া ক্রোড়ের কাছে বসাইল।

কয়েক মুহূর্ত্ত উভয়েরই নীরবে অতীত হইয়া গেল। প্রথমা যুবতী বিষাদমাখা স্বরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "গৌরি! তুই অতুল ঐশ্বর্য্য, দাস-দাসীর কথা বলছিস্? এই সমস্ত যদি আমার না থাকিত, যদি আমাদিগকে উদরান্নের জন্য চিন্তা করিতে হইত, তাহা হইলে আমি সুখী হইতাম। ইহাপেক্ষা স্বামী সহ বৃক্ষতলে বাসও যে সুখের গৌরি! যদি এরূপ ধন-সম্পদ না থাকিত, যদি অগণিত দাস-দাসী আমাদের একটি আদেশের অপেক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া না থাকিত, তাহা হইলে আজ আমার হৃদয়ের দেবতা এরূপ বিপথগামী হইবেন কেন? আমার দেবতাকেই বা কি দোষ দিব গৌরি? সেকাল আর নাই। কালের পরিবর্ত্তনে লোকের মতি-গতিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন সকলেই চায় সুখ। কিন্তু প্রকৃত সুখ কি তাহা কেহ হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করে না! বিশেষতঃ, ধনী সন্তানেরা জীবনের উদ্দেশ্য একবারে ভুলিয়া যায়। প্রচুর অর্থ-সম্পদ অহরহঃ তাহাদিগকে নিরয়গামী করিবার চেষ্টা করিতেছে;—সময় তাহাদের কাটিতে চায় না;—কিরূপে

সময় অতিবাহিত করিতে হয়, তাহাও তাহারা জানে না; সুতরাং পতঙ্গের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত অনলে ঝম্প প্রদান করিয়া কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে রত হয়। আমার স্বামীকে যদি উদরান্নের জন্য চেষ্টা করিতে হইত, যদি পরিশ্রমলব্ধ অর্থ সংসার প্রতিপালনের সহায়তা করিত, তবে কি স্বামীর এই দুরবস্থা দেখিয়া আমাকে রোদন করিতে হইত গৌরি? বিপদ ও দারিদ্র্য ভগবানকে বিস্মৃত হইতে দেয় না, কিন্তু অর্থ-সম্পদের এমনই মাদকতা-শক্তি যে, ভুলিয়াও একবার ভগবানকে মনে করিতে দেয় না।"

বসনাগ্রে মুখ ঢাকিয়া যুবতী প্রাণের যাতনায় ক্রন্দন করিতে লাগিল।

"ছি বোন! তুমি যদি দিন দিন এরূপ কর, তবে আর আমি তোমার কাছে আসিব না।"

যুবতী তাড়াতাড়ি অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া দুই বাহুলতা দ্বারা প্রথমা যুবতীকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

ঐ যে সুগোল গঠনা, গৌরবর্ণা, আলুলায়িত কুন্তলা, পিনোন্নত পয়োধরা, বিষাদিনী ষোড়শী যুবতী অপরা যুবতীর বাহুলতায় জড়িত হইয়া রহিয়াছেন, ইনিই আমাদের শশীভূষণ জমিদারের স্ত্রী—হিরণ্ময়ী। যে যুবতী হিরণ্ময়ীকে বাহুলতায় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, ইহার

নাম গৌরী—হিরণ্ময়ীর সখী। ইহাদের উভয়ের ভালবাসা অকৃত্রিম, নির্ম্মল। প্রকৃতই এরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা জগতে দুর্ল্ভ। গৌরী উপযুক্ত স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী। গৌরী ধনীর কন্যা, ধার্ম্মিক চূড়ামণী, জ্ঞানী, গুণী, কর্ম্মী, জগৎবিখ্যাত যশঃ-গৌরভবিমণ্ডিত মহাপুরুষের পুত্রবধূ! যাঁহার পিতা ধর্ম্মের কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইয়া, ধর্ম্ম-জগতের স্রোত ভিন্নমুখে ফিরাইয়া স্বধামোচিত স্থানে গিয়া বিরাজ করিতেছেন, গৌরির স্বামী নির্ম্মলকান্তি ঘোষ সেই উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান। নির্ম্মলকান্তি ধনী জ্ঞানী, গুণীর জ্যেষ্ঠ সন্তান, পিতৃগুণগ্রামের পূর্ণ মাত্রায় অধিকারী। নির্ম্মলকান্তি সুশিক্ষিত, ধর্ম্মপ্রাণ এবং পিতৃত্যক্ত প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী! কিন্তু তা হইলে কি হয়, নির্ম্মলকান্তির স্বভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। যে ব্যক্তি নির্ম্মলকান্তির হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, নির্ম্মলকান্তির হৃদয় ভিন্ন-ধাতুতে গঠিত। স্নেহধর্ম্ম পদার্থের ন্যায় মানব-ধর্ম্মের সহিত মানব প্রকৃতি ও মানব-হৃদয়ের সহিত নির্ম্মলকান্তির হৃদয় মিশ খায় নাই! নির্ম্মলকান্তি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায়ই চলা-ফেরা করেন, বিষয়-কর্ম্ম দেখেন, সরস তেজস্বী লেখনী দ্বারা নিজ সম্পাদিত সংবাদ-পত্রে লেখনী চালনা করিয়া জগতের ভাব-স্রোতকে ভিন্নমুখে

ফিরাইতে সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাবটি তাঁহার পবিত্র স্বচ্ছ হৃদয়খানি পঞ্চম বর্ষের শিশুর ন্যায়! নির্ম্মলকান্তির এই মহত্ত্ব ও মনুষত্বটুকু জগতের বহু স্থানে অনুসন্ধান করিলেও কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নির্ম্মলকান্তির চরিত্রের এইটুকু যে বুঝিয়াছে, সেই ভক্তি-বিনম্র মস্তকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকে। জগতের লোক নির্ম্মলকান্তিকে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখিয়া থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে! কিন্তু এই সমস্ত গুণরাশীর উপরেও নির্ম্মলকান্তির যে বিশেষত্বটুকু আছে, তাহা সাধারণ লোক-লোচনে ধরা পড়ে না। বহু লোকেই মনে করেন, নির্ম্মলকান্তি ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ও জ্ঞানবীরের উপযুক্ত সন্তান, সুতরাং নির্ম্মলকান্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। অন্য শ্রেণীর লোক মনে করেন, নির্ম্মলকান্তি পবিত্র চরিত্র, ধার্ম্মিক ও সুলেখক, সুতরাং শ্রদ্ধা ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি পাইবার যোগ্য! আর একশ্রেণীর লোক মনে করেন, নির্ম্মলকান্তি পরোপকারী, সুগায়ক, যখন ধর্ম্ম সঙ্গীত হৃদয় স্ফুরিত করিয়া গাহিতে থাকেন, তখন অতি পাষণ্ডেরও ভক্তি-অশ্রু নির্গত হয়, সুতরাং নির্ম্মল-কান্তি হৃদয়ের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পাইবার যোগ্য। নির্ম্মল-কান্তির আশ্রিত ভৃত্য, কর্ম্মচারী ও জমিদারির প্রজারা

মনে করেন, নির্ম্মলকান্তি দয়ার আধার, উপযুক্ত নিরপেক্ষ পিতার নিরপেক্ষ সন্তান। তিনি সুবিচার ও নিরপেক্ষ ব্যবস্থা দ্বারা সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তিনি কেবল যে আমাদেরই ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র তাহা নহে, তিনি আমাদের বংশধরগণেরও চিরদিন ভক্তি, শ্রদ্ধা ও পূজা পাইবার উপযুক্ত প্রভু।

বালকের ন্যায় নির্ম্মলকান্তির সরলস্বভাব! মনের কপাট খুলিয়া বালকের ন্যায় এরূপ ভাবে আর কেহ কথা কহিতে পারে না! এরূপ পিতৃ-পৌরুষ, অর্থ-বল, জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতিতে অধিকারী হইলে মানুষের হৃদয় বিচলিত হইয়া অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া উঠে! কিন্তু গর্ব্ব, অহঙ্কার বা সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষা নির্ম্মলকান্তির হৃদয়কে একমুহূর্ত্ত বিচলিত করিতে পারে না! বালকের ন্যায় সরল হৃদয়ে সঙ্কোচহীন স্পষ্ট কথা কহিতে নির্ম্মলকান্তির মত জগতে কয়টি লোক পারেন, তাহা আমরা অবগত নহি। নির্ম্মল-কান্তির পবিত্র সবল বাহু, নির্ম্মলকান্তির সরস নিরপেক্ষ লেখনী পরোপকারের জন্য যেন সদাই প্রসারিত রহিয়াছে। নির্ম্মলকান্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুকেও নির্ম্মলকান্তি প্রেমালিঙ্গন দান করিতে সদাই উৎসুক! এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়, নির্ম্মলকান্তির ন্যায় পবিত্র হৃদয় জগতে দুর্লভ! কোন পরমহংস মহাপুরুষ

শিশুর ন্যায়. নির্ম্মল হৃদয় লাভ করিবার জন্য বালকদের সহিত ক্রীড়া করিতেন। আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি, নির্ম্মলকান্তিকে পাইলে সেই পরমহংস তাঁহাকে বক্ষে চাপিয়া রাখিতেন। নির্ম্মলকান্তির ন্যায় পরোপকারী জগতে দুর্লভ, সংবাদ-পত্র-সম্পাদক ও নিরপেক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ লেখক অতি দুর্লভ! নির্ম্মলকান্তি জমিদাররূপে দুর্লভ, ধনীরূপে অতি দুর্লভ, নিরহঙ্কারী স্ত্রী-পরিজন-পরিবেষ্টিত গৃহস্থরূপে সুদুর্লভ। নির্ম্মলকান্তি পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক, ভাবুক, লেখক, দেশ সমাজ ও ধর্ম্ম জগতের উন্নতিকামী। নির্ম্মলকান্তি অপর দশজনকে ধর্ম্মে, জ্ঞানে ও আর্থিক উন্নতির আসনে উন্নীত করিবার জন্য মুক্ত প্রাণে, মুক্তহস্তে সদাই সচেষ্ট!

এ হেন উপযুক্ত স্বামীর উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী গৌরী স্বামীর দ্বারা সুশিক্ষিত অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে স্বামীর গুণ-রাশীর অধিকারিণী। স্বামীলাঞ্ছিতা, বিষাদিনী সখী হিরণ্ময়ীর জন্য ধার্ম্মিকা সরল হৃদয়া গৌরী সদাই দুঃখিতা ও চিন্তাক্লিষ্টা!

সখী হিরণ্ময়ী সম্বন্ধে গৌরী ও তাহার স্বামীর নিত্য যে কথোপকথন হয়, তাহার একদিনের কিয়দংশ পাঠ করিলেই গৌরীর হৃদয়-ব্যথার গুরুত্ব পাঠক কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পরিবেন।

রজনী নয় ঘটিকা অতীত হইয়া গিয়াছে। এই মাত্র প্রভুর নাম সংকীর্ত্তন করিয়া গৌরী স্বামী নির্ম্মলকান্তির সহিত একাসনে বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন। কথা-প্রসঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধের কথা উথাপিত হইল। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী কেন, ইহাই নির্ম্মলকান্তি সহধর্ম্মিণীকে বুঝাইতে ছিলেন। গৌরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সখী হিরণ্ময়ীর দুর্দ্দশা আরত আমি দেখিতে পারি না।"

নির্ম্মলকান্তিরও একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস বায়ুকে উত্তপ্ত করিয়া ঊর্দ্ধে বিলীন হইয়া গেল। নির্ম্মলকান্তি বলিলেন, "কি করিব গৌরি! আমার পুরুষকারের দোষ তুমিত দিতে পারিবে না! শশীভূষণকে সুপথে ফিরাইবার আমার সহস্র চেষ্টা হিরণ্ময়ীর প্রবল দুরাদৃষ্ট স্রোতে অন্যদিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে! ভগবানের দয়া ব্যতীত মানুষের হৃদয়ের ক্লেদরাশী ধৌত হইবার নয়, সুরেন্দ্রনাথেরও হইবে না।"

গৌরী।—তবে কি গৌরীকে তাহার স্বামী মহাশয় ইহাই বুঝাইতে চান যে, তিনি একজন ধনশালী বিপথ-গামীকে ন্যক্কারজনক পঙ্কিল স্রোত হইতে ফিরাইতে একান্তই অসক্ত। আমার স্বামীর হৃদয়-বলের প্রভাব ত এত ক্ষুদ্র নহে!

নির্ম্মল।—কেবল তুমি বলিয়া নয় গৌরি! সংসারে

সকল স্ত্রীই নিজ নিজ স্বামীকে অসাধারণ পণ্ডিত, বক্তা, লেখক বা বীর পুরুষ বলিয়া ভাবিয়া থাকে, কিন্তু সে গুণরাশি অনেক স্থলেই অর্দ্ধাঙ্গিনীর অঞ্চলের অন্তরালে ব্যতীত বাহিরে দৃষ্টিগোচর হয় না।

গৌরী।—সেটা অপর স্ত্রীলোকের ভুল হইলেও হইতে পারে কিন্তু আমার যে সে বিষয়ে ভুল হয় না ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

নির্ম্মল।—নিজের ভুলটা ভুল বলিয়াই যদি মানুষ মনে করিত, তবে জগতে পলে পলে এত ভুল হইবে কেন? মনে করিলেও অনেকে স্বীকার করিতে তোমার ন্যায় পশ্চাৎপদ হয়।

"ভুল বলিয়া মনে হইলে স্বীকার না করিয়া মিথ্যাকে হৃদয়ে পোষণ করিব কেন? ইহা যে আমার ভুল নহে, তাহার প্রমাণ দেখাইতে পারি।"

এই বলিয়া গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র ও উচ্চ হৃদয়ের গুণে কত লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে, ইহাই বুঝি তাঁহার দেখাইবার উদ্দেশ্য ছিল। নির্ম্মলকান্তি হাসিতে হাসিতে অর্দ্ধাঙ্গিনীর কোমল টুক্‌টুকে হস্ত দুইখানি ধরিয়া বলিলেন,—

"স্বামীর চরিত্রের আর বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইবে না; একটা কথা শুন।" এই বলিয়া গৌরীকে

ক্রোড়ের কাছে টানিয়া আনিলেন। গৌরী স্বামীর মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন;—দেখিলেন, সেই বালক-সুলভ মুখমণ্ডলে কি এক দিব্য জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। পিতৃ-গৌরব পূর্ণমাত্রায় সন্তানের মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে!

নির্ম্মলকান্তি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ গৌরি! পিতার আশীর্ব্বাদ ও পিতৃপদে যদি আমার ভক্তি থাকে, সেই দেবোপম আদর্শ হৃদয়ের মধ্যে চিরদিন যদি ভক্তিভাবে জাগরুক রাখিতে পারি, হতাশ কোন বিষয়ে কখন হইব না! আমার দেবসদৃশ পিতৃদেব লোককে সুপথে আনিবার জন্য কখন ভৎসনা করিয়াছেন, কখন শীতল স্নেহবচনে অশ্রু ঝরাইয়াছেন, কখন মহান্ উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়াছেন, কখন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নীচের কাছেও তাহাকে সুপথে অনিবার জন্য অজস্রধারে ক্রন্দন করিয়াছেন,—কখন কোমল অন্তরকে কঠোর করিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, পরক্ষণে বুকে চাপিয়া বার বার মুখ চুম্বন করিয়াছেন, তত্রাচ অশক্ত হইলাম, বলিয়া বিরক্ত প্রকাশ করিয়া কখন ক্ষান্ত হন নাই! আত্মজ, আত্মীয়, পরিজন ও আশ্রিতগণের মধ্যে যদি কেহ কখন বিপথগামী হইত, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি পিতৃদেব বিরক্ত হইয়া কখন তাহাকে ত্যাগ করিতেন না! উপদেশ ও

তিরস্কারে দুঃখাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া করযোড়ে তাহাকে সুপথে আনিবার চেষ্টা করিতেন। সে সহিষ্ণুতার—সে শক্তির কণামাত্র কি আমি লাভ করিতে পারি নাই? শশীভূষণকে সুপথে আনিবার সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, হউক, তত্রাচ আমি ক্ষান্ত হই নাই এবং আমার বিশ্বাস, ভগবানের কৃপায় শশীভূষণ নিশ্চয়ই একদিন সুপথ দেখিতে পাইবে।

গৌরী অনিমেষ নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার ধর্ম্মভাবপূরিত তেজোব্যঞ্জক কথাগুলি শুনিয়া ভাবিতেন, এরূপ পবিত্রচিত্ত স্বামীলাভ কয়জন নারীর ভাগ্যে ঘটে? আমার ন্যায় আর ভাগ্যবতী কে আছে? যাহার স্বামী পরোপকারের জন্য প্রশস্ত বক্ষ পাতিয়া রাখিয়াছেন, সেই নারীই জগতে ভাগ্যবতী!

হিরণ্ময়ী অনেকক্ষণ গৌরির বাহুলতায় জড়িত হইয়া রহিলেন। হিরণ্ময়ীর হৃদয়ের অব্যক্ত দুঃখরাশি প্রবল অশ্রুরূপে নয়ন-প্রান্ত দিয়া গড়াইয়া আসিয়া পবিত্র বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল, গৌরী সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন না। অঞ্চলাগ্রে বার বার নিজের নয়নাশ্রু মুছিয়া হিরণ্ময়ীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি কেবল একবার মুছাইয়া দিলেন। বুদ্ধিমতী, স্বামী-সোহাগিনী গৌরী ভাবিতে লাগিলেন, হিরণ্ময়ীকে এখন সান্ত্বনা

প্রদান বৃথা!—স্বামীলাঞ্ছিতা হিরণ্ময়ীর ক্রন্দনই সান্ত্বনা! যে হতভাগ্য স্বামী এমন স্ত্রীরত্নকে চিনিতে পারিল না; এরূপ অফুরন্ত পবিত্র প্রেম, ভালবাসা যে স্বামীর উপভোগ করিবার শক্তি নাই, তাহার সহধর্ম্মিণীর ক্রন্দনই একমাত্র সান্ত্বনার স্থল!

হৃদয়ের পুঞ্জিভূত দুঃখরাশি কতকটা অশ্রুরূপে নির্গত হইবার পর হিরণ্ময়ী গৌরীর বক্ষঃস্থল হইতে লুণ্ঠিত মস্তক উত্তোলন করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—

"ভাই গৌরি! তোর স্নেহবন্ধনে এখনও আমি জীবিত আছি! তোর মুখ না দেখিতে পাইলে এই দুঃখ-ভার এতদিন হৃদয় বহিতে পারিত না, এই দগ্ধপ্রাণ এতদিন হয়ত কোন অজানিত দেশে চলিয়া যাইত।"

"ছি বোন্! অমন কথা বলিস্ না! ভগবান যে অবস্থাতেই রাখুন, আমাদিগকে বুক পাতিয়া তাহা সহ্য করিতে হইবে! নিতান্ত দুর্ব্বলহৃদয়া নারীই দুঃখ বিপদে মৃত্যু কামনা করে।"

"না বোন্! আর সহ্য হয় না! আমি তাঁহার ভাল-বাসা পাইবার প্রার্থী নহি, কিন্তু আমার প্রাণের দেবতার নিষ্কলঙ্ক পবিত্রচরিত্র যদি দেখিতে পাইতাম, সহস্র কষ্ট-কেও কষ্ট বলিয়া মনে করিতাম না! আমি জীবিত থাকিতে বুঝি তাহা হইবার নয়।"

গৌরি হিরণ্ময়ীর অশ্রুজল মুছাইতে মুছাইতে শাস্ত্র-বাক্যের অবতারণা করিয়া কত কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শশীভূষণ টলিতে টলিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। গৌরী শশব্যস্তে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরিচারিকা সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অন্দরের দ্বারে অশ্বযোজিত যানোপরি ভৃত্য প্রভু-পত্নীর জন্য অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। যাইবার সময় গৌরী হিরণ্ময়ীর কানে কানে বলিয়া গেলেন, "স্বামীর পদতলে পড়িয়া নয়ন-জলে তাঁহার পদতল সিক্ত করতঃ হৃদয়ের ব্যথা জানাইতে বিস্মৃত হইও না।"

হিরণ্ময়ী বহুদিনের পর তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য-দেবতা শশীভূষণকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইয়া রোরুদ্যমানাকণ্ঠে কত কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু, একটি কথাও বলিতে পারিলেন না! অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া যাইতেছে, আর হিরণ্ময়ী একদৃষ্টে স্বামীর রক্তজবালোচনের দিকে চাহিয়া আছেন।

শশীভূষণ লাঞ্ছিতা, পতিপদরতা, মূর্ত্তিমতী সতীর পানে একবারও তাকাইলেন না। ত্বরিত হস্তে লৌহ-আলমারির চাবি খুলিয়া কয়েক সহস্র টাকার নোটের তাড়া বাহির করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিলেন।

হিরণ্ময়ী আজ দুই মাসের পর মুহূর্ত্তের জন্য স্বামী-সন্দর্শন লাভ করিলেন, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যেই স্বামী-দেবতা চক্ষের অন্তরাল হইতেছেন। হিরণ্ময়ী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, স্বামীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বিষাদিনী হিরণ্ময়ী বলিলেন, "নাথ, যদি দেখা পাইলাম, আর একটু অপেক্ষা করুন, পা-দুখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লই।"

বৈদেশিক তরল পদার্থের গুণে শশীভূষণের মস্তিষ্ক তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না। শশীভূষণ জড়িতস্বরে টলিতে টলিতে বলিলেন,—

"তুমি যেরূপ বক্তৃতা ঝাড়িতে শিখিয়াছ, কলিকাতার পেষাদার বক্তাদের এইবার বুঝি নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইবে।" এই বলিয়া জমিদার শশীভূষণ সবুট দক্ষিণপদ হিরণ্ময়ীর মুখের কাছে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "শীঘ্র করিয়া দেখিয়া লও বাবা! আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।"

হিরণ্ময়ী ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সবুট চরণের ধূলি মস্তকে মাখাইয়া কৃতার্থ হইলেন।

বাস্তবিক শশীভূষণের তখন অপেক্ষা করিবার অবসর ছিল না। দামোদর নদের বাঁধা ঘাটে সুসজ্জিত একখানি বজরা প্রস্তুত রহিয়াছে। কুলকলঙ্কিনী বারাঙ্গণার

দল তরল পদার্থ উদরস্থ করিয়া বজরা উপরি ঠমকে ঠমকে নৃত্য করিতেছে। মোসাহেবের দল করতালির সহিত 'বাহবা' প্রদান করিতেছে। ভৃত্যবর্গ লোহিত পদার্থ-পূর্ণ বিলাতি বোতলগুলি স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিতেছে। বাবু আসিলেই বজরাখানি নবরঙ্গে মাতিয়া উঠিবে, এ সময় কি শশীভূষণ হিরণ্ময়ীর কাছে অপেক্ষা করিতে পারেন ?

হিরণ্ময়ী রোরুদ্যমানা কণ্ঠে শশীভূষণের পদতলে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন,—"নাথ ! এতদিন আপনার কাছে দাসী কিছুই চাহে নাই, আজ করযোড়ে ভিক্ষা চাহিতেছি, একটু অপেক্ষা করুন ;—দাসীর একটি অনুরোধ রক্ষা করুন।"

বিরক্তিমাখা জড়িত স্বরে শশীভূষণ বলিলেন, "কি বল্‌বে শীঘ্র বল ?"

পতিপ্রাণা সতী হিরণ্ময়ী দুই বাহুলতায় স্বামীকে বেষ্টন করিয়া পালঙ্কের উপর বসাইলেন। স্বামী-পার্শ্বে না বসিয়া হিরণ্ময়ী পালঙ্কতলে বসিয়া নিজ বস্ত্রাঞ্চলে স্বামীর সবুট চরণ দুইখানি মুছাইতে মুছাইতে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। শশীভূষণের হৃদয় তখন নর্ত্তকীর তালে তালে নৃত্য করিতেছিল, সতীর অকৃত্রিম প্রেম ভক্তি, ভালবাসা সে হৃদয়ে স্থান পাইবে কেন ?

শশীভূষণ ক্রোধ-বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "কি বল্‌বে শীঘ্র বল না?"

হিরণ্ময়ী অশ্রুজলে স্বামীর পদযুগল সিক্ত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "নাথ! আজ দুইমাস উদ্যান-বাটীকায় বাস করিতেছেন. দুইমাসের পর যদি দাসী মুহূর্ত্তের জন্য দর্শন পাইয়াছে, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যও পদ-সেবার অধিকারিণী করিয়া নারীজন্ম সার্থক করুন! আমি আপনার সহধর্ম্মিণী;—সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী! আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, মুহূর্ত্তের জন্যও চরণ-সেবার অধিকারণী হইব না?"

শশীভূষণ সক্রোধে বলিলেন, "বৃথা কেন সময় নষ্ট করিতেছ। আর ত কিছু বলিবার নাই, আমি এখন চলিলাম।"

হিরণ্ময়ী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া দুই তিনবার ঢোঁক গিলিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিলেন, "আছে, আরও বলিবার অনেক আছে! স্বামীর অপবাদ-কলঙ্কে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। নাথ! আপনার নিন্দা আর শুনিতে পারি না;—আপনার এই ধন-জন-পূর্ণ শান্তির সংসারে অশান্তির প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়াছে। স্বার্থপর মোসাহেবের দল;—চাটুকার সহচরবৃন্দ কপট সুখ্যাতির শীতল বচনে আপনাকে সন্তুষ্ট করিতেছে বটে কিন্তু প্রত্যেক

প্রজার গৃহে, পথে, ঘাটে, মাঠে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আপনার কলঙ্ক-কাহিনী প্রকাশ করিতেছে। শুনিতে পাই, আপনার অত্যাচারে গরীব প্রজারা যুবতী কন্যা বধূগণকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতেছে। নাথ! বলিতেও হৃদয় ফাটিয়া যায়, আপনার মোসাহেববৃন্দের অত্যাচারে কত প্রজা স্বগ্রাম ছাড়িয়া গ্রামান্তরে বাস করতঃ অহরহঃ আপনার অমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে! আরও নিত্য কত লোকের মুখে কত কথা শুনিতে পাই, উচ্চারণ করিলে আমার দেবতার নিন্দা করা হয়। তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, জীবিত থাকিতে আপনাকে আর অধর্ম্মের পথে যাইতে দিব না! আমার ভাগ্যফলে আজ যদি আপনার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, আর ছাড়িব না! দাসীর কথা রাখুন, অধর্ম্মের পঙ্কিল পথ ত্যাগ করুন। এ পথে সুখ নাই, শান্তি নাই! যেটুকু সুখ বলিয়া মনে করিতেছেন, সেটুকু ভাবি ভীষণ দুঃখের শংখধ্বনি!"

হিরণ্ময়ী স্বামীর পাদুখানি বুকে চাপিয়া ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ীর আকুল-ক্রন্দনে শশীভূষণ বলিয়া উঠিলেন, "পা ছাড়, নচেৎ ভাল হইবে না।"

"জীবন থাকিতে অধর্ম্মের পথে আপনাকে আমি আর যাইতে দিব না।"

শশীভূষণ সজোরে পা ছাড়াইবার চেষ্টা করিলেন, অকৃতকার্য্য হইলেন। তাঁহার ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হিরণ্ময়ীর কাতর অনুরোধ, অজস্র অশ্রুবারি মুহূর্ত্তের জন্যও স্বামীর মন টলাইতে পারিল না! পাষণ্ড মদ্যপায়ী শশীভূষণ নেশাঘোরে ক্রোধোত্তেজিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিতা মূর্ত্তিমতী সতীকে বার বার বক্ষে ও মস্তকে পদাঘাত করিয়া দ্রুত বজরায় গিয়া বসিলেন। কুশিক্ষা প্রভাবে ধনীর গৃহে আজকাল এইরূপ পাষণ্ড শশীভূষণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। হায়! কোথায় সে কাল! যাইবার সময় শশীভূষণ বলিয়া গেলেন, "তুমি না মরিলে আমি আর এ বাটীতে প্রবেশ করিব না।"

সবুট পদাঘাতে পতিপ্রাণা হিরণ্ময়ীর মস্তক ফাটিয়া অজস্রধারে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। হিরণ্ময়ী লুণ্ঠিত মস্তকে করযোড়ে তখনও বলিতেছেন, "ভগবান্, আমার স্বামীকে রক্ষা করুন।" হিরণ্ময়ীর আর কথা বাহির হইল না। ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায়, অতিরিক্ত রক্তস্রাবে ও ক্ষত-যন্ত্রণায় হিরণ্ময়ীর চেতনা লুপ্ত হইল। হিরণ্ময়ী অজ্ঞানাবস্থায় রক্ত স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন।

দাস-দাসীর শুশ্রূষায় হিরণ্ময়ীর যখন জ্ঞান হইল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে জগৎ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠা হিরণ্ময়ী ইঙ্গিতে একটু জল চাহিলেন।

প্রাণ ভরিয়া জল পান করিয়া হিরণ্ময়ী একটু সুস্থ হইলেন। মস্তকের রক্তস্রাব তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্বামীর শেষ বাক্য হিরণ্ময়ীর কর্ণে বারবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রতিধ্বনি ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার বলিতে লাগিল—

"হিরণ্ময়ী না মরিলে তাহার স্বামী আর এ বাটীতে প্রবেশ করিবেন না।"

"আমার মৃত্যুই মঙ্গল!" হিরণ্ময়ী ভাবিয়া ভাবিয়া নিজের মনে শেষ মীমাংসা করিলেন, "আমার মৃত্যুই মঙ্গল। আমার পাপেই বুঝি স্বামীর অবনতি ঘটিতেছে। কি জানি, আমার মৃত্যু হইলেই বা আমার প্রাণের দেবতা সুপথে ফিরিবেন। আত্মঘাতী হওয়া মহা পাপ! হউক পাপ, এ যাতনা আর সহ্য হয় না! পাপই বা হইবে কেন? আমার স্বামীর অনুমতি! তিনিই আমাকে এই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। আমার স্বামীর মঙ্গলের জন্য এই পথ অবলম্বন করিতেছি, ইহাতে পাপ হয় হউক! স্বামীনিন্দা অহরহঃ আর শুনিতে পারি না। যদি স্বামী-পদে অচলা ভক্তি থাকে, যদি অহরহঃ সেই পদ ধ্যান করিয়া থাকি, ইহজন্মে—না হয় পরজন্মে সেই দেব-চরিত্র স্বামী ফিরিয়া পাইব। 'মৃত্যু জীবনের দ্বার' এই শাস্ত্র-বাক্য যদি সত্য হয়, এই পবিত্র দ্বার দিয়াই স্বামীর পবিত্র-

চরিত্র দেখিতে পাইব। তিনিই অনুমতি করিয়াছেন, 'আমি না মরিলে তিনি আর এ বাটীতে প্রবেশ করিবেন না।' কেন তবে দেবতার বাক্য লঙ্ঘন করিব? বাঁচিয়া থাকিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন, মনে মনে কতই রাগ করিবেন। আর না, দেবতার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। বিলম্ব করিয়া পতি-দেবতার অবাধ্য হইতেছি,—তাঁহার অবমাননা হইতেছে, এ পাপ—আত্মঘাতী হওয়া অপেক্ষাও ভীষণ! মা জাহ্নবী! তোর ক্রোড়ে স্থান দে মা!"

হিরণ্ময়ী তাঁহার বিশ্বস্ত দাসীকে ডাকিয়া কানে কানে কি বলিয়া দিলেন। দাসী তৎক্ষণাৎ যাইয়া শশীভূষণের প্রধান কর্ম্মচারীকে প্রভুপত্নীর আদেশ জ্ঞাপন করিল। অন্দরের এই ভীষণ কাণ্ড, শশীভূষণের এই পাশবিক ব্যাপার কয়েকজন দাসী ব্যতীত আর কেহই অবগত ছিল না। পাছে স্বামীর নিন্দা হয়, এই ব্যাপার অন্যের কর্ণগোচর হয়, এজন্য হিরণ্ময়ী পরিচারিকাদিগকে বিশেষ-রূপে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।

রজনী চারিদণ্ডের মধ্যেই প্রভুপত্নীর জন্য নৌকা সুসজ্জিত হইল। বিশ্বস্ত দাস-দাসী ও আসবাব পত্রে পূর্ণ হইয়া তরণী দামোদর-বক্ষে প্রভুপত্নীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী স্বামী-পদ ধ্যান করিতে করিতে তরণীর নিভৃত সুসজ্জিত কক্ষে যাইয়া বসিলেন।

কোন পরিচারিকাই সে কক্ষে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইল না।

প্রধান কর্ম্মচারীকে পরিচারিকা যাইয়া কি বলিয়াছিল জানি না, কিন্তু দাস-দাসী ও কর্ম্মচারিবর্গ সকলেই কথা-প্রসঙ্গে বারবার বলিতেছিল, "কলিকাতায় রাণীমার ভগিনী পীড়িতা তাই তাড়াতাড়ি নৌকায় যাত্রা করিলেন; কলাই প্রত্যাগমন করিবেন।

হিরণ্ময়ী নৌকায় উঠিয়াই মাঝি-মাল্লাকে আদেশ করিলেন, "যতক্ষণ না গঙ্গাবক্ষে তরণী ভাসমান হয়, ততক্ষণ যেন দ্রুতগতিতে তরণী চালনা করা হয়।" মাঝিমাল্লারা ভাবিল, "অদ্য রাত্রেই রাণীমাকে কলিকাতা পৌঁছিয়া দিতে হইবে।" রাণীমার সন্তুষ্টির জন্য ও অতিরিক্ত পুরস্কারের লোভে দাঁড়ি মাঝিরা প্রাণপণ শক্তিতে নৌকা চালনা করিতে লাগিল। তরণীখানি বিদ্যুতবেগে ছুটিতে লাগিল।

হিরণ্ময়ীর সমস্ত যামিনী স্বামীপদ-ধ্যানে অতিবাহিত হইয়া গেল। তিনি স্বামী-চিন্তাতে এতই তন্ময় ছিলেন যে, তাঁহার অনুমাত্রও বাহ্যজ্ঞান ছিল না। একজন পরিচারিকা যাইয়া হিরণ্ময়ীকে বলিল, "মা! গাত্রোত্থান করুন! চারিদিক ফর্সা হইয়া আসিয়াছে, নৌকা আহিরিটোলার ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।"

হিরণ্ময়ীর এতক্ষণে চৈতন্য হইল! বহুমূল্য অলঙ্কারাদি গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া দাস-দাসী ও মাঝি-মাল্লাকে বিতরণ করিলেন। পরে মনে মনে বলিলেন, "স্বামীন্! দাসীর অপরাধ লইবেন না! আপনার আদেশেই জাহ্নবী-বক্ষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছি, পুনরায় যদি নারীজন্ম গ্রহণ করিতে হয়, আপনাকেই যেন দেবতারূপে পূজা করিতে পাই।

"মাগো জাহ্নবি! তোর শীতল বক্ষে ব্যথিত কন্যাকে স্থান দে মা!" এই কথা কয়টি বাহির হইতে না হইতে হিরণ্ময়ী গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। দাস-দাসী মাঝি-মাল্লারা কোলাহল করিয়া উঠিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভৃত্য-বর্গের মধ্য হইতে কোলাহল ও চিৎকার ব্যতীত উদ্ধা-রের কোন উপায় উদ্ভাবিত হইল না। চক্ষের নিমিষে একজন সৌম্যমূর্ত্তি যুবক হিরণ্ময়ীর উদ্ধারের জন্য গঙ্গা-বক্ষে ঝম্পপ্রদান করিল। পরের জন্য নিজজীবন উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইল। কে ঐ যুবক? যুবক ধন্য তুমি! কবে তোমার ন্যায় যুবক বাঙ্গালায় ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব? কবে পরোপকারের বিজয় নিশান তুলিয়া তোমার ন্যায় যুবকের দল বঙ্গের পথে মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইবে? সে দিন কি আসিবে না জগদীশ?

নবম পরিচ্ছেদ

ফাল্গুন মাস, শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী। শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর রাত্রি। রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত প্রায়। কলকলনাদিনী জাহ্নবী-তীরে আহিরিটোলা ঘাটে লৌহ-সোপানোপরি একটি যুবক গভীর চিন্তায় মগ্ন। ঘাট জনমানব-শূন্য। চারিদিকে নৌকাশ্রেণী নঙ্গরের ভারে স্থির নিস্তব্ধভাবে স্বচ্ছ গঙ্গাবক্ষে ভাসিতেছে। স্বচ্ছ আকাশের তারকারাজি কে যেন স্বচ্ছ জাহ্নবী-সলিলে একটি একটি করিয়া ছড়াইয়া রাখিয়াছে। শশধর এক-খানি প্রকাণ্ড হিরক-থালের ন্যায় গঙ্গাবক্ষে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া স্থির নিস্তব্ধভাবে দূর দূরান্তরে ভাসিয়া চলিয়াছে। স্বচ্ছ নির্ম্মল আকাশ জাহ্নবী-সলিলকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের রাজ্যে কি মনোরম অনির্ব্বচনীয় শোভা! যুবক গভীর চিন্তায় বাহ্য-সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেছেন না। ক্ষোভ, দুঃখ, ঘৃণার ভাব যুবকের গম্ভীর মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত। যুবক আজ সংসারের নিকট প্রতারিত হইয়া ভাবিতেছে, সংসার কি প্রকৃতই প্রবঞ্চনার লীলাক্ষেত্র! না—কেবল আমিই প্রতারিত

হইলাম। সংসারে কি সত্য, কৃতজ্ঞতা, বিশ্বাস বলিয়া কোন জিনিষ নাই? তবে এই সব পবিত্র নাম মানুষ মুখে উচ্চারণ করিয়া কলুষিত করে কেন?

আজ একবৎসরকাল যুবক সকলের নিকট প্রতারিত হইয়াও কপর্দ্দকশূন্য পথের ভিখারী হন নাই, প্রতারণাময় সংসারের সহিত তিনি আজ সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন।

যুবক অশ্রুপূর্ণ নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "প্রভো! সংসারে শিক্ষা করিবার আমার অনেক অবশিষ্ট ছিল, তাই কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া আমায় শিক্ষা দিলেন। এ শিক্ষা না পাইলে আমার জীবন অসম্পূর্ণ থাকিত। বুঝিলাম, সংসারে ধর্ম্মজ্ঞানহীন, প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতকের দল অধিক থাকিলেও সকলেই মনুষত্ব বর্জ্জিত নহে। দুই একটি মানুষের হৃদয়ে দয়া, কৃতজ্ঞতা, সত্য, ক্ষমা, ন্যায়, ধর্ম্ম এখনও আশ্রয় করিয়া আছে। তাই এখনও কৃতজ্ঞতা ও দয়া-ক্ষমাদি নাম জগৎ-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায় নাই! আর না প্রভো! আর এ সংসারে থাকিব না! তুমি অশেষ করুণাময়, তাই করুণা প্রকাশে আমায় আজ সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছ। তোমার করুণা না পাইলে হয়ত আমি চিরজীবন আশক্তিবশে এই প্রবঞ্চণাময় সংসারে ডুবিয়া

থাকিতাম। প্রভো! আজ আমি তোমার করুণা উপলব্ধি করিয়া হাসিতে হাসিতে সংসার হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু প্রভো! সংসারের এই সমস্ত কপটাচারি, সত্য ও ধর্ম্মচ্যুত নর-নারীদের কি উপায় হইবে? ইহাদের দুঃখে আমার হৃদয় অহরহঃ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! তোমার পবিত্র, কোমল, করুণামাখা হস্তে ইহাদের হৃদয় ধুইয়া মুছিয়া দাও নাথ!

"প্রভো! সংসারে যাহার কাছে গিয়াছি, সেই প্রতারণা, মিথ্যা ও কপটতার জাল বিস্তার করিয়া লোলুপ দৃষ্টে স্বার্থ সিদ্ধি করিতে আসিয়াছে। তোমার সংসার রঙ্গালয়ে আজ এক বৎসর কাল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানব-চিত্র নয়ন-সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, আমায় গ্রাস করিতে আসিয়াছে। সকলের চরিত্রই এক-ধাতুতে গঠিত;—সেই স্বার্থ, কপটতা, প্রবঞ্চনা। কিন্তু প্রভো! এই শ্রেণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রেণী মানবও দুই চারি জন আছেন, যাঁহাদের হৃদয় দেখিয়া আনন্দে আমি অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। ইহাদের জন্যই এবং ইঁহাদের অনুকরণেই মানব-সমাজ সত্য, ধর্ম্ম, কৃতজ্ঞতা, নিঃস্বার্থ প্রভৃতি উচ্চ পবিত্র বাক্যগুলি স্বার্থসিদ্ধির জন্য এক একবার মুখে উচ্চারণ করে। দুই চারি জনের হৃদয়ে যদি

এই উচ্চ মহৎ প্রবৃত্তিগুলি না থাকিত, তবে সত্য, দয়া, কৃতজ্ঞতাদির নাম জগতে আর শ্রুত হইত না এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্যও কেহ আর এই সমস্ত পবিত্র নাম মুখে উচ্চারণ করিত না! সংসারে সর্ব্বাবস্থায় কার্য্য করিতে আসিয়াছি;—কর্ত্তব্য বোধে কার্য্য করিতে হইবে এবং ইহাই সর্ব্ব-নিয়ন্তার ইচ্ছা জানিয়া, আমি এক বৎসর কাল দুঃখ-বিপদকে সঙ্গে লইয়া সংসারের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া নানা প্রকারের মানব-চিত্র দেখিয়াছি। প্রভো! যদি আমায় এরূপ ভীষণ বিপদ-দুঃখ না দিতেন, তবে আমার অদৃষ্টে কখনই এই সমস্ত সৎ-শিক্ষা লাভ হইত না; আমার শিক্ষা চিরদিনের জন্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। ভগবান অপার করুণাময়! তাই এরূপ ভীষণ বিপদ-দুঃখ মস্তকে বর্ষণ করতঃ আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিবার অবসর দিয়া আমাকে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছ!

"আজ এক বৎসর কাল ঘটনাচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে যাহার কাছে গিয়াছি, সেই ন্যায়, ধর্ম্ম, দয়া, মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া স্বার্থের তাড়নায় গ্রাস করিতে আসিয়াছে! এই সমস্ত মানবের প্রকৃত চরিত্র হিংস্রক রক্ত-লোলুপ ব্যাঘ্র ভল্লুক অপেক্ষাও ভীষণ! ইহারা একবারেই দয়া, ন্যায়, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত! দুই চারি জন হৃদয়-বল,

ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণসম্পন্ন মানবের চিত্র দেখিয়া যেরূপ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি, তদ্রূপ অধার্ম্মিক কঠোরহৃদয় মানবদের চিত্র দেখিয়া এবং তাহাদের হুই-জীবনের অবনতি লক্ষ্য করিয়া হৃদয়-যন্ত্রণায় অধীর হইয়াছি!

"আজ এক বৎসর কাল কেবল দেখিয়াছি,বিচারালয়, বিচারক,—উকিল, ব্যারিষ্টার, মোক্তার—জজ, মুনসেফ, ডেপুটি, দালাল, সাক্ষী, পুলিসকর্ম্মচারি, লেখক, সম্পাদক, গ্রন্থকর্ত্তা,—ব্যবসায়ী, ক্রেতা বিক্রেতা,—ডাক্তার, কবিরাজ, ঔষধ, ঔষধালয়—ম্যানেজার, গোমস্তা কর্ম্মচারি! ইহাঁদের মধ্যে ধার্ম্মিক, সাধু ও দেব-চরিত্রের লোক অনেক আছেন সত্য, কিন্তু অধার্ম্মিকেরও অপ্রতুল নাই।

"সংসার হইতে চির বিদায়ের দিনে প্রথমেই আমার বিচারালয়ের কথা মনে পড়িতেছে! বিচারালয়ের নাম ধর্ম্মাধিকরণ! তুলাদণ্ডে ন্যায় অন্যায়ের এইস্থলে বিচার হইয়া থাকে! সত্যই কি সর্ব্ব সময়ে ষোল আনা ধর্ম্মাধর্ম্ম বজায় রাখিয়া ধর্ম্মাধিকরণে বিচারকার্য্য সম্পন্ন হয়? অসম্ভব! কারণ বিচারক সাক্ষীর মুখে ঘটনা শুনিয়া বিচার করিয়া থাকেন। কাজেই যাহার অর্থ-বল অধিক, অর্থের বিনিময়ে সত্যকে গোপন রাখিয়া সাক্ষীর মুখ দিয়া আদ্যোপান্ত মিথ্যা বলাইতে পারে;—অঙ্গুলি

অঞ্জলি অর্ঘ দ্বারা এটর্ণি, ব্যারিষ্টার উকিলের বৃহৎ উদর-গহ্বর পূর্ণ করিয়া মিথ্যাকে সত্যের পরিচ্ছদে ভূষিত করিতে পারে, অনেক স্থলে—বিচারালয়ে তাহাদেরই জয় জয়-কার! এই জন্য নিঃস্ব ব্যক্তিরা ধর্ম্মাধিকরণের নামে ভয় পায়। বিচারালয়ে সহজেই যদি সুবিচার পাওয়া যাইত—বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, দুর্ব্বল যদি প্রবলের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইত, তবে সাধারণে বিচারা-লয়ের নামে এত ভয় পাইবে কেন?

তবে মাঝে মাঝে ইংরাজ-রাজের সুবিচারে ধূর্ত্ত, প্রতারকগণ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া যদি কঠিন শাস্তি না পাইত, তবে মিথ্যা সাজান-সাক্ষীর সংখ্যা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাইয়া সুবিচারের মহিমা হ্রাস করিয়া ফেলিত।

হায়! কুশিক্ষা-বশে ও জাতীয় ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে ফল্গু নদীর ন্যায় ধর্ম্মহীনতার স্রোত সভ্যতামণ্ডিত হইয়া আমাদের দেশে আদান প্রদানের মধ্য দিয়া কল কল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। এই স্রোত নিবারণের কি কোন উপায় নাই? যুবক ক্ষোভে, দুঃখে মা পতিতপাবনী জাহ্নবীর দিকে চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

যুবক অনেকক্ষণ ব্যথিত হৃদয়ে অশ্রুত্যাগ করিয়া অনিমেষ নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এইবার যুবকের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে

লাগিল! যুবক উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"সংবাদ-পত্র-সম্পাদকগণ! তোমাদের ক্ষমতা অসীম! দেশের ভাব-স্রোত ভিন্নমুখে ফিরাইতে একমাত্র তোমরাই সক্ষম! তোমরা যে আসনে—যে উপদেষ্টার আসনে বসিয়াছ, সে আসন সম্রাটের আসন অপেক্ষাও উচ্চ! সম্রাট তাঁহার প্রজাবর্গকে জয় করিয়া যেদিকে ইচ্ছা চালাইতে পারেন বটে, কিন্তু সর্ব্ব সময়ে প্রজার হৃদয় জয় করিতে পারেন না! অনেক সময় সম্রাটের পরাজিত দুর্ব্বল প্রজা সম্রাটের আজ্ঞা পালন করে, কিন্তু সেই আজ্ঞা তাহাদের হৃদয়ের উপর কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। সংবাদ-পত্র-সম্পাদকগণ! তোমাদের হৃদয় জয় করিবার ক্ষমতা আছে। তোমরা যেরূপ দেশবাসীর ভাব-স্রোতকে ভিন্নমুখে ফিরাইতে পার, তদ্রূপ তাহাদের হৃদয়কেও উচ্চ ভাবে ডুবাইয়া রাখিতে পার। যাহারা স্বার্থের প্রতি চাহিয়া নিরপেক্ষতাকে পদদলিত করিয়া স্বকার্য্য সাধনের জন্য লেখনী চালনা করেন, তাঁহারা যে কেবল এই উচ্চাসনে বসিবার যোগ্যপাত্র নহে তাহা নহে, তাঁহারা দেশের শত্রু। যে ভারত ভূমিকে একদিন সুশিক্ষা ও জ্ঞানধর্ম্মের পবিত্র স্রোতে প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছিল, যে দেশ ত্যাগ, সংযম, নিঃস্বার্থ-পরোপকারের আদর্শ স্থল, যে দেশ ব্রহ্মচর্য্য, সরলতার লীলাভূমি,

সেই দেশ এখন শঠতা, কপটতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, বিলাসিতা, স্বার্থপরতার লীলাভূমি হইয়াছে! এই বিষ-মিশ্রিত পঙ্কিলস্রোত আর কিছুদিন ভারতভূমে প্রবাহিত থাকিলে বিষের জ্বালায় ভারতবাসীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইত! মৃদু বিষ উদরস্থ করিলে যেরূপ ধীরে ধীরে জীবনী-শক্তি হ্রাস করিয়া মানবকে মৃত্যুর মুখে টানিয়া লইয়া যায়, স্বার্থপরতা, বিলাসিতা, প্রবঞ্চনা, প্রভৃতিতে তদ্রূপ ভারতবাসীকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। যাঁহারা স্বার্থকে পদদলিত করিয়া দেশবাসীর ভাবস্রোতকে ভিন্ন মুখে লইয়া যাইবার জন্য লেখনী চালনা করিতেছেন, তাঁহারাই সম্পাদকীয় আসনে বসিবার যোগ্য! আর যাঁহারা জানিয়া শুনিয়া এই পঙ্কিল স্রোতে নিজেও গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন, তাঁহারা সম্পাদকীয় দেবতার পবিত্র আসনকে কলঙ্কিত করিতেছেন! তাঁহারা ছদ্মবেশে দেশের ও দেশের শত্রু!

যে দিন সংবাদ-পত্রের প্রত্যেক স্তম্ভ হইতে গম্ভীর নিনাদে উত্থিত হইবে—যে দিন সম্পাদকগণ কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মত পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনির ন্যায় দেশবাসীকে চমকিত করিয়া বলিতে পারিবেন, "চাহিয়া দেখ দেশ-বাসীগণ! কি পঙ্কিল বিষ মিশ্রিত বিলাসিতা-স্রোতে

তোমরা ভাসিয়া চলিয়াছ, একবার পূর্ব্ব পুরুষগণের রীতি-নীতির দিকে চাহিয়া দেখ! যে দেশ নিত্য পবিত্র সামগানে মুখরিত হইত, যে দেশ ব্রহ্মচর্য্য ও সংযমের আদর্শভূমি ছিল, যে দেশকে মিথ্যা, কপটতার ছায়া মাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই, সেই দেশকে কি ভীষণ পঙ্কিল স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে! একবার স্থির নেত্রে আলোকন কর! আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে পবিত্র সামগানে ভারতভূমি মুখরিত করিয়াছিলেন, সেই গান আবার গাহিতে হইবে, তাঁহারা যে পথে চলিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন, সেই পথ আবার খুঁজিয়া লইতে হইবে,—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পুরাতন স্মৃতি উজ্জ্বল ভাবে অহরহঃ হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিতে হইবে, পুর্ব্বপুরুষগণের পুরাতন রীতি-নীতি সেই পুরাতন আদর্শ অহরহঃ চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া রাখিতে হইবে।

আমাদের ধর্ম্মের দেশ ভারতভূমিকে পূর্ব্বের অবস্থায় আনিবার জন্য;—দেশবাসীকে বিলাসিতার স্রোত হইতে বাঁচাইবার জন্য ধর্ম্ম ভাবে প্রণোদিত হইয়া দৃঢ়তার সহিত লেখনী ধারণ করিবার সময় আসিয়াছে। এ সময় স্বার্থের জন্য অর্থোপার্জ্জনের জন্য যাঁহারা পঙ্কিল স্রোতে ভারতবাসীর সঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া লেখনী চালনা করিবেন, তাঁহারা এই দায়িত্ব-পূর্ণ

আসনে না বসিয়া অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় দেখুন। দেশবাসীকে বুঝাইতে হইবে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অবিরাম লেখনী চালনা করিয়া সংবাদ-পত্রস্তম্ভে প্রাপ্ত মুহূর্ত্তে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে হইবে—"দেশবাসীগণ! তোমরা যে পথে যাইতেছ, যে স্রোতে ভাসিতেছ, সে পথ কণ্টকাকীর্ণ, সে স্রোত অতি মলিন, অতি পঙ্কিল, এই পথে যাইলে, এই স্রোতে ভাসিলে শীঘ্র বা বিলম্বে কেবল যে তোমাদের মৃত্যু নিশ্চিত তাহা নহে, তোমাদের সন্তান সন্ততিদেরও অস্তিত্ব থাকিবে না। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ মুনি, ঋষিগণের কি শান্ত প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি! সে আদর্শ ত্যাগ করিয়া আমরা শক্তি, সম্পদ, বল, আরোগ্য, সত্য, ধর্ম্ম, একে একে সকলই হারাইয়াছি! এখন আমরা রোগ, শোক, জরাগ্রস্ত, জগৎ-বাসীর কৃপার পাত্র; আমাদের পৈত্রিক-সম্পত্তি—সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, পরোপকার, সত্য, অতিথিসেবা। আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি—বেদ, বেদান্ত, গীতা, ভাগবৎ, পাতঞ্জল। আমরা সেই সব পবিত্র পৈত্রিক সম্পত্তি দূরে রাখিয়া সংযমের পরিবর্ত্তে যথেচ্ছাচার;—ব্রহ্মচর্য্যের পরিবর্ত্তে অর্থ ও বিলাসচর্চ্চা,—পরোপকারের পরিবর্ত্তে যেন তেন প্রকারেণ পরের অনিষ্ট করিয়া নিজের উদর-পূরণ। সত্যের পরি-বর্ত্তে অসত্যের আশ্রয়। অতিথিসেবার পরিবর্ত্তে জুড়িগাড়ী,

ইত্যাদির জাঁকজমকে মনোনিবেশ করিয়া জগতের চক্ষে ধূলি প্রদান করিতেছি। জগতের উপকারের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া যাঁহারা চিরকাল নিবীড় অরণ্যে, নিভৃত পর্ব্বতগুহায় বসিয়া বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, হতভাগা আমরা সেই সমস্ত দূরে রাখিয়াছি। যে শাস্ত্রের এক একটি বর্ণ মানবকে মনুষ্যত্বের উচ্চস্তরে লইয়া যায়, সেই সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থের প্রতি এখন আর আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি নাই! ফল-মূলাহারী বিজন কান্তার ও গিরিগুহাবাসী, ঊর্দ্ধরেতা, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের মস্তিষ্ক-প্রসূত শাস্ত্রগ্রন্থাদির পবিত্র মর্ম্ম অবগত হইয়া ভিন্ন দেশবাসী মহাত্মারা স্তম্ভিত হৃদয়ে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের যোগরত সৌম্য মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া আশ্চর্য্যচিত্তে তাঁহাদের পদতলে মস্তক নত করিতেছেন, আর পশ্বাধম আমরা সেই সমস্ত পৈতৃক অমূল্য ঐশ্বর্য্য ক্ষুদ্র বস্তু জ্ঞানে অবহেলা করিতেছি! আমাদের যদি অবনতি না হইবে, তবে আর কোন্ জাতির অবনতি হইবে? আমরা এখন বহুমূল্য হীরকের প্রতি উপেক্ষা করিয়া উজ্জ্বল কাচখণ্ডের জন্য লালাইত! জানি না, কি পাপে—কাহার অভিশাপে দেশবাসীর মতিগতি এরূপ বিপথগামী হইল? আমাদের পিতৃ-পুরুষগণের পবিত্র রক্ত-কণিকা শিরায় প্রবা-

হিত হইতেছে বলিয়াই এখনও আমরা জীবিত আছি, নচেৎ যে বিলাস-স্রোতে আমরা ভাসিয়া চলিয়াছি, এতদিনে আমাদের অস্তিত্বটুকুও থাকিত না! যে জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ সত্যকে রক্ষা করিবার জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, তাঁহাদেরই বংশধর আমরা কয়েকটি রজত মুদ্রার লোভে সত্যকে বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না! ইহাপেক্ষা অধঃপতন আর কি হইতে পারে? পিতৃ-পুরুষগণের পবিত্র রক্তকণিকা বিলাস-ব্যাধিতে দিন দিন যেরূপ দূষিত করিতেছে, উত্তোরত্তর বিলাস-ব্যাধি যেরূপ প্রবল বেগে বঙ্গবাসীকে আক্রমণ করিতেছে, কিছুদিন এইরূপ চলিলে কালে আমরা আর হয়ত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ যোগী ঋষির সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব না!

দেশের এই যে হাহাকার রব—এই রোগাদৈন্য অকাল মৃত্যু, অস্থিচর্ম্মসার নরনারীর বিকট মূর্ত্তি, ইহার মূল কোথায় কেহ ভাবিয়াছ কি? ইহার মূল বিলাসিতা, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যহীনতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে! দৃঢ়তার সহিত লেখনী ধারণ করিয়া ঘোষণা কর—দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক! দেশের ভাবী বংশধরগণ ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম শিক্ষায় দেহমন গঠিত করিয়া সংসারে প্রবেশ করুক! দেখিবে,

রোগ, শোক, অভাব, দুঃখ দারিদ্র্য ভারতভূমি হইতে নিমিষে দূরে পলায়ন করিবে! দেশের হাহাকার রব,—নিজ নিজ সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য মিথ্যা প্রবঞ্চনা একবারে বিরল হইবে! আমাদের সেই পুরাতন শান্তির সংসার, সেই সত্য, ক্ষমা, তেজ, সেই পরোপকারে প্রবল স্পৃহা আবার ভারতভূমে ফিরিয়া আসিবে! আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের চিন্তা-শক্তি, জ্ঞান, ধর্ম্ম এখনও ভারতভূমে অলক্ষিতে কার্য্য করিতেছে, তাই আমরা জীবিত আছি! মহাপুরুষগণ লোক-লোচনের অন্তরালে তাঁহাদের বংশধর ভারতবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তে চেষ্টা করিতেছেন, তাই এই হতভাগ্য জাতি এখনও অর্দ্ধ মৃত অবস্থায় ভারতভূমে বিচরণ করিতেছে; নচেৎ এই বিষাক্ত বিলাস-স্রোতে হাবুডুবু খাইয়া এতদিন অনন্তে মিশিয়া যাইত! যাঁহাদের পিতা, পিতামহগণ অনাবৃত পদে জগৎ হিতের জন্য—জ্ঞান ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য দেশ-দেশান্তরে, বিজন অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন, তাঁহাদেরই হতভাগ্য বংশধরেরা বিলাস-মোহে অভিভূত হইয়া চর্ম্ম পাদুকা ব্যতীত গৃহের বাহির হইতে লজ্জা বোধ করেন! ইহাদের গৃহাভ্যন্তর হইতে যদি হাহাকার রোল না উঠিবে,—ইহাদের অসার শুষ্ক হৃদয়ে যদি শত অভাবের বৃশ্চিক-দংশন না

হইবে, তবে জগৎপাতাকে কে আর মঙ্গলময় বলিতে সাহস করিবে?

যুবক অধীর হইয়া নিজের মনে এইরূপ কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময় পুণ্যতোয়া জাহ্নবীবক্ষ হইতে হাহাকার রব উত্থিত হইল। যুবক চাহিয়া দেখি-লেন, "মা জাহ্নবী! তোর ক্রোড়ে স্থান দে মা!" বলিয়া একটি যুবতী গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। যুবক কয়েক মুহূর্ত্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নৌকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কোলাহল ব্যতীত কেহই রমণীর উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইল না! যুবক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; "জয় জগদম্বে" বলিয়া রমণীর উদ্ধারের জন্য গঙ্গাবক্ষে ঝম্ফ প্রদান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

"তবে সংসারকে লোকে দুঃখের স্থান কেন বলে ভাই? তোমার কল্যকার কথাগুলি আমি সমস্ত রাত্র চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছি, দুঃখ মানুষের নিকট আসিতে চায় না; মানুষই দুঃখকে খুঁজিয়া বেড়ায়। বল দেখি ভাই, এ কথা সত্য কি না?"

"তোমার ধারণা অনুমাত্রও মিথ্যা নহে। দুঃখ যন্ত্রণা কিসে মানুষকে গ্রাস করিবে, ইহাই যেন মানুষ অহরহঃ চেষ্টা করে। মানুষের এমনই ভ্রম—এমনই অজ্ঞানতা যে, অনিবার দুঃখকেই মানুষ সুখ বলিয়া আলিঙ্গন করিতে চায়।"

"তবে কি ভাই মানুষ চিরদিনই এই অনিবার দুঃখকেই সুখ বলিয়া ধরিতে গিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ বলিবে, সংসারে সুখ নাই, কেবলই দুঃখ!"

"না ভাই, তা নয়! গুরুদেব ও তোমার দাদার মুখে যাহা শুনিয়াছি এবং আমি অন্তরের সহিত যাহা বিশ্বাস করি, তাহাই আজ তোমাকে বলিব। যাহাতে প্রকৃত সুখ নাই, তাহাতেই সুখ পাইব ভাবিয়া মানুষ

দুঃখের পশ্চাতে সুখের অন্বেষণে ধাবিত হয়। প্রত্যেক মানুষই আনন্দ চায়। আনন্দ লাভের জন্যই অহরহঃ মানুষের প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে কেন জান? সচ্চিদানন্দের অংশ প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়েই বর্ত্তমান। তাই মানুষ আনন্দ লাভের জন্য ব্যাকুল। কেহ স্ত্রী-পুত্রের মুখ-দর্শনে আনন্দ লাভের ইচ্ছা করে, লক্ষ মুদ্রার উপর কোটী মুদ্রা লাভ করিয়া আনন্দ পায়,—কেহ জুড়ি গাড়ী, মটরে চাপিয়া আনন্দ লাভের ইচ্ছা করে,— রাজ-রাজেশ্বর সম্রাট স্বীয় রাজ্যে রাজত্ব করিয়া সুখী হইতে পারেন না, অন্যের রাজ্য লাভ করিয়া আনন্দ পাইতে চান কিন্তু শেষে তাঁহারা দেখেন, সুখ ও আনন্দ কিছুতেই নাই! ভোগের পরিণামে অবসাদ ও দুঃখ। বারবার—লক্ষ লক্ষ জন্ম প্রতারিত হইয়া মানুষ যখন বুঝিতে পারে, পার্থিব বস্তু উপভোগ করিয়া সুখ ও আনন্দ লাভের আশা বৃথা, তখন তাহাদের হৃদয়ে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হয়। অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যখন পার্থিব সুখেচ্ছা ও বাসনা ভস্মে পরিণত হয়, তখন মানুষের অশ্রু ঝরিতে থাকে। বহুদিন অশ্রু-বারী প্রবাহিত হইলে ভস্মস্তূপ ধৌত হইয়া যায়। যখন বাসনার ভস্মরাশি কণামাত্রও হৃদয়ে থাকে না, তখনই লোকের হৃদয় নির্ম্মল হইয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়।

তখনই মানুষ ভাবে, হায়! সর্পকে রজ্জুভ্রমে বৃথা এতদিন ঘুরিয়া মরিয়াছি! তখন "হা ভগবান করুণাময়! বলিয়া মানুষ রোদন করিতে থাকে! হায়! তখন তাহাদের সম্মুখে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী স্বুবর্ণ মুদ্রা ঢালিয়া দিলে ধূলিকণাপেক্ষা মূল্যবান মনে করে না। তখন তাহারা ভাবে, আমরা দুঃখকে আলিঙ্গন করিয়াছি বলিয়াই দুঃখ পাইয়াছি, নচেৎ ভগবানের রাজ্য অতি সুখের স্থান—আনন্দের আগার! এখানে দুঃখের লেশ-মাত্রও নাই! আনন্দ লাভের জন্যই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। ভগ্নি! প্রকৃতই এই জগৎ অতি আনন্দের স্থান! আমরা সত্য বস্তুকে বুঝিতে না পারিয়া, মনের গুণে কষ্ট পাই! সত্য, সরলতা, দয়া যে জগতে বিরাজ করিতেছে, যে জগৎ ভগবানের সৃষ্ট, সে স্থান কি দুঃখের স্থান হইতে পারে? আমরা জীবন ও মৃত্যুর দ্বার দিয়া অনন্ত কালের স্রোতে কেবল ভাসিতেছি! ভাসিতে ভাসিতে অজ্ঞানান্ধকারে ভাবি, ইহাই বুঝি আমাদের চির আগার! তাই আমরা পার্থিব ক্ষুদ্র লাভ ক্ষতিকে লাভ ও ক্ষতির মধ্যে গণনা করিয়া নিরানন্দ ভোগ করি! আমরা ভাবি না, আমরা সচ্চিদানন্দের অংশ, প্রকৃত আনন্দই আমাদের প্রার্থনীয়! পার্থিব আনন্দই যদি আমাদের চরম আনন্দ হইত,

তবে রাজ-রাজ্যেশ্বর সম্রাট দুঃখের করলে নিষ্পেষিত হইবেন কেন? রাজ-রাজ্যেশ্বর সম্রাটের সম্পদের অভাব নাই, তত্রাচ তাঁহারা আনন্দ পান না কেন? এই স্থানকে চির আগার বলিয়া ভাবিলে কেহ কখন আনন্দ লাভ করিতে পারিবে না! আমরা জন্ম ও মৃত্যুর দ্বার দিয়া অনন্ত কালের স্রোতে ভাসিতেছি, ভাসিতে ভাসিতে সেই সচ্চিদানন্দে লীন হইব, ইহাই যাহারা অহরহঃ ভাবিতে পারে, তাহারাই জানে, সংসার কি সুখের। কেন আমরা নিজের জন্য খাটি, পরের জন্য নিজ স্বার্থ হাসিমুখে বিসর্জ্জন করিতে পারি না কেন? আমরা নরনারী সকলেই যে সেই সচ্চিদানন্দের অংশ! এক স্রোতে ভাসিতেছি, একস্থানে যাইব, সকলেরই এক অবস্থা! পার্থিব জ্ঞানে, পার্থিব চিন্তায়, পার্থিব চক্ষুতে আমরা পরস্পরকে পৃথক দেখি, ইহাই আমাদের দুঃখের মূল কারণ। এই সমস্ত পার্থিব ইন্দ্রিয় যখন অন্তর্মুখিন হইবে, তখনই আমরা বুঝিব, করুণাময়ের সৃজিত জগৎ কি আনন্দের স্থান! আমরা এমন আনন্দ ত্যাগ করিয়া দুঃখে হাহাকার করিতেছি! কি হতভাগ্য আমরা! জাহ্নবী-তীরে ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে দ্বিতল অট্টালিকায় বসিয়া দুইটি যুবতী উপোরক্ত রূপ কথোপকথন করিতেছিলেন। সন্ধ্যাদেবী ধীরে ধীরে ধরাধাম

আচ্ছন্ন করিতেছে দেখিয়া ধীরপদবিক্ষেপে এক যুবতী আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আরাধনার সময় হইয়াছে।" যুবতীটি বিধবা! মুখখানি আনন্দে ভরা! ঋষি-কন্যার ন্যায় মুখের লাবণ্য যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। বিধবার কথায় যুবতীদ্বয় তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া ত্রিতলের একটি নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ত্রিতলের গৃহখানি কি সুন্দর! কি পবিত্র! এক-বার এই গৃহে প্রবেশ করিলে সংসারের শোক-তাপ দূরে পলায়ন করে। ত্রিতলে মাত্র একখানি ঘর। ঘরখানি বেশ প্রশস্ত, এবং অতীব পরিচ্ছন্ন। ত্রিতলের প্রশস্ত ছাদে টবের উপর সারি সারি তুলসীবৃক্ষ! মাঝে মাঝে দুই চারিটি গোলাপ ও বেল গাছের টব। নানাবিধ পুষ্প লতিকায় রেলিংয়ের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া থাকায়, ত্রিতলের ছাদটি কুঞ্জ-কাননের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। এই ছাদের উপর কুঞ্জবনের মধ্যে দাঁড়াইয়া মা পতিত-পাবনী জাহ্নবীর দিকে চাহিলে, মনে হয়, শেষ মুহূর্ত্তে যে এইরূপ কুঞ্জকাননে শয়ন করিয়া মা জাহ্নবীকে দর্শন করিতে করিতে প্রাণ-ত্যাগ করে, সেই ধন্য—সেই ভাগ্যবান! ঊর্দ্ধে উন্মুক্ত আকাশ, সম্মুখে পুণ্যতোয়া ভাগিরথী, লতাবেষ্টিত তুলসীবৃক্ষ-শোভিত কুঞ্জবনে পবিত্র মৃদুমন্দ সমীরণ!

আহা! কি প্রাণারাম স্থান! এই ত্রিতলের ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া সংসার-কোলাহলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হয় না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ত্রিতলের প্রশস্ত গৃহে দুইটী ঘৃত প্রদীপ জ্বলিতেছে। গৃহখানি ধূপ, ধূনা ও গুগ্‌গুলের গন্ধে আমোদিত। কষায় বস্ত্রের অঞ্চল গল-দেশে বেষ্টন করিয়া দুইটি যুবতী ধ্যানমগ্না। ইহাঁদের বুঝি বাহ্যজ্ঞানও নাই! ঊর্দ্ধমুখে, করযোড়ে ধ্যানরতা অপর পার্শ্বে কে এ রমণী? ইনিই সেই পূর্ব্বোক্ত বিধবাযুবতী, সকলের চক্ষেই অশ্রুধারা। অশ্রুধারায় সকলেরই চক্ষের বসন সিক্ত! তিনজনেই যুবতী! তিনজনেরই মুখে সাত্বিক ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইঁহারা ঈশ্বর-প্রেমে,—ভগবানের ধ্যানে,—যোগমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী স্বর্ণ মুদ্রা অথবা রাজরাজেশ্বরের পার্থিব সুখ ইঁহাদের কাছে নগণ্য।

পাঠক! ইঁহাদিগকে কি চিনিতে পারিলেন? ইঁহারা শৈলবালা, হিরণ্ময়ী ও সুরবালা। হিরণ্ময়ী মনোকষ্টে জাহ্নবী-সলিলে জীবন বিসর্জ্জনের জন্য ঝম্প প্রদান করলে,—সুরেন্দ্রনাথ অতিকষ্টে তাঁহাকে গঙ্গাবক্ষ হইতে উদ্ধার করেন। তাহার পর এক বৎসর কাল অতীত হইয়া গিয়াছে! সুরেন্দ্রনাথ চিনিতেন না যে,

এই যুবতী কে? সুরেন্দ্রনাথ সকলের নিকট প্রতারিত হইয়া, চিরদিনের জন্য লোকালয় ত্যাগ করিয়া গুরুদেবের উদ্দেশে পর্ব্বতে, কান্তারে ভ্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন;—চিরদিনের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া গুরুদেবের অন্বেষণে বহির্গত হইবেন, এমন সময় হিরণ্ময়ী গঙ্গাবক্ষে আত্ম বিসর্জ্জন করেন। সুরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীকে যখন অতিকষ্টে উদ্ধার করিয়া তীরে উত্তোলন করিলেন, তখন হিরণ্ময়ীর অনুমাত্রও জীবনের আশা ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, হা ভগবান! হা গুরুদেব! সংসারের আবার কি প্রহেলিকা আমার চক্ষের সম্মুখে ধরিলে! হতভাগিনী যুবতী! তুমি কে, তাহা জানি না। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়াও তোমাকে বাঁচাইতে পরিলাম না, ইহাই আক্ষেপ রহিল। জানি না ভগবান! জানি না গুরুদেব! আমার যাত্রায় কেন বাধা ঘটাইলে! তবে কি গুরুদেব, তোমার চরণ দর্শন পাই, ইহা তোমার অভিপ্রেত নয়? সুরেন্দ্রনাথ গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে চারিদিক আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। "হরে মুরারে মধুকৈটভ ভারে" এই প্রাণারাম পবিত্র গম্ভীর স্বর সুরেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল।

এই মর্ত্ত্যধামেই স্বর্গের আনন্দে সুরেন্দ্রনাথের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যাকুল স্বরে—অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া—গুরুদেব! দেখা দাও, দেখা দাও, বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে উন্নত ললাট, আজানুলম্বিত বাহু, জটাভারে পৃষ্ঠদেশ সুশোভিত, জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু, সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি—"হরে মুরারে মধুকৈটভ ভারে" রবে দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া মৃদু মৃদু হাস্যে এক মহাপুরুষ সুরেন্দ্রনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ তখন স্বর্গে না মর্ত্ত্যে? স্বর্গ বলিয়া কি পৃথক কোন ভগবানের রাজ্য আছে? না এই মর্ত্ত্যেই প্রেম, ভক্তি, সরলতা ও সাধু সংসর্গে স্বর্গসুখ পাওয়া যায়? যে বিমল আনন্দ হৃদয়ে উদিত হইলে এই পার্থিব ভূখণ্ডকে পদদলিত করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই ত স্বর্গ-সুখ! তবে স্বর্গের জন্য ব্যাকুল হইবার আবশ্যক কি?

গুরুপদ দর্শনে সুরেন্দ্রনাথের ব্যথিত, প্রতারিত হৃদয় অভিমানে ভরিয়া উঠিল। হায়! ভগবান ও গুরুদেবের প্রতি যে প্রেমাভিমান, তাহা কি সুন্দর! সুরেন্দ্রনাথ গুরুদেবের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া ব্যথিত হৃদয়ে কত কি বলিতে যাইতেছিলেন, তীব্র অভিমানে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত অজস্র অশ্রুজলে

গুরুদেবের পা-দুখানি ধৌত হইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ অতিকষ্টে বলিলেন, "গুরুদেব! আমাকে সংসারের উত্তাল তরঙ্গে ছাড়িয়া দিয়া কি কারণ একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন?"

গুরুদেব হো হো করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই গম্ভীর পবিত্র হাস্যরবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! গম্ভীর হাস্যরবে কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইয়া গেল। গুরুদেব আকাশের দিকে চাহিলেন। আবার সেই মৃদু মৃদু হাস্য! মৃদু মৃদু হাস্যে যেন স্বর্গের আনন্দধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। গুরুদেব বলিলেন, "সুরেন্দ্রনাথ! তোমার হৃদয়ের ব্যাকুলতার জন্যই আমি হিমালয়ের বিজন অরণ্য ভেদ করিয়া— ছুটিয়া আসিতেছি! তুমি যে সংসার ত্যাগ করিয়া আমার অন্বেষণে বহির্গত হইবে, তাহাও আমি জানিতাম। তুমি যে সংসারে বারবার প্রতারিত হইয়াছ, তাহাও অবগত আছি। সংসার ও মানবের প্রতি তোমার যে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাহাও আমার অজ্ঞাত নাই। তাই যথাসময়ে তোমার কাছে উপস্থিত হইয়াছি। এখানে আর কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে! প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। এখনই জনস্রোতে আমাদিগকে প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। যুবতীরও শুশ্রূষার আবশ্যক।

গুরুদেব হিরণ্ময়ীকে স্কন্ধে তুলিলেন, ভগবানের জ্যোতিঃ যিনি দেখিতে পাইয়াছেন,—তাঁহার করুণা যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর জগতে অজানিত কি আছে? সন্ন্যাসী অগ্রে অগ্রে, সুরেন্দ্রনাথ পশ্চাতে। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রনাথের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুদেবের পদধূলি সুরেন্দ্রনাথের কলিকাতাস্থ গৃহে আর কখন পড়ে নাই। সুরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য হইলেন, এক ঘণ্টার পথ কয়েক মুহূর্ত্তে কি করিয়া আসিলাম। জগতে যোগীজনের অসাধ্য কি আছে সুরেন্দ্র নাথ? যাঁহারা যোগবলে মুহূর্ত্তে শত যোজন পথ অতিক্রম করিতে পারেন, তাঁহারা এক ঘণ্টার পথ কয়েক মুহূর্ত্তে অতিবাহিত করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সন্ন্যাসী হিরণ্ময়ীকে স্কন্ধে লইয়া সুরেন্দ্রনাথের ত্রিতল অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "মা শৈলবালা!"

সুরেন্দ্রনাথ নির্জ্জন বাসের জন্য দুই বৎসর হইল গঙ্গাতীরে এই ত্রিতল অট্টালিকাটি ক্রয় করিয়াছেন। এখানে সুরেন্দ্রনাথ মনের আনন্দে আত্মচিন্তা ও ঈশ্বর আরাধনা করিয়া থাকেন। অধার্ম্মিক কর্ম্মচারী পাঁচকড়ীর ষড়যন্ত্রে সুরেন্দ্রনাথ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। এই সূত্রে সুরেন্দ্রনাথকে মকর্দ্দমা প্রভৃতিতে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল।

সরলচিত্ত ধার্ম্মিক সুরেন্দ্রনাথকে অবসর বুঝিয়া সকলেই ঠকাইয়াছে, একথা উল্লেখ না করিলেও চলে। কার্য্যাধ্যক্ষ পাঁচুবাবুর সহিযুক্ত যে যে কোন দেনার ফর্দ্দ দিয়াছে, সত্য বোধে সুরেন্দ্রনাথ দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা পরিশোধ করিয়াছেন। ঋণ পরিশোধের সময় সুরেন্দ্রনাথ ইহাই ভাবিতেন, "ঋণ-দাতাদের দোষ কি! আমার স্বরূপ হইয়া, আমার নিযুক্ত কর্ম্মচারী ঋণ করিয়াছে, ইহাদের ক্ষতি করিলে আমার অধর্ম্ম হইবে।" হায় সুরেন্দ্রনাথ! সকল ধনী-সন্তানই যদি তোমার মত হইত, তবে এই পৃথিবী স্বর্গ হইত।

সুরেন্দ্রনাথকে ঋণ পরিশোধ করিতে কেবল যে কলিকাতার কারবার ও কোম্পানীর কাগজগুলি বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে, তাহা নহে, দেশের অধিকাংশ জমিদারিই হস্তান্তর করিতে হইয়াছে। সকল জমিদারিই শশীভূষণ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এজন্য শৈলবালা একদিনের জন্যও স্বামীকে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে দেখে নাই। সুরেন্দ্রনাথ আদালতের ব্যয় ও ঋণাদি পরিশোধ করিয়া যখন অবশিষ্ট সম্পত্তির হিসাব করিতে বসিলেন, তখন দেখিলেন, তিনি একজন সামান্য গৃহস্থ মাত্র। নানা কারণে সুরেন্দ্রনাথ আর দেশে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার অধীনস্থ পিতার আমলের বিশ্বস্ত

কর্ম্মচারীদিগকে বিদায় দিতে সুরেন্দ্রনাথের প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ শৈলবালার সহিত পরামর্শ করিয়া তদীয় ম্যানেজার রঘুনাথ বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, যে কয়-খানি জমিদারি রহিল এবং যৎসামান্য যাহা কিছু বিষয় সম্পত্তি রহিল, ইহার আয়ের এক কপর্দ্দকও আমি চাই না। আমাদের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সামান্য অর্থেরই প্রয়োজন। সমস্ত আয় কর্ম্মচারিবর্গকে প্রতিমাসে বিভাগ করিয়া দিবে। সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া সুরেন্দ্রনাথ শৈলবালা ও নিরাশ্রয়া বিধবা সুরবালাকে লইয়া গঙ্গা-তীরে এই ত্রিতল বাটীতে প্রবেশ করিলেন। এখানে আসিয়াও সুরেন্দ্রনাথ নিষ্কৃতি পাইলেন না। শশীভূষণের প্ররোচনায় জাল হাত চিঠি ও হ্যাণ্ড নোট লইয়া পাপাত্মারা তাগাদা করিতে আরম্ভ করিল। নিরাশ্রয়া বিধবা সুরবালাকে শশীভূষণের করে অর্পণ করিলে বোধ হয় সুরেন্দ্রনাথ এই সমস্ত অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইতেন, কিন্তু বিবেক সুরেন্দ্রনাথকে বারবার নিষেধ করিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে সুরবালার জন্য সুরেন্দ্রনাথ যে পুলিস কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় পাঠকবর্গ বিস্মৃত হন নাই। শৈলবালার চেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথ ও সুরবালা সে অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। যে সময়ে এই অভিযোগ উপস্থিত হয়,

সেই সময়ে মধুপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট নিরপেক্ষ কার্য্য-দক্ষতার জন্য উর্দ্ধতন কর্ম্মচারির পদে উন্নীত হইয়া আসেন। দুঃখ, ক্ষোভ, ঘৃণায় সুরবালার পিতা দুই দিনের জ্বরেই ইহলোক ত্যাগ করেন। সুরেন্দ্রনাথের ম্যানেজার রঘুনাথ বাবু এই সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সদাশয় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারির নিকট প্রেরণ করেন। শৈলবালার বালিকাকালের কথা মধুপুরের সেই বৃটিস্ রমণী বিস্মৃত হন নাই। তিনি শৈলবালার সহিত সাক্ষাৎ করতঃ আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সদাশয় স্বামীকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া দেন। বৃটিশরাজের ন্যায়-বিচারে একদিকে যেমন পুলিস কর্ম্মচারি কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ ও সুরবালাও অপরদিকে সসম্মানে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বহুপূর্ব্বের কথা এই স্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। শশীভূষণের প্ররোচনায় যখন জাল হাত চিটা ও হ্যাণ্ডনোট ইত্যাদি লইয়া সংসারত্যাগী সুরেন্দ্রনাথকে এই নির্জ্জন বাসেও লোকে উত্যক্ত করিতে লাগিল, তখন চিরদিনের জন্য লোকালয় ত্যাগ করিয়া গুরুর অন্বেষণে যাইবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ প্রস্তুত হন। কিন্তু শৈলবালা ও সুরবালাকে কি করিয়া সঙ্গে লইয়া যান? লইয়া গেলেও পথে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। অপর কাহারও কাছে কোথায় রাখিয়া যান।

উদ্বেলিত হৃদয়ে সুরেন্দ্রনাথ সেদিন জাহ্নবী-তীরে আহিরী-টোলার ঘাটে ইহাই চিন্তা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ অচিন্তীয় ব্যাপার সুরেন্দ্রনাথকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

দ্বিপ্রহর রজনীতে শৈববালা স্বামীকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। ভীষণ চিন্তাতেই তাঁহার অবশিষ্ট রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। শৈলবালাকে না বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ কোন দিন কোথাও যান নাই। আজ তবে এ অঘটন ঘটিল কেন? স্বামীন্! দাসী তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছে? শৈলবালা দুই হস্তে সজোরে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিক ফর্সা হইয়া গেল, তত্রাচ সুরেন্দ্রনাথ আসিল না! রোরুদ্দমানা কণ্ঠে নিজের মনে শৈলবালা কত কি বলিতেছে। শৈলবালা যেন বাহ্যজ্ঞানহারা! পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ স্বামী-পাগলিনী সতী থাকেন, তবে তিনি শৈলবালার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

ঠিক এই সময়ে সন্ন্যাসী আসিয়া ডাকিলেন, "মা শৈলবালা!"

শৈলবালার সে স্বর কর্ণে প্রবেশ করিল না। শৈলবালা তখন স্বামী-চিন্তায় উন্মাদিনী!

সুরবলা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল,—"মা! তোমাকে কে ডাকচেন্ মা!"

শৈলবালার চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখেন, সম্মুখে সন্ন্যাসী ও সুরেন্দ্রনাথ! আবার একি! সন্ন্যাসীর স্কন্ধে একটী মৃতা যুবতী রমণী! রমণী মৃতা হইলেও এমন রূপ শৈলবালা আর কখন দেখে নাই! রমণীর ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ-রাশি সন্ন্যাসীর সুপ্রশস্ত পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। একি স্বপ্ন! শৈলবালা ভাবিতেছে, আমি কি নিদ্রিত-অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি?

হর্ষ-বিষাদে শৈলবালা কি যেন হইয়া গেল। শৈল-বালা অনিমেষ নয়নে সুরেন্দ্রনাথ ও সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শৈলবালা বহুদিন পূর্ব্বে একবার মাত্র গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শৈলবালা ভাবিতে লাগিলেন,—ইনিই কি তিনি? ইনিই কি আমা-দের পরমারাধ্য গুরুদেব! স্বামিন্, তবে কি আজ আমাদের সত্য সত্যই সুপ্রভাত!

সুরেন্দ্রনাথ আনন্দস্ফীত হৃদয়ে শৈলবালার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শৈল! আমাদের হৃদয়ের আরাধ্য দেব তোমার সম্মুখে, পদধূলি গ্রহণ করিয়া হৃদয় শীতল কর।"

শৈলবালা ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া ভক্তি অশ্রুতে গুরু-দেবের পদধৌত করিতে লাগিলেন। ভক্তিগদ-গদচিত্তে গুরুদেবের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

জানি না, কি উপায়ে কয়েক মুহূর্ত্তের চেষ্টাতেই

হিরণ্ময়ী চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। হিরণ্ময়ীর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "আর কোন চিন্তা নাই, হিরণ্ময়ী আরোগ্যলাভ করিয়াছে।"

যোগের কি অসীম শক্তি! হতভাগ্য আমরা—হিন্দু-সন্তান হইয়া যোগের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। মস্তকে হস্তার্পণে হিরণ্ময়ীর যেন পূর্ব্বের জ্ঞান, বল, সামর্থ্য ফিরিয়া আসিল। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া হিরণ্ময়ী কাতরস্বরে বলিলেন, "আপনারা কেন আমায় বাঁচাইলেন, মৃত্যুতে আমার অনেক আশা ও সুখ ছিল, সংসারে এই দুঃখিনীর স্থান নাই।"

সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "হিরণ্ময়ী! তুমি পতিব্রতা সতী! তোমার মনের কষ্ট—হৃদয়ের ব্যথা সকলই অবগত আছি। কি করিবে মা! সময়ের অপেক্ষা কর। অপেক্ষা ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না! তুমি জোর করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিলে, কিন্তু সে সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তোমার সাধ্য কি মা! সময়ের ফলাফল অসময়ে ভোগ করিতে পার?

হিরণ্ময়ী আশ্চর্য্য হইয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সন্ন্যাসীর পা-দুখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইনি কি দেবতা? আমার হৃদয়ের অন্তস্তল-নিহীত বেদনা ইনি কি করিয়া

জানিতে পারিলেন? আমার হৃদয়ের বেদনা কখনও কাহাকেও প্রকাশ করি নাই। সখী গৌরী ব্যতীত আমার প্রাণের বেদনা—হৃদয়ের ব্যথা কেহই ত অবগত নহে। তবে গৌরীর নিকট সন্ন্যাসী সব শুনিয়াছেন! তাহাও অসম্ভব!

সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "মা হিরণ্ময়ী! তুমি আশ্চর্য্য হইতেছ, তোমার হৃদয়ের তপ্তবেদনা আমি কি করিয়া জানিলাম? ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। ভগবনের করুণালাভ করিতে পারিলে জগতের সত্য মিথ্যা—মানব-হৃদয়ের সুখ দুঃখের ঘটনা সকলেই দিব্য-চক্ষে দেখিতে পায়! যাউক সে কথা।

"মা শৈলবালা! আমার এখানে অধিকক্ষণ থাকিবার প্রভুর আজ্ঞা নাই! কেবল তোমাদের মনের অত্যাধিক চঞ্চলতার জন্যই আমাকে হিমালয়ের বিজন অরণ্য হইতে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে। বাবা সুরেন্দ্রনাথ! মা হিরণ্ময়ী—সুরবালা! তোমাদের প্রত্যেকের যাহা করণীয়;—ভবিষ্যতের দিকে আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টি যতটুকু যাইতেছে,—সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া তোমাদের প্রত্যেককে যাহা বলিয়া যাইতেছি, হৃদয়ের সহিত তদ্রূপ, কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বিরত হইও না। সকল কার্য্যের জন্যই সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। মনের চঞ্চলতা বা

অধীরতা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ও ভগবানের প্রতি বিশ্বাস-হীনতার লক্ষণ!

"বাবা সুরেন্দ্রনাথ! করণীয় কার্য্য সম্বন্ধে প্রথমেই তোমাকে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিতেছি। তুমি ঈশ্বর-বিশ্বাসী, তোমাকে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সকলের নিকট প্রতারিত ও উত্যক্ত হইয়া তুমি সংসার ত্যাগের মনন করিয়াছিলে, ইহা তোমার পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই, ইহাতে ভগবৎ বিশ্বাসের হ্রাস হইয়াছে। তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখিয়া অচল ও অটল ভাবেই থাকা তোমার কর্ত্তব্য ছিল। যে সংসার ত্যাগ করিতে যাইতেছিলে,—সেই সংসারে ইহজন্মে না হয় পরজন্মে আবার ঘুরিয়া আসিতে হইত! তুমি কি ভগবৎবাক্য বিস্মৃত হইতেছ? তুমি কি গীতার সেই অমূল্য উপদেশ একেবারে ভুলিয়া যাইতেছ?

> সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমালোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
> তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
> মানাপমানয়োস্তুল্য মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
> সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥

"বাসনার নিবৃত্তি হওয়া বহুজন্মের তপস্যার ফল, ইহা বিস্মৃত হইও না। সংসারই বাসনা ত্যাগের প্রকৃত স্থান। এইখানে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, সহস্র যন্ত্রণা সহ্য করিয়া

বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। অনুমাত্রও বাসনার স্ফুলিঙ্গ হৃদয়ে লইয়া চিরজীবন পর্ব্বত-গুহায় বাস করিলেও কোন ফল হইবে না সুরেন্দ্রনাথ! বিধাতার অব্যর্থ বিধানে কালে সুখ দুঃখ যাহা আসে, বুক পাতিয়া সহ্য করিবার ক্ষমতা ভগবানের কৃপায় যখন লাভ করিয়াছ, তখন কি ভয়ে সংসার ত্যাগ করিবে? তাঁহার সৃজিত জগতে সকলেই এক! ধূলিকণা ও কাঞ্চনের সহিত কোনই প্রভেদ নাই! স্থূল চক্ষেই এই সব প্রভেদ দেখায়। কেহ তোমার প্রতি সহানুভূতি দেখাইলে যদি সুখী হও, তবে অনিষ্টচেষ্টা ও উত্যক্ত করিলেও সুখী না হইবে কেন? সর্ব্বনিয়ন্তার রাজ্যে সকলেই যে এক! তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই সংঘটিত হইতে পারে না। ব্যাধির জন্য যিনি ঔষধের সৃষ্টি করিয়াছেন, মৃত্যুও তাঁহার সৃজিত, তাঁহার ইচ্ছা কি, কি করিয়া বুঝিবে সুরেন্দ্রনাথ! জাল হাতচিঠা ও হ্যাণ্ডনোটের জন্য মনকে চঞ্চল করিও না। ইহাই তোমার পরীক্ষা। তোমার মন কেন তাঁহার চিন্তা হইতে ভিন্নমুখে ধাবিত হইতেছে? হিমালয়ের উর্দ্ধদেশে উঠিতেছ, চঞ্চল মনে পশ্চাদ্দিকে চাহিলেই পড়িবার সম্ভাবনা! আমার পূর্ব্ব উপদেশ সকলই তোমার মনে আছে, কেবল লক্ষ্য স্থির রাখিতে না পারায়, আমার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলে, তাই আমায় ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে!

তাঁহার পদে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অগ্রসর হও। সময়ে আবার আমার সাক্ষাৎ পাইবে।

"মা শৈলবালা! তুমি যে পথ লক্ষ্য করিয়া, যে পদে মতি রাখিয়া এই সংসারের কঙ্কর ও কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছ, এইরূপ চেষ্টাই তোমার স্থায় নারীর বাঞ্ছনীয়! শীঘ্র বা বিলম্বে, ইহজন্মে না হয় জন্ম-জন্মান্তরে তুমি এই কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া ভগবানের কৃপা-কণা লাভ করিবে। মা! হিরণ্ময়ীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। হিরণ্ময়ী যাহাতে, তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিও।

"মা হিরণ্ময়ী! তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর, দুই বৎসর তুমি স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না, অথবা তুমি কোথায় আছ এ সংবাদও কাহাকেও জানাইবে না।"

হিরণ্ময়ী করযোড়ে "তথাস্তু" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রনাথ ও শৈলবালার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাদেরও যেন এই কথা স্মরণ থাকে।"

সুরেন্দ্রনাথ ও শৈলবালা "তথাস্তু" বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

সন্ন্যাসী এইবার করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে সুরবালার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা সুরবালা! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ভগবানের নির্দ্দিষ্ট পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে সক্ষম হও। তুমি শৈলবালার সঙ্গিনী, সুপথ অবশ্যই দেখিতে পাইবে।"

"এইবার বিদায় দাও মা তোমরা! বাবা সুরেন্দ্রনাথ! আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারি না!" এইবার সন্ন্যাসী একবার হো হো করিয়া হাস্য করিলেন; একবার আকাশের দিকে চাহিলেন, পরক্ষণে গাহিতে লাগিলেন—

"হরে মুরারে, মধুকৈটভারে—"

দেখিতে দেখিতে সন্ন্যাসী কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন, আর কেহই দেখিতে পাইল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

একপক্ষ কাল গুরুদেব চলিয়া যাইবার পর হর্ষ বিষাদেই অতিবাহিত হইয়া গেল। শৈলবালা প্রত্যহই মনে করেন, হিরণ্ময়ীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়াও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, পাছে হিরণ্ময়ী কিছু মনে করে। হিরণ্ময়ী সুরেন্দ্রনাথকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করে, সুরেন্দ্রনাথ হিরণ্ময়ীকে কখন ভগ্নী, কখন দিদি, কখন হিরণ্ময়ী বলিয়া ডাকেন। শৈলবালা হিরণ্ময়ীকে কি বলিয়া ডাকিবেন ভাবিয়া পান না। "ভাই" "হ্যাঁগা" "ওগো" বলিয়াই একপক্ষ কাল অতিবাহিত করিলেন। শৈলবালা একথা স্বামীকে কয়দিন জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিয়াও অবসর পান নাই। হিরণ্ময়ীকে পাইয়া অবধি শৈলবালা ও সুরবালা কি যেন একটা নূতন জিনিষ, নূতন আনন্দ লাভ করিয়াছে। আজ শৈলবালা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল, হিরণ্ময়ীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব। সেদিন একাদশী, সুরেন্দ্রনাথ আহার করেন না, শৈলবালা ও সুরবালাও আহার করিবে না; দুই চারিজন যাহারা দাস দাসী আছে কেবল মাত্র তাহারাই আহার করিবে।

শৈলবালা হিরণ্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই! তুমি কি উপবাসে থাকিতে পারিবে? কষ্ট হইবে না!"

হিরণ্ময়ী বলিল, "না! কষ্ট কি?"

ভোর চারিটার পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথ, শৈলবালা, সুরবালা ও হিরণ্ময়ী প্রত্যহই গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া ভগবৎ আরাধনায় রত হন, দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে তাঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ হয় না। শৈলবালা হিরণ্ময়ীকেও এই কয় দিনের মধ্যে নিজেদের পথে টানিয়া লইয়াছেন। অদ্য দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ধ্যানাদি সমাপনান্তে ছাদের উপর বসিয়া শৈলবালা আবার একবার বলিলেন, "দেখ ভাই! কষ্ট হবে না? তোমার অভ্যাস নাই, তাই ভয় হচ্চে।"

"অতলজাহ্নবী সলিলে ডুবিয়াও যে বাঁচিয়াছে, তার কি উপবাসে মৃত্যু হয়?"

হিরণ্ময়ী শৈলবালার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

"কেন ভাই! তুমি আবার পূর্ব্বের কথা টানিয়া আন?" এই বলিয়া শৈলবালা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা হিরণ্ময়ীর মুখটি ঢাকিয়া রহিলেন।

হিরণ্ময়ী ও শৈলবালা বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে যেন এক বৃন্তে দুইটি প্রস্ফুটিত স্বর্গীয় কুসুম! উভয়ের মধ্যে কে

অধিক সুন্দরী তাহা বলা কঠিন। কমনীয় রূপ-প্রভায় উভয় যুবতীই যেন ভগবানের সুন্দর পবিত্র জ্যোতিঃ সুরেন্দ্রনাথের গৃহে বিকীর্ণ করিতেছে। যিনি এমন রূপ সৃজন করিতে পারেন, তিনি না জানি কতই সুন্দর! উভয়েই সুন্দরী—উভয়েই যুবতী! বিধাতা হিরণ্ময়ীকে দেখিয়া শৈলবালাকে গড়িয়াছেন, কি শৈলবালার রূপরাশীর সহিত তুলনা করিয়া হিরণ্ময়ীর অঙ্গে রূপের নির্ম্মল জ্যোতিঃ ছড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। উভয়ের অঙ্গাবয়ব দেখিয়া অনুমান করিবার উপায় নাই, কে অগ্রে বা পশ্চাতে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াছে। উভয়েই আনন্দময়ী, উভয়েই সমবয়স্কা, উভয়েরই বলিকার ন্যায় মন পবিত্র, নির্ম্মল, ধর্ম্মভাবে পূর্ণ; তবে শৈলবালাকে যেন প্রতিভাময়ী প্রখর বুদ্ধিশালিনী বলিয়া মনে হয়। ইহাই একটু প্রভেদ! আরও একটু প্রভেদ আছে, শৈলবালার হৃদয় মন সংসারের ময়লামাটি ছাড়িয়া অনেক উচ্চে উঠিয়াছে, বিনা বাধায় ভগবানের দিকে যাইবার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু হিরণ্ময়ীর হৃদয় মন শোক-দুঃখে অভিভূত হইয়া অনেক নীচে পড়িয়া আছে। কিন্তু স্থিরচক্ষে দেখিলে 'বোধ হয়, উভয়ের হৃদয়েই ধর্ম্মভাব যেন অহোরাত্র জাগ্রত রহিয়াছে।

"ছেড়ে দাও ভাই, আর বলবো না।" অস্পষ্ট ভাবে এই কথা বলিয়া হিরণ্ময়ী শৈলবালার দক্ষিণ হস্তটি লইয়া দুই হস্তে টানাটানি আরম্ভ করিল।

"প্রতিজ্ঞা কর, আর কখন সে কথা মুখে আনবে না।"

"আচ্ছা আনবো না।

"প্রতিজ্ঞা।"

হিরণ্ময়ী হাসিতে হাসিতে বলিল, "হাঁ প্রতিজ্ঞা।"

শৈলবালা হিরণ্ময়ীর দক্ষিণ হস্তটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা ভাই, তোমায় কি বলিয়া ডাকবো?"

হিরণ্ময়ী।—দাসী বলে!

শৈল। ছি ভাই! কি বলছো! আচ্ছা! তাই ভাল, তুমি আমাকে দাসী বলো! আমি বলবো দিদি ঠাকুরুণ।"

হিরণ্ময়ী সজোরে শৈলবালার মুখ টিপিয়া ধরিল। অনেক বাদানুবাদের পর উভয়ে উভয়ের নাম ধরিয়া ডাকিবে ইহাই শেষ মিমাংসা হইল। বয়সে কে ছোট, কে বড়, মিমাংসা না হওয়ায় শৈলবালা বলিলেন, আমাদের একসময়েই জন্ম।

শৈলবালা বুকের মধ্যে হিরণ্ময়ীর মাথাটি লইয়া

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হিরণ্ময়ী আর বক্ষঃস্থল হইতে মাথা তুলিল না। শোকাশ্রু উথলিয়া উঠিল, প্রবল অশ্রুধারায় শৈলবালার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

শৈলবালা অনেক বুঝাইয়া হিরণ্ময়ীকে সান্ত্বনা করিলেন; শেষে বলিলেন, "আমাকে পর ভাবিয়া যদি হৃদয়ের ব্যথা জানাইতে না চাও, তবে জানাইয়া কাজ নাই ভাই!"

"তোমরা যদি পর হও, তবে দুঃখিনীর এজগতে আর আপনার কে আছে ভাই।"

হিরণ্ময়ী অকপট চিত্তে নিজের জীবন-কাহিনী শৈলবালার নিকট বলিতে আরম্ভ করিল। একটি বর্ণও বাদ যাইল না, একটি কথাও গোপন করিল না। বিবাহের পর স্বামীর সোহাগ ভালবাসার কথা হিরণ্ময়ী যখন একটি একটি করিয়া বর্ণনা করিতে লাগিল, শৈলবালা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নিজ প্রেম ভালবাসার তুলনা করিতে লাগিলেন। তার পর বিনা দোষে বিনা কারণে স্বামির নিকট লাঞ্ছিতা অপমানিতার কথায় শৈলবালার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িল! সতী ব্যতিত সতীর মর্ম্মদাহের অব্যক্ত যাতনা কে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে! উভয়েরই বক্ষঃস্থল বহিয়া

তপ্ত অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। তার পর শেষ দিনে স্বামীর পদাঘাতে রক্তপাতের কথায় শৈলবালা শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। হিরণ্ময়ীর স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া শৈলবালা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তার পরে জাহ্নবীসলিলে আত্মবিসর্জ্জনের চেষ্টা এবং সুরেন্দ্রনাথের নিজ জীবন তুচ্ছ করিয়া তাহার জীবনরক্ষার কথা সকরুণ ভাষায় বর্ণনা করিয়া হিরণ্ময়ী বলিল, "ভাই! বাঁচিবার সাধ না থাকিলেও দাদার ঋণ কি কোটী কোটী জন্মেও সুধিতে পারিব? হায়! দাদার যদি অমঙ্গল হইত!"

শৈলবালা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—"ভগবান গুরুদেবই তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন ভাই!"

শৈলবালা আজ হিরণ্ময়ীর পরিচয় পাইয়া বুঝিলেন যে, তাঁহাদের প্রবল শত্রু জমিদার শশীভূষণের স্ত্রীই আমাদের হিরণ্ময়ী।

সুরেন্দ্রনাথ শৈলবালার নিকট সমস্ত শুনিয়া বিমর্ষ ভাবে বলিলেন, "জানি না, ভগবান ও গুরুদেবের কৃপায় হিরণ্ময়ীর কতদিনে মনকষ্ট দূর হইবে?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে পূর্ব্বেকার কথাই সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। যে দিন হিরণ্ময়ীকে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গা-গর্ভ হইতে উত্তোলিত করেন, সন্ন্যাসীর দৈব-শক্তিতে হিরণ্ময়ী যে দিন রক্ষা পান, তাহার পর পূর্ণ এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, হিরণ্ময়ী এখন আর সে হিরণ্ময়ী নাই। হিরণ্ময়ী এখন ভগবৎ-প্রেমে মাতোয়ারা! হিরণ্ময়ীর ঈশ্বর নিরাকার নহেন। স্বামীই ঈশ্বর,—স্বামীকেই ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া হিরণ্ময়ী অহোরাত্র ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকে। এই শিক্ষা হিরণ্ময়ী শৈলবালার নিকটেই লাভ করিয়াছে। হিরণ্ময়ী প্রথমতঃ সুরেন্দ্রনাথ, শৈলবালা ও সুরবালার সহিত ধ্যানে বসিত, কিন্তু ভগবানকে কি করিয়া হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া ধ্যান করিবে, তা বুঝিতে পারিত না। তাহার ধ্যান চিন্তা ঈশ্বরের দিকে না ছুটিয়া স্বামীদেবতার পদ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইত। হিরণ্ময়ী ধ্যানে বসিয়া মনে মনে জপ করিত,—"প্রেমময়, কৃপাময়, অবলার জীবন সর্ব্বস্ব স্বামী! তুমিই আমার ইহকাল পর-কাল।

শৈলবালার গৃহে আসিবার একমাস পরে একদিন হিরণ্ময়ী শৈলবালাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আচ্ছা ভাই! যাহাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করি, যাহাকে চাক্ষুষ দেখিতে পাই, তাঁহাকে ধ্যান করিলে কি ভগবানকে ধ্যান করা হয় না?"

সতীই সতীর মর্ম্ম-কথা বুঝিতে পারে! শৈলবালা হিরণ্ময়ীর মুখের দিকে রাগত ভাবে চাহিয়া বলিলেন, "কে বলিল হয় না? স্বামীই আমাদের ভগবান, ঈশ্বর! স্বামীকে ধ্যান করা যা,—অনাদি অপ্রমেয় সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানকে ধ্যান করাও তাই! ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন,—

যোঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যে বিধি পূর্ব্বকম্॥

আবার গীতার একস্থলে ভগবান বলিয়াছেন—

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥

তবেই এখন বুঝ দেখি, স্বামীকে ধ্যান পূজা করিয়া কি আমরা ভগবানকে ধ্যান পূজা করিতেছি না? জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, সকলই তিনি! আমাদের হৃদয়ের দেবতা স্বামী যিনি, তিনিও সেই ভগবান!

ভগবানের শক্তি ব্যতীত জগতে কিছুই উদ্ভূত হইতে

পারে না,—অস্তিত্বও থাকিতে পারে না। শালগ্রাম মনে করিয়া পাথরকে পূজা করিলে যদি ভগবানের পূজা করা হয়, পাথর পূজিয়াও মানুষের যদি মুক্তি লাভ হইতে পারে, তবে সতীর পতিপূজা ভগবানের পূজা নয় এ কথা কে বলিল? তৃণ, ইষ্টক, কাষ্ঠ হইতে সমুদ্র, নদী, আকাশ, বৃক্ষলতাদি সকলই ভগবান! যে যাহাকেই ভক্তিভরে পূজা করুক, সেই ভগবানের পূজা করিতেছে! তিনি ছাড়া এ জগতে পৃথক বস্তু কিছুই নাই।

চন্দ্র সূর্য্যকে পূজা করিলে যেমন ভগবানকে পূজা করা হয়, কালি দুর্গার প্রতিমা গঠন করিয়া ভক্তিভাবে পূজা করিলে যেরূপ ভগবানের পূজা করা হয়, একখণ্ড বংশদণ্ড বা একখানি ইষ্টককে ভগবান বলিয়া মনে করিয়া পূজা করিলেও সেই একই ফল। আমাদের স্বামী আমাদের কাছে ত জীবন্ত প্রত্যক্ষ ভগবান। আমাদের অন্য ভগবানের আবশ্যক কি?"

এই দিন হইতে স্বামীর মূর্ত্তি হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া যখন ধ্যান ও পূজা করিতে বসে, তখন হিরণ্ময়ীর বিন্দুমাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকে না, হিরণ্ময়ীর মুখ হইতে অপরূপ জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া শৈলবালার ধ্যান-গৃহ যেন উদ্ভাসিত করিয়া তুলে।

পাঠক! পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখিয়াছেন, শৈলবালা,

হিরণ্ময়ী ও সুরবালা ধ্যানমগ্না হইয়া আছেন। তাহার পর পূর্ব্বোকার ঘটনা বর্ণনা করিতে আমাদের অনেকটা সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। সুরবালার আহ্বানে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইহাঁরা ধ্যানে বসিয়াছেন, রজনীর অর্দ্ধযাম অতীত, এখনও ইহাঁরা ধ্যানরতা! আরও অর্দ্ধদণ্ড অতীত হইয়া গেল। শৈলবালা ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন।

পাঠক! তুমি যদি যোগীর যোগভঙ্গের পর তাঁহার অবস্থা দেখিয়া থাক, তবে বুঝিতে পারিবে, শৈলবালার মুখ দিয়া কি এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে! শৈলবালার এইমাত্র বাহ্যজ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে। শৈলবালা যেন কোন অজানিত প্রাণারাম স্থান হইতে এইমাত্র হাহাকারময় সংসার-ভূমে পতিত হইল! মাদকদ্রব্যের তীব্র ক্রিয়া ধীরে ধীরে অপসৃত হইবার সময় মাদক-দ্রব্য-সেবীর যেরূপ অবস্থা হয়, শৈলবালারও এখন ঠিক তদ্রূপ অবস্থা!

আমরা সংসারি মানব, হৃদয় অন্ধকারে আবৃত, যোগীর যোগভঙ্গের অবস্থা—অথবা শৈলবালার বর্ত্তমান অবস্থা পাঠককে বুঝাইতে পারি, এরূপ আমাদের শক্তি নাই!

শৈলবালার মুখ ম্লান ও শুষ্ক, কিন্তু এই শুষ্কতার

ভিতর যেন অমৃত-সমুদ্রের লহরী উঠিতেছে। হিরণ্ময়ীর চক্ষু দুটি উন্মীলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ধীর স্থির! যে অপার্থিব বস্তুতে শৈলবালার মুদ্রিত নেত্র নিপতিত ছিল, তাহাতে এখনও যেন দৃষ্টি সংবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। শৈলবালা প্রথম অস্পষ্ট ভাবে, তার পর ধীরে ধীরে, ক্রমশঃ উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মষ্যাবেশিতচেতসাম্ ॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎ-কর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥

আবৃত্তি করিতে করিতে ভক্তি-অশ্রুতে শৈলবালার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। আবৃত্তির বিরাম নাই! শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকগুলি আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত

শৈলবালার কণ্ঠস্থ। তন্ময়চিত্তে একটির পর একটি শ্লোকগুলি ভক্তিভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শৈলবালার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত।

যখন যামিনীর তৃতীয় প্রহর অতীত, তখন ইহাঁদের ধ্যান পূজা শেষ হইল। পাঠক বল দেখি, সংসারে থাকিয়াও মানুষের প্রকৃত সুখ কি?

ধ্যানাদি শেষ হইলে সকলে আসিয়া ছাদের উপর উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল সকলেই নিস্তব্ধ! হিরণ্ময়ী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল,—

"আচ্ছা ভাই! দাদা কেন এখনও আসিলেন না?"

শৈলবালা উদাস দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বলি-লেন,—

"আমিও তাই ভাব্‌চি ভাই! এত রাত্রি তিনি কোন দিন কোথাও কাটান নাই!"

এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, "মা! বাবু আসচেন।"

সকলেই উৎফুল্ল হৃদয়ে সুরেন্দ্রনাথের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ উপরে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৈলবালা! তুমি এখনও বসিয়া আছ? হিরণ্ময়ী! সুরবালা! তোমারাও শয়ন করিতে যাও নাই?"

হিরণ্ময়ী তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন দাদা?"

শৈলবালা বলিলেন, "তোমার ভগ্নিটী "দাদা" "দাদা" করিয়া ছটফট্ করিতেছে, তাকে ভুলাইতে রাত্রি প্রভাত হইতে চলিল।"

সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "নিজের দোষটা আমার ভগ্নীর ঘাড়ে চাপাইতেছ কেন? শৈলবালার মুখের ব্যাকুলতাটা ঢাকিয়া হিরণ্ময়ীর উপর দোষটা দিলে তবে মানাইত।"

হিরণ্ময়ী বলিল, "দাদা! ভ্রাতৃ-জায়াদের চির-অভ্যাস, সকল অপরাধ গরিব ননদীনিদের ঘাড়ে চাপান। আমারও ভ্রাতৃ-জায়াটি প্রসিদ্ধ প্রথা ত্যাগ করিবে কেন?"

শৈল।—ভাইকে মধ্যস্থ মানিলে ভগ্নীরই জয় হইবে। আমরা পরের মেয়ে, তোমাদের কাছে চির দিনই পরাস্ত।"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হিরণ্ময়ী ও শৈলবালার দিকে চাহিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—

"দেখ, আমাদের দেশ যোগী তপস্বীদের লীলাভূমি! যদিও বিকট শিক্ষা-সংসর্গে মানুষের মন প্রাণ বিগড়াইয়া

গিয়াছে, তত্রাচ অস্থি, মজ্জা, মাংস এই ভারতভূমি হইতেই উদ্ভূত। লোক-উপকার ও উপযুক্ত পথ দেখাইবার জন্য আমার গুরুদেবের ন্যায় অনেক দেব-সদৃশ সন্ন্যাসী হিমালয়ের বিজন অরণ্য ও গিরিগুহা ত্যাগ করতঃ লোক-লোচনের অন্তরালে এদেশে আসিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্য কোন দেশের এরূপ সৌভাগ্য কখন ঘটে নাই, ঘটিবেও না। পূর্ব্ব-জন্মের উচ্চ পবিত্র কৃতকার্য্যের ফল জন্যই হউক, অথবা সেই মহাপুরুষদের অলক্ষিত বাক্য ইঙ্গিতেই হউক, কোন কোন যুবকের হৃদয় প্রশান্ত, নির্ম্মল, পবিত্র ও অহঙ্কার-শূন্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ একটি যুবকের পরিচয় ও সাক্ষাৎ পাইয়া অনির্ব্বচনীয় বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছি। সেই যুবকের হৃদয় এরূপ স্বচ্ছ ও ক্লেদশূন্য যে, স্থির চক্ষে দেখিলে তাহার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আজ জাহ্নবী-তটে ভগবৎ আরাধনার পর সেই যুবকের হৃদয়খানি লইয়া বিশ্লেষণ করিতে করিতে এতই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, রজনীর এক প্রহর মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহা আমার জ্ঞান ছিল না। তাই শৈলবালা, গৃহে আসিতে আমার এত বিলম্ব হইল। আমি যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। হায় শৈলবালা! আমাদের দেশের

যুবক-সম্প্রদায় যদি এইরূপ উচ্চ পবিত্র হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিত, তবে কি এই পবিত্র ভারতভূমে,—যোগী ঋষিদের লীলাক্ষেত্রে ফল্গুনদীর ন্যায় পাপ স্রোত বহিয়া এ দেশকে অন্তঃসারশূন্য করিতে পারিত ?"

শৈলবালা বলিলেন, "আমি গুরুবাবার নিকট শুনিয়াছি, অধুনা প্রশান্ত, নির্ম্মল, পবিত্র হৃদয় কদাচ দেখিতে পাওয়া যায় এবং দেখিতে পাওয়া গেলেও বিদেশীয় আদর্শ, সমাজ, সংসর্গ ও লোক মত প্রভাবে তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া জগতের হিতার্থে নিয়োজিত হইবে না। সংসার-কোলাহলে, স্বার্থের হাহাকারে এইরূপ প্রশান্ত, নির্ম্মল, পবিত্র হৃদয়ের দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিবে না, মূল্যও বুঝিবে না। এইরূপ হৃদয়ের সংসর্গ করিয়া কেহ ঊর্দ্ধে উঠিতেও চেষ্টা করিবে না ! যদি কাহারও স্বার্থ সিদ্ধির আশা থাকে, সেই যাইয়া কপটতাপূর্ণ মধুর বচনে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করিবে। রামসেবকের মুক্তার মালার ন্যায় এরূপ হৃদয়ের মূল্য বুঝা দূরে থাক, কেহ চিনিতেও পারিবে না !

সুরেন্দ্রনাথ।—ঠিক বলিয়াছ শৈলবালা ! গুরুবাবার মুখে যাহা শুনিয়াছ, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। তাঁহার বাক্যের সত্যতা প্রতি মুহূর্ত্তে গুরুগম্ভীর ভাষায় গৃহে গৃহে ঘোষিত হইতেছে।

শৈলবালা।—আপনি যে যুবকের কথা বলিতেছেন, কিরূপে তাঁহার সহিত পরিচয় হইল? তাঁহার হৃদয়ের পবিত্রতার কথা শুনিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! নিশি অবসান হইতে চলিল, তত্রাচ তাঁহার পরিচয় না জানিয়া শয্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না! দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

সুরেন্দ্রনাথ।—উষাগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই। এস শৈলবালা, আজ আমরা সেই অল্পভাষী, অহংকার-শূন্য, উচ্চ হৃদয়, পবিত্র চরিত্র যুবকের চরিত্র আলো-চনা করিয়া অবশিষ্ট রজনীটুকু অতিবাহিত করি। সাধুসঙ্গ ও পবিত্র চরিত্রের আলোচনা ভগবৎ ভক্তির সহায়তা করে। কিন্তু শৈলবালা! যুবকের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে দেখিবামাত্রই কেন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলাম, তাহাই অগ্রে মনে হয়। সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে কারণে, অকারণে, স্বার্থে বা বিনা স্বার্থে নিত্য অসংখ্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয় কিন্তু তাহাদের স্মৃতিটুকুও কখন মনে উদয় হয় না। আবার মানব-জীবনে এরূপও ঘটিয়া থাকে, মুহূর্ত্তের জন্য একবার কাহাকেও দেখিলে তাহার প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে যে গূঢ় রহস্য নাই, তাহা বলিতে পারি না। জন্মান্তরবাদীরা বলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব

জন্মে দৃষ্ট ব্যক্তির সহিত প্রেম ভালবাসা বা বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল, তাই সাক্ষাৎ মাত্রই হৃদয়ের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অলক্ষিত পূর্ব্ব ভাব বাধা না মানিয়া ধাবিত হয়। মনস্তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, যাহার যেরূপ মনের ভাব, সেই সমভাবাপন্ন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলেই মনোভাব সমধর্ম্ম পদার্থের ন্যায় মিশ্রিত হইয়া পরস্পরে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কেহ কেহ বলেন, মানুষ গুণে আকৃষ্ট হয়। আবার তাঁহাদের বিপক্ষীয়েরা বলেন, গুণ অল্পাধিক সকলের আছে, তবে সকলেই গুণে আকৃষ্ট হয় না কেন? যিনি যাহাই বলুন, ইহার পশ্চাতে যে পূর্ব্বপ্রেম ভালবাসার কোনই সম্পর্ক নাই, এরূপ মনে করিতে পারি না।

যুবক উচ্চ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কুলোদ্ভব। ইঁনি সত্যই যেন জগন্মাতা বরদার প্রসাদে এই ধর্ম্মহীনতা ও দাম্ভিকতার যুগে পার্থিব জগতে আগমন করিয়াছেন। মঙ্গলময়ের বিনা উদ্দেশ্যে যখন একটি বৃক্ষ পত্রেরও সৃজন হয় নাই, তখন ভারত-ভূমে ইহাঁর জন্মে বিধাতার কোন্ মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে বা হইবে তাহা কে বলিতে পারে? এই দেখ শৈলবালা, জগন্মাতা বরদার প্রসাদে বসু বংশোদ্ভব যুবকের সরল, পবিত্র নিরহঙ্কার হৃদয়খানি দেখিয়া আমার ন্যায় কীটানুকীট,

পাপী, তাপী মানবের কলুষিত-হৃদয়ে কেমন একটি স্নিগ্ধ নির্ম্মল ছায়া পড়িয়াছে! জগজ্জননী বরদার প্রসাদে যাহার মানব-মূর্ত্তি ধারণ, তাহার দ্বারা জগৎপাতার কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে?

শুন শৈলবালা! বাগ্‌বাজারে ইহাঁর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। ইহাঁর অহঙ্কারশূন্য সরলতা-মাখান বালকের ন্যায় মুখচ্ছবি দেখিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। বহুক্ষণ ধরিয়া ইহাঁর মুখের পানে আমি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলাম। অন্যান্য ভদ্র সজ্জনের অনেক কথাবার্ত্তা শুনিলাম কিন্তু ইহাঁর মুখ-নিঃসৃত একটি কথাও আমি শুনিতে পাইলাম না! ভাবিলাম, এই উনবিংশ শতাব্দীর বাক্‌চাতুরির যুগে কে এই যুবক? যুবকের আত্মম্ভরিতা নাই, নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য অকারণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই, দম্ভ অহংকারের লেশ মাত্রও নাই! যুবকের মুখ-নিঃসৃত একটি কথা শুনিবার জন্য আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। যুবকের মুখের দিকে আমার দৃষ্টি সংবদ্ধ! একটি কথা শুনিবার জন্য হৃদয় উদ্গ্রীব!—অকারণে একটি কথাও নিঃসৃত হইবার চিহ্ন সরলতাপূর্ণ গম্ভীর মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইল না! আবার ভাবিতে লাগিলাম, কে এই যুবক?

বহুক্ষণ পরে যুবকের মুখ হইতে একটি কথা নিঃসৃত হইল। মন প্রাণে শ্রবণশক্তি টানিয়া আনিয়া হৃদয়ের কৌতূহল নিবৃত্তি করিলাম। যুবক বলিলেন, "আমার কি হইল!"

ভাবিলাম, এই একটি কথাতেই যুবক জীবনে অনেক কথাই বলিলেন। একটি কথাতেই যদি অনেক কথা বলা যাইতে পারে, তবে মানুষ অনাবশ্যকীয় বাক্য ব্যয় করে কেন? বহুভাষী হইলেই যে মানুষকে মিথ্যার ছায়া বা মিথ্যা কথার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়! যাহারা অনেক কথা কয়, তাহারাই যে কেবল পাপী তাহা নহে, যাহারা এই সমস্ত কথা শুনিয়া মিথ্যাবাদীকে প্রশ্রয় দেয়, তাহারাও এই পাপের ফলভোগী হইয়া থাকে। কৈ, ধর্ম্মের কথা, ভগবানের কথা ত মানুষ অধিক কহে না? স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের জন্য এবং অপরের চক্ষে নিজেকে বড় দেখাইবার জন্যই মানুষ অধিক কথা কহিয়া থাকে। বহুভাষীর বাক্যের সহিত মিথ্যা বাক্য মিশ্রিত নাই, একথা কি কেহ বলিতে পারেন? অধিক কথা কহায় আরও গুরু-তর দোষ, শ্রোতাকে সেই কথাগুলি মনে করিয়া তাহাকে ভাবিবার অবসর দেওয়া হয় না এবং শ্রোতাকেও মিথ্যা কহিবার জন্য প্রলোভিত করা হয়। মানুষের প্রধান দোষ,

নিজেকে কেহ নির্গুণ বা ছোট মনে করিতে পারে না। অহংজ্ঞান মানুষের এমনই অস্থি মজ্জায় মিশ্রিত যে, সবাই ভাবে, আমি জ্ঞানী, ধনী, বিজ্ঞ ও পণ্ডিত। তুমি যদি অতিরঞ্জিত করিয়া গুণ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ কর, আমারও ইচ্ছা হইবে, দুইটা কথা বলিয়া নিজেকে উচ্চ আসনে বসাইয়া দিই। যুবকের সেই একটি মাত্র কথা শুনিয়াই বুঝিলাম, ধরদার প্রসাদে ইহাঁর হৃদয় ভিন্ন ধাতুতে গঠিত। মনে মনে সকাতরে বলিলাম, মা জগজ্জননী! তোমার প্রসাদে ইহাঁর হৃদয় আরও পবিত্র উচ্চ হউক এবং এই নির্ম্মল হৃদয়ের সংস্পর্শে আমার ন্যায় কীটানুকীটের হৃদয়ও যেন পবিত্র হইয়া ধর্ম্মপথের পথিক হইতে পারে!

আমি গভীর চিন্তায় কতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলাম মনে নাই। চাহিয়া দেখি, যুবক আমার হৃদয়ে কি এক অভাবনীয় চিন্তার নূতন তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সেই মুহূর্ত্তেই যুবকের পরিচয় পাইয়া আমি অধিকতর আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। যুবকের চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে আনন্দে আমার হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল।

যুবক পিতৃ-পরিত্যক্ত প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী। যে বয়সে মানুষ বিলাসিতার সমুদায় উপাদান

হস্তে পাইলে পশুর অধম হইয়া পড়ে, সেই বয়সেই যুবক মনুষত্বের উচ্চাসন অধিকার করিয়া আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিল তিল করিয়া দেহের রক্তবিন্দু দান করিতেছেন। যুবকের বল, স্বাস্থ্য, প্রচুর বৈষয়িক আয় কিছুরই অভাব নাই। এরূপ অল্প বয়সে কিরূপে ইনি উচ্ছৃঙ্খলতা, অহংকার ও ন্যাকারজনক বিলাসিতা দূরে রাখিয়া পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ ও তাঁহার অক্লান্ত কর্ম্মশক্তির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পিচ্ছিল সংসার-পথে চলিতে পরিতেছেন, ইহাই অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়! ইহা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই! যুবকের অহঙ্কার নাই কিন্তু নম্রতাগুণে যুবক-সমাজে আদর্শ-স্থানীয়। ভদ্রতা ও সাধু ব্যবহারে সকলের হৃদয়েই প্রেম ভালবাসার বীজ বপন করিয়া দেন। প্রচুর ধনসম্পত্তি হস্তে পাইয়া সংসারের একমাত্র কর্ত্তা হইলে বিদেশীয় অসম্পূর্ণ শিক্ষায় মানুষ যেরূপ ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মানব হইয়া পশুর আচার অবলম্বন করে, যুবকের প্রকৃতি তদ্রূপ নহে! আমার মনে হয়, যুবক ভবিষ্যতে জনক ঋষির ন্যায় সংসারাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিবেন। অল্প বয়স হইতেই যাঁহার হৃদয় পবিত্র, বার্দ্ধক্যে তিনি যে আশক্তিশূন্য হইয়া সংসার ধর্ম্ম

পালন করতঃ মনকে ঈশ্বরাভিমুখে লইয়া যাইতে পরিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যুবকের ব্যবহারগুণে কেবল আত্মীয় বন্ধু নহে, অধীনস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ যুবককে দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

শৈলবালা! সেই অমায়িক, অহঙ্কারশূন্য, সরল সৌম্যমূর্ত্তি যুবকের সহিত পরিচিত হইয়া কি পর্য্যন্ত যে আনন্দানুভব করিতেছি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার সময় নহে; যুবকের সহিত এই পরিচয়ের ফলে আমাদের অপার্থিব উন্নতি হইবে ইহা আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেছি। এই ঊনবিংশ শতাব্দির যুগে, এই ধর্ম্মহীনতা ও অনাচারের দিনে, আমাদের শশীভূষণ শিক্ষা লাভ করুক ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর। শৈলবালা! আরও প্রার্থনা কর, জগতের মঙ্গল ও লোকশিক্ষার জন্য ভগবানের করুণায় যুবকের সরল পবিত্র হৃদয় আরও যেন নির্ম্মল ও পবিত্র হয়।

যুবকের চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে পূর্ব্বদিক ফর্সা হইয়া আসিল। প্রভু আরাধনার জন্য বিভুনাম উচ্চারণ করিতে করিতে শৈলবালা, হিরণ্ময়ী ও সুরবালাকে সঙ্গে লইয়া সুরেন্দ্রনাথ জাহ্নবী-সলিলে আবাহন করিতে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পাঠক! হিরণ্ময়ী জাহ্নবী-বক্ষে ঝম্প প্রদান করিবার পর দুই বৎসরের অধিককাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন শশীভূষণের অবস্থাটা আমাদিগকে একবার দেখিতে হইবে।

হিরণ্ময়ী গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিবার পর শশীভূষণ যে ন্যক্কারজনক স্রোতে ভাসিতে ছিলেন, কিছুদিন হাত পা ছাড়িয়া দিয়া সেই স্রোতেই ভাসিয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন। শশীভূষণ প্রথম প্রথম পঙ্কিল স্রোতে হাবুডুবু খাইতে খাইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। অধিকতর আনন্দের কারণ—শশীভূষণ ভাবিয়াছিলেন, হিরণ্ময়ী কোন আত্মীয়ের গৃহে আত্ম গোপন করিয়া আছেন, কিছুদিন পরে ফিরিয়া আসিবে। হিরণ্ময়ী এবার ফিরিয়া আসিয়া আমার কোন কার্য্যেরই আর প্রতিবাদ করিবে না। পর-গৃহে বাস করিতে হিরণ্ময়ীর অচিরেই আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিবে, সুতরাং প্রত্যাগমন করিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইবে না। মানুষ যখন পাপে ডুবিয়া

পাপ কার্য্যকে সঙ্গের সাথী করে, তখন তাহার সমস্ত বিবেচনা-শক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। পাপে হৃদয় ডুবিয়া থাকে বলিয়া, মন্দ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও তাহারা ভাল কার্য্য করিতেছে এইরূপ মনে করে। শশিভূষণেরই বা এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন? যখন হিরণ্ময়ীর পরিত্যক্ত সুসজ্জিত তরণীখানি লইয়া কর্ম্মচারী ও মাঝি মাল্লারা অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে ফিরিয়া আসিল, তখন শশিভূষণ তাহাদিগকে সম্মুখে ডাকাইয়া কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না। যেমন প্রভু, তাহার বাহনও তদ্রূপ হইয়া থাকে। ম্যানেজারের মুখে দুই চারিটী কথা শুনিয়া প্রভু আদেশ করিলেন, গৃহিণীর সঙ্গে যাহারা গিয়াছিল, সকলকে এই মুহূর্ত্তেই বরখাস্ত করিয়া দাও এবং তাহাদের প্রাপ্ত বেতন সরকারে বাজেয়াপ্ত কর। প্রধান কর্ম্মচারী প্রত্যেক কার্য্যেই নিজ লাভের পথ সুগম করিবার জন্য এইরূপ সুবিধার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত সুতরাং প্রভুর আদেশ পালন করিতে তিলার্দ্ধও বিলম্ব হইল না। শশিভূষণ তখন বাগানবাটীকায় লোহিত বর্ণ চক্ষে নর্ত্তকীদের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিতেছিলেন, সুতরাং প্রধান কর্ম্মচারীর প্রতি কি আদেশ হইল, কেবল যে নিজে উপলব্ধি করিতে পারিলেন না তাহা নহে, মাসাধিক

কালের মধ্যে একথা আর শশিভূষণের স্মৃতিপথে উদিত হইল না; কর্ম্মচারী ও মাঝি মাল্লারা হিরণ্ময়ীকে বিসর্জ্জন দিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছিল। এই স্ত্রীহত্যার পাপভার তাহাদিগকেই মস্তকে বহন করিতে হইবে বলিয়া, তাহারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এক্ষণে ম্যানেজারের আদেশ পাইয়া তাহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। নিরক্ষর যাহারা, যাহাদের বিদেশীয় ভাবে এখনও হৃদয় আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই, বিদেশীয় আচার, ব্যবহার, শিক্ষা যাহাদের এখনও রক্ত-কণিকায় মিশ্রিত হইতে বিলম্ব আছে, কেবল তাহাদেরই এখনও পাপের ভয় আছে! আজকালকার শিক্ষিতদের অভিধানে ইহারা নিরক্ষর ও ঘৃণিত চাষা বলিয়া অভিহীত হইয়া থাকে।

শশিভূষণ বিনা বাধায় খরতর পঙ্কিল স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন,—আর হিরণ্ময়ী নাই যে, পদাঘাত লাঞ্ছনা মস্তকে পাতিয়া লইয়া শশিভূষণকে সুপথে ফিরাইবার চেষ্টা করিবে।

অতিরিক্ত সুরাপান ও বেশ্যাসক্ত হইলে মানুষের যাহা হইয়া থাকে, শশিভূষণেরও তাহাই হইল। নানারূপ দুশ্চিকিৎস্য কুৎসিত ব্যাধি শশিভূষণের কলুষিত দেহে আসন গাড়িয়া বসিল। প্রথম শশিভূষণ এই সমস্ত

ব্যাধিকে গ্রাহ্য করিলেন না। দিন দিন তাঁহার শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া আসিতে লাগিল। আহারে রুচি নাই, দেহে রক্ত নাই, চক্ষু কোটরগত! তত্রাচ শশিভূষণের অত্যাচারের বিরাম নাই। আরও কিছুদিন পরে শশিভূষণ নিস্তেজ ও উত্থানশক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। শশিভূষণ আর গৃহের বাহির হইতে পারেন না, সুতরাং শয্যাই শশিভূষণের একমাত্র সম্বল হইল। শশিভূষণ এই অবস্থাতেও বাগানবাটী ত্যাগ করেন নাই, অবশেষে চিকিৎসকগণের উপদেশে গৃহে যাইতে বাধ্য হইলেন।

হিরণ্ময়ীর গৃহত্যাগের পর হইতে শশিভূষণ গৃহে প্রবেশ করেন নাই। প্রায় ছয় মাসের পর লোক-জনের সাহায্যে পাল্কী করিয়া শশিভূষণকে দ্বিতল অট্টালিকায় তাঁহার শয়ন-ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। যতক্ষণ অর্থ, স্বাস্থ্য ও শরীরে বল থাকে, ততক্ষণ অগণিত বন্ধুও মানুষকে ঘিরিয়া থাকে। অর্থহীন হইলে বা রোগ-শয্যায় শয়ন করিলে, অতি অল্প সংখ্যক বন্ধুকেই নিঃস্ব বা রোগাতুর বন্ধুর পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই সংসারের নিয়ম! জগতে প্রকৃত বন্ধু কাহারও আছে কি না, জানি না! যদি কাহারও থাকে, তিনি বহু পুণ্যবান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শশিভূষণ নিঃস্ব না হইলেও ভীষণ ব্যাধির আক্রমণে শয্যাগত! এখন বারাঙ্গনা সঙ্গে নৃত্য গীত করিবার বা বিষাক্ত বিদেশী তরল পদার্থ উদরস্থ করিয়া বন্ধু বা মোসাহেবদের মনস্তুষ্টি করিবার শশিভূষণের ক্ষমতা নাই এবং বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি নাই। শশিভূষণ এখন রোগ-যন্ত্রণায় কাতর, যে সমস্ত বন্ধু বেশ্যা ও সুরা-পত্রের লোভে সর্ব্বদা শশিভূষণের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া থাকিত, একে একে তাহারা কর্পূরের ন্যায় কোথায় উধাও হইয়া চলিয়া গেল। যাহাদের অন্য স্বার্থ অথবা অর্থ লাভের আশা ছিল, তাহারাই শশিভূষণের রোগ-শয্যা ত্যাগ করিল না। কিছুদিন পরে ইহাদের মধ্যেও যাহারা দেখিল, তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তাহারা পীড়িতের শয্যা-পার্শ্বে স্বাস্থ্যনষ্ট করাপেক্ষা সেস্থান ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে করিল।

শশিভূষণের রোগ-যন্ত্রণা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে শশিভূষণ একদিন পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে পাপের সীমা অতিক্রম করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন,—অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যে যে শশিভূষণ ধরাকে সরা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিতেন,—ধর্ম্ম, কর্ম্মফল ও ভগবান আছেন বলিয়া যে শশিভূষণ কোন দিন মুহূর্ত্তের

তরেও মনে, করিতেন না, সেই শশিভূষণ অহরহঃ ভাবিতে লাগিলেন, হায়! ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল কড়া ক্রান্তি হিসাবে মানুষকে যে ভোগ করিতে হয়, তাহা জানিতাম না! আমার সব ছিল কিন্তু এখন কিছুই নাই! আমার স্তায় পাপীর ভার বহন করিতে জগৎ অশক্ত! আমার মৃত্যুই মঙ্গল! না! না! মৃত্যুতেও আমার পাপের ফল তিরোহিত হইবে না! মৃত্যুর পরেও পাপ আমার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইবে। শশিভূষণ যতই পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন, দুই গণ্ড-স্থল বহিয়া ততই অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল।

শশিভূষণ ভাবিতে লাগিলেন, আমার বল ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, অর্থ ছিল, সুখ দুঃখের সঙ্গিনী হিরণ্ময়ী ছিল, ছিল না কি? হায়! মানুষের দেহে কত সয়? নিজ অত্যাচারে দেহের স্বাস্থ্য, বল, চিরতরে এই পাপ দেহ ত্যাগ করিয়াছে! অর্থ সম্পত্তি পর-হস্তগত! কর্ম্মচারিবর্গ এখন যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহা হইলে দীন হীন ভিক্ষুকের স্তায় এই অবস্থাতেই মরিতে হইবে! রোগ-শয্যায় পড়িয়া অবধি প্রধান কর্ম্মচারীর ব্যবহারে শশিভূষণের মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল!

শশিভূষণ আবার ভাবিতে লাগিলেন, ধন সম্পত্তি

রসাতলে যাক! আমার হিরণ্ময়ী কোথা? আমি ভাল করিয়া এক দিনের জন্যও হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধান করি নাই! হায়! হিরণ্ময়ী জীবিত কি মৃত, তাহাও এপর্য্যন্ত অবগত হইবার চেষ্টা করি নাই! শশিভূষণের এইবার একটি একটি করিয়া সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। শশিভূষণ অনেকক্ষণ কাঁদিয়া হৃদয়ের একটু ভার কমাইয়া ফেলিলেন। অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া হিরণ্ময়ীর সেই প্রেম-ভালবাসার কথা ভাবিতে ভাবিতে শশিভূষণের রোগযন্ত্রণা যেন লাঘব হইতে লাগিল। শশিভূষণ ভাবিতে লাগিলেন, হায়! কে আমার হিরণ্ময়ীকে আনিয়া দিবে? আমি যদি আজ শয্যাশায়ী না হইতাম,—আমার উঠিবার যদি সামর্থ্য থাকিত, এই মুহূর্ত্তেই আমার হিরণ্ময়ীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইতাম।

হিরণ্ময়ী কোথায়, কি অবস্থায় আছে, জানিবার জন্য প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ম্যানেজার বাবু তখন প্রভু শশিভূষণের দুইখানি জমিদারি নীলামে চড়াইয়া শ্যালকের নামে খরিদ করিবার জন্য নিজ অর্দ্ধাঙ্গিনীর সহিত মনোনিবেশ সহকারে পরামর্শ করিতেছিলেন। এই স্থলে শশিভূষণের প্রধান কর্ম্মচারির সংক্ষেপে একটু পরিচয় দিব।

ম্যানেজারের নাম শিবকালী রায়। জাতিতে

কায়স্থ। ইহার কুটীল বুদ্ধির কাছে অতি বুদ্ধি-মান ব্যক্তিও পরাস্ত হইতেন। নিজ স্বার্থের জন্য অপরের সর্ব্বনাশ করিতে শিবকালী কখন ইতস্ততঃ করিত না।

ইহার পূর্ব্বাবস্থা অতি মলিন ছিল। কিন্তু নিজ বুদ্ধিবলে শিবকালী এখন প্রচুর ধনের অধিকারী! স্বগ্রামে পাঁচ শতাধিক বিঘা নিষ্কর জমী, পুষ্করিণী, বাগান প্রভৃতি শিবকালীর সৌভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। দুষ্ট লোকেরা গোপনে বলাবলি করে, শিবকালী জাল করা অপরাধে দুই বার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিল। কিন্তু এরূপ কথা শিবকালীর মুখের উপর বলিবার কাহারও সাধ্য ছিল না।

বহুদিন পূর্ব্বে শশিভূষণের নামে একটি নিরাশ্রয়া বিধবা ফৌজদারি মোকর্দ্দমা আনয়ন করেন। দিবা-লোকে মাতাল অবস্থায় শশিভূষণ এই বিধবার উপর অত্যাচার করিবার প্রয়াস পান। একটি সদাশয় ন্যায়-নিষ্ঠ ব্যবহারজীবী বিধবার পক্ষে একটি কপর্দ্দকমাত্রও না লইয়া এরূপ ভাবে মকর্দ্দমা পরিচালনা করিতে-ছিলেন যে, সকলেই মনে করিয়াছিল, শশিভূষণের এ যাত্রা নিষ্কৃতি নাই! বারের আইন ব্যবসায়ীগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, "বিচারক নিশ্চয়ই শশিভূষণকে

কারাবাসের অনুমতি প্রদান করিবেন।" কিন্তু শিব-কালী এরূপ ভাবে মকর্দ্দমার তদ্বির করিল যে, কারাবাস দূরের কথা, শশিভূষণ সসম্মানে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। সেই দিনই শশিভূষণ গৃহে আসিয়া শিবকালীকে প্রধান কর্ম্মচারি অর্থাৎ ম্যানেজারের পদ প্রদান করিলেন। শশিভূষণের ষ্টেটের ম্যানেজারি পদ পাইবার পর হইতে শিবকালীর ভাগ্যচক্র দ্রুতগতিতে ঘুরিতে লাগিল। শিবকালী সুবিধা পাইলেই প্রজার ও প্রভুর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া নিজ উদর-গহ্বর পূর্ণ করিত। শশিভূষণ শয্যাগ্রহণ করিবার পর হইতে এই অভ্যাসটা শিবকালীর পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে!

ম্যানেজার রায় মহাশয় শশিভূষণের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছেন বাবু? আপনি কি আমাকে ডাকিয়াছেন?"

শশিভূষণ প্রধান কর্ম্মচারীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ শিবকালী, তোমায় ডাকিয়াছি! আজ একবারও দেখিতে আস নাই কেন শিবকালী?"

শিব।—বড়ই কাজ পড়িয়াছে বাবু! নানা খরচ-পত্রের জন্য চারি দিকেই অর্থের টানাটানি হইয়াছে!

শশি।—সে কথা থাক্! এখন বল দেখি, যাহারা

হিরণ্ময়ীকে নৌকা করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা কোথায় ?"

শিব।—হুজুরের হুকুম মত তাহাদের সকলকেই ত বহুদিন পূর্ব্বে বিদায় দেওয়া হইয়াছে !

শশি।—আমার হুকুমে ?

শিব।—হাঁ, আপনারই হুকুমে।

শশি।—কৈ ! আমি এরূপ হুকুম দিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না ! আচ্ছা ! হিরণ্ময়ীর সংবাদ কিছু জান কি ?

শিবকালী। দুই একবার ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "চক্ষেত কিছুই দেখি নাই হুজুর ! পরের মুখে শুনিয়াছি।"

শশি।—কি শুনিয়াছ শিবকালী ?

শিব।—রাণী মা জাহ্নবী-বক্ষে—

কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই শশিভূষণ চিৎকার করিয়া উঠিলেন; দুই হস্তে বক্ষঃস্থল চাপিয়া উদাস-দৃষ্টিতে শিবকালীর পানে চাহিয়া শশিভূষণ অতিকষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আমার হিরণ্ময়ী এজগতে নাই ?"

শিব।—আমাদের দুরদৃষ্ট হুজুর ! ! তা না হইলে কি এই রাজ-অট্টালিকা শ্মশান-শ্রী ধারণ করে ?

শশিভূষণ বজ্রাহতের ন্যায় শিবকালীর মুখের দিকে

অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

হা হতভাগ্য শশিভূষণ। অমূল্য মুক্তার মালাকে ক্ষুদ্র কাঁচ বোধে তুমি হেলায় গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়া দিয়া বহুবিলম্বে খোঁজ করিতেছ ?

শশিভূষণের অশ্রুবারিতে রোগ-শয্যা প্লাবিত হইতে লাগিল, বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, আর এই পাপ-জীবন-ভার বহন করিয়া লাভ কি ? যেখানে আমার প্রাণ-প্রতিমা জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে, সেই অতল পুণ্য সলিলে এই পাপ জীবনের অবসান হউক। শশিভূষণ শয্যার উপর দুই হস্তের ভর দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন, পরিলেন না, হতভাগ্য শশিভূষণের উত্থান-শক্তিও অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। তবে কি পুণ্যবতী সতী সাধ্বী হিরণ্ময়ীর মত জাহ্নবী সলিলে জীবন বিসর্জ্জন আমার অদৃষ্টে নাই ? এককালে শত শত বৃশ্চিক আসিয়া শশিভূষণের হৃদয়ে দংশন করিতে লাগিল ! রক্তহীন, পাণ্ডুবর্ণ, দুর্ব্বল হস্তে বক্ষ চাপিয়া, অজস্র অশ্রুধারায় শীর্ণ গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতে করিতে শশিভূষণ প্রাণপণশক্তিতে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এস, আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী, একবার এস ! আমি তোমার কাছে অনেক অপরাধে অপরাধী !

তাই একবার এই মৃত্যুসময়ে ক্ষমা চাহিব। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত—অধর্ম্মের কঠোর দণ্ড স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে! এ সময় দয়া করিয়া একবার দেখা দাও হিরণ্ময়ী! আমি অধম পাপী বলিয়া তোমার মত পুণ্যবতীকে চিনিতে পারি নাই! হায়! কেন আমি অমৃতে উপেক্ষা করিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি হলাহল পান করিয়া মৃত্যুর তীরে উপনীত হইলাম! হিরণ্ময়ী! তুমি আমার অত্যাচারে হৃদয়ে অনেক যাতনা পাইয়া জাহ্নবীর শীতল বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ! তোমার সেই তীব্র জ্বালা কি জাহ্নবী-সলিলে জুড়াইবে? দাও হিরণ্ময়ী! করযোড়ে ভিক্ষা করিতেছি পতিত পাবনীর সুশীতল বক্ষে তোমার পার্শ্বে এই হতভাগ্যকেও একটু স্থান দাও! না! না! তোমার পার্শ্বে আমি—আমি স্থান পাইবার যোগ্য নহি! আমার স্থান নরকে! আমার পাপের কি সীমা আছে হিরণ্ময়ী? তোমার ন্যায় সতী সাধ্বীকে পদাঘাতে গঙ্গার অতল সলিলে নিক্ষেপ করিয়াছি, কত সতীর সতীত্ব-রত্ন ছলে, বলে, কৌশলে অপহরণ করিয়াছি, কত প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, কত লোকের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া পথের ভিখারী করিয়াছি! এই সব পাপের ফল কত জন্ম-জন্মান্তর ভুগিতে হইবে?

হায়! কেন কুসংসর্গে মজিয়াছিলাম? কেন সুধাবোধে রাশি রাশি হলাহল আনন্দে উদরস্থ করিয়াছিলাম? সেই সব কপটাচারী নরাধমের দল এখন কোথায়? হায়! ভাবিয়াছিলাম, তাহারা আমার বন্ধু। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, তাহারা কেবল আমার এই সোণার অট্টালিকায় শ্মশান অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই! মোসাহেব ও কপট বন্ধুরূপে মূর্খ শশিভূষণকে নরক-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছে। কোথায় গেল সেই পাপিষ্ঠ নরাধমের দল? ক্রোধ, ঘৃণা ও অনুতাপে শশিভূষণের বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল! শশিভূষণের গত জীবনের অগণিত পাপকার্য্য মনের মধ্যে নাট্যশালার যবনিকার ন্যায় একটির পর একটি উত্তোলিত হইতে লাগিল। শশিভূষণ দেখিতে পাইলেন, যেন তাঁহার সেই পূর্ব্বের অগণিত বন্ধুগণ লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত সুরার বোতল লইয়া শশিভূষণকে পান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে, আর বারাঙ্গণার দল নৃত্য করিতে করিতে শশিভূষণের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে! অদূরে হিরণ্ময়ী অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া স্বামীকে করযোড়ে যেন বলিতেছে, "এখনও ঐ সয়তান ও সয়তানীদের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া এস নাথ! এস নাথ, তোমার সতী সাধ্বী হিরণ্ময়ীর শূন্য বক্ষে

আশ্রয় গ্রহণ কর! আমার প্রেম, ভক্তি, ভালবাসার অচ্ছেদ্য বর্ম্মে তোমায় ঢাকিয়া রাখিবে নাথ! আমার হৃদয়ে থাকিলে তোমার আর অধঃপতনের ভয় নাই! আমার প্রেম ভালবাসার বর্ম্মে কুলত্যাগী ডাকিনীদের কপট ভালবাসার শরসন্ধান গরলমাখা মধুর বচন-বান সকলই ব্যর্থ হইবে! তোমার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

শশিভূষণ চিৎকার করিয়া উঠিলেন—ঐ যে! ঐ যে! আমার হিরণ্ময়ী! হিরণ্ময়ী! বারাঙ্গণার ছলনায় আর ভুলিব না, আর তোমার ভয় নাই! এবার আমায় মাপ কর হিরণ্ময়ী! এই যে আমার ছদ্মবেশী বন্ধুর দল! শশিভূষণ মোসাহেব ও বন্ধুর দলকে দেখিয়া প্রহার করিবার জন্য মুষ্টিবদ্ধ হস্ত উত্তোলন করিলেন, ক্রোধে দন্ত কড়মড় করিয়া শশিভূষণ রুগ্ন শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। ক্ষীণ, রুগ্ন, দুর্ব্বল শশি-ভূষণের শয্যায় উঠিয়া বসিবার শক্তি ছিল না! উত্তেজনাবশে লাফাইয়া উঠিয়া শয্যাপার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। শশিভূষণের মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিল, রক্তধারা বহিতে লাগিল, বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইল। শশিভূষণের জীবন-প্রদীপও বুঝি এইবার নিভিয়া যায়।

প্রভুর অবস্থা দেখিয়া লোকজন দৌড়িয়া আসিল।

সকলেই যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ডাক্তার ডাকিতে লোক ছুটিল। অল্প সময়ের মধ্যেই চিকিৎসকগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক চেষ্টায় রক্তপাত নিবারণ হইল, কিন্তু চিকিৎসকগণ রোগীর অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়া বোধ করিলেন না।

ম্যানেজার শিবকালী আসিয়া চিকিৎসকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "রোগীর অবস্থা কিরূপ দেখিতেছেন?"

চিকিৎসকগণ একবাক্যে বলিলেন, "রোগীর অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়া মনে করিতে পারি না। বহুদিন পূর্ব্বেই ইহাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। প্রস্রাবের দোষ, বাত, লিবারের যন্ত্র সকলই বিকৃত! জ্বরের বিরাম নাই। মস্তিষ্কেরও দোষ ঘটিয়াছে। ইহার উপর এই সাংঘাতিক আঘাত,—রক্তস্রাব! রোগীর দেহে বল থাকিলেও চিন্তার কারণ ছিল না। রোগীর অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, হঠাৎ হৃদয়ে কোনরূপ আঘাত পাইয়াছে। এ অবস্থায় ইহাঁর জীবনের আশা অতি অল্পই আছে।"

শিবকালী একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। ইহা সুখের কি দুঃখের তাহা বলিতে পারি না।

ভিজিট লইয়া ডাক্তারগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। শশীভূষণের তিন দিন এক অবস্থাতেই অতিবাহিত

হইল। চতুর্থ দিনে ক্ষণেকের তরে একটু জ্ঞান হইল, কিন্তু তাহা দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বাবস্থা মাত্র। পঞ্চম দিবসের প্রভাতে একটু জ্ঞান সঞ্চয়ের সহিত রোগী প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। বেলা অধিক হইতে লাগিল, প্রলাপ বন্ধ হইল! সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইতে আরম্ভ হইল! নাড়ীর অবস্থা শোচনীয়! দিবা অবসানের সহিত শশীভূষণের সমস্ত মৃত্যু-লক্ষণই প্রকাশ পাইল। আর বৃথা চেষ্টা বলিয়া চিকিৎসকগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। এইবার শশীভূষণের বল, গর্ব্ব, মান, অভিমান, অত্যাচার সকলই ফুরাইবে। শশীভূষণের প্রাণ-বায়ু অনন্তকালের স্রোতে কোথায় এবার ভাসিয়া যাইবে কে জানে? দেখিতে দেখিতে শশীভূষণের সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল! নাভীশ্বাস আরম্ভ হইল! হতভাগ্য শশীভূষণ যন্ত্রণায় এক একবার মুখব্যাদান করিতে লাগিলেন! ইহা কি মৃত্যু-যন্ত্রণা?

ক্রোড়পতি, লক্ষপতি, ধনবান ভূস্বামীগণ! তোমরা একবার আসিয়া শশীভূষণের মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে উপবেশন কর! মানব-জীবনের পরিণাম প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিবে! বুঝিতে পারিবে, জীবনের পরিণাম কি! শশীভূষণ আজ মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়া একা, নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল অবস্থায়, জানি না, কোথায় যাইতেছে! কে

জানে, সে দেশ কেমন? ধন, জন, অহংকার, গর্ব্ব, পরপীড়ন, অত্যাচার, জানি না, কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সে দেশে শশীভূষণকে আক্রমণ করিবে?

জীবন ও মৃত্যুর মাঝে কয়টা দিন। এই কয়টা দিন তুমি ধনগর্ব্বে সকলের অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে কর! কিন্তু মৃত্যুর তীরে আসিয়া দাঁড়াইলে সকলের অবস্থাই সমান দেখিবে! গর্ব্ব, অহংকার ত্যাগ করতঃ আশক্তিশূন্য হইয়া সংসারের কর্ত্তব্য পালন কর। পরোপকারে ব্রতী থাকিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হও! মৃত্যুর পর কি হইবে, তাহা মানব জ্ঞানের অতীত, সেই কঠিন সমস্যার দিনে,—সেই অজানিত দেশে পরোপকারের পুণ্য ব্রত ব্যতীত আর কেহই আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে না।—সকলই ভগবানের অংশ—পরোপকারই ভগবানের সেবাব্রত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পৌষ মাস। প্রবল শীত। রজনী দশ ঘটিকা অতীত হইয়া গিয়াছে। কন্ কনে শীতের ভয়ে কলিকাতার রাজপথ জনশূন্য। কেবল মাঝে মাঝে দুই চারিটি লোক শীতবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছে। নিতান্ত আবশ্যক ব্যতীত কেহই এই প্রবল শীতে গৃহের বাহির হয় নাই, সন্ধ্যার পর এক পস্‌লা বৃষ্টি হওয়ায় শীতের তীব্রতা অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে।

"দয়া ক'রে উপবাসী ব্রাহ্মণকে একটি পয়সা দাও বাবা!"

এই প্রচণ্ড শীতে রাজপথের উপর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কম্পিত-কণ্ঠে একব্যক্তি বলিতে বলিতে যাইতেছে, "দয়া ক'রে উপবাসী ব্রাহ্মণকে একটি পয়সা দাও বাবা!" ভিখারী যাহাকে দেখিতে পাইতেছে, তাহরে সম্মুখেই হাত পাতিয়া বলিতেছে, "দয়া ক'রে উপবাসী ব্রাহ্মণকে একটি পয়সা দাও বাবা!" সকলেই ভিখারির দিকে এক এক-বার চাহিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল; ভিখারির কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না।

ভিক্ষুকের গলদেশে অতি মলিন ছিন্ন যজ্ঞোপবীত। পরিধানে অতি জীর্ণ একখানি মলিন বস্ত্র। লাল পাড় শাড়ির অর্দ্ধখণ্ড ভিখারির ঊর্দ্ধ অঙ্গে বেষ্টিত থাকিয়া, শীত নিবারণ করিতেছে। তাহাও নানাস্থানে তালি দেওয়া। বোধ হয়, কোন কুলাঙ্গনা ভিক্ষুকের শীত নিবারণের জন্য এই অর্দ্ধখণ্ড বস্ত্রটুকু দান করিয়াছেন। ভিক্ষুকের চক্ষু কোঠরগত, দেহ শীর্ণ! অঙ্গের নানাস্থানে ক্ষতচিহ্ন! দুই একটি ক্ষতস্থান হইতে পুঁজ ও রক্ত নির্গত হইতেছে। ভিক্ষুকের কণ্ঠস্বর অতিকষ্টেই বাহির হইতেছে। ভিক্ষুকের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই বুঝা যাইতেছে, অনাহারে ভিখারী চলংশক্তি-হীন!

"দয়া ক'রে উপবাসী ব্রাহ্মণকে একটি পয়সা দাও বাবা!" অতিকষ্টে হাঁকিতে হাঁকিতে বিডন বাগানের মোড় হইতে ভিখারি গরাণহাটার মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। গরাণহাটা পাঁচু দত্তের গলি হইতে একটি বাবুর ব্রুহাম পবনবেগে আসিয়া ভিখারির ঘাড়ে পড়িল। টেরি-কাটা, বেলফুলের মালা গলে বাবুটি ভিখারিকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বাবুর সঙ্গিনী বারাঙ্গনাটি বলিল, "চল চল, ও সেই ভিখারিটা।" বাবুটী দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়ী হাঁকাইতে কহিলেন। গাড়ী পবনবেগে ছুটিয়া চলিল। বহুক্ষণ পরে ঢুলিতে ঢুলিতে একজন কনেষ্টবল আসিয়া

উপস্থিত হইল। সে অচৈতন্য ভিখারিকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিল। পাঠক! এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে কি?

ভিক্ষুকের এইবার পরিচয় দিব। ঐ যে শীর্ণ, দীন, রুগ্ন, ক্ষতবিক্ষত দেহ, অন্নবস্ত্রহীন অর্দ্ধমৃত ভিখারি ছেকড়া গাড়ী করিয়া হাঁসপাতালে যাইতেছে, এই ভিক্ষুক আমাদের পূর্ব্বপরিচিত পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথের কলিকাতার কারবারের প্রধান কর্ম্মচারী। পাঠক! শিহরিয়া উঠিবেন না! পাপের ফল বহুস্থলে ইহ-জন্মেই আরম্ভ হয়। কাহারও কাহারও পরজন্মের জন্য সঞ্চিত থাকে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের বর্ণিত ঘটনার পর চারি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আমরা এই চারি বৎসরের কথা সংক্ষেপে এই পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিব। পাঁচকড়ির জুয়াচুরির প্রমাণ সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া সমস্তই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পাঁচুই যে চক্রান্ত করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছিল, এবং অগ্নি প্রদানে সুরেন্দ্রনাথের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিবার পাঁচুই যে মূল, ইহার অকাট্য প্রমাণ সুরেন্দ্রনাথের হস্তে যথেষ্ট ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ইহাও অবগত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার ব্যবসার মূলধন পাঁচু কৌশলে বাহির করিয়া একটি বারাঙ্গনার সুখ-

ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিলে পাঁচুকে চিরদিনের জন্য কারাগৃহে বাস করিবার সুবিধা করিয়া দিতে পারিতেন; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের হৃদয় ভগবান কোন্ উপাদানে গঠিত করিয়াছেন জানি না! তিনি পাঁচকড়ির দণ্ড দিবার কোনই ব্যবস্থা করিলেন না। কেবল আকাশের দিকে চাহিয়া করযোড়ে বলিলেন, "ভগবান, পাঁচুকে সুমতি দিন! এবার ভগবৎ প্রেমের সে যেন আস্বাদ পায়।"

সুরেন্দ্রনাথের ব্যবসাদি নষ্ট হইয়া যাইবার পর পাঁচুর অর্থাভাব উপস্থিত হইল। নানাস্থানে চাকরির চেষ্টা করিতে লাগিল, সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। বেশ্যার ভালবাসা যে অর্থের বিনিময়ে, তাহা এতদিনের পর পাঁচু বুঝিতে পারিল। যে মূর্খ হতভাগ্য বেশ্যার নিকট প্রেম ভালবাসার আশা করে, তাহার ন্যায় বুদ্ধিহীন মূর্খ এজগতে আর নাই! পাঁচু এতদিনের পর বুঝিতে পারিল, "মূর্খ আমি,—মোহান্ধ হইয়া মনে করিতাম, সে আমাকে কতই ভালবাসে! এত দিনে বুঝিতে পারিলাম, পবিত্র প্রেম, ভালবাসা বেশ্যার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। যাহারা ব্যবসাদার, তাহারা লাভ লোকসান খতাইয়া দেখিবেই দেখিবে। কোন না কোন স্বার্থ সাধনের আশা না থাকিলে বেশ্যারা কখন ভালবাসা দেখায় না। তাহাদের

ইহা ব্যবসা! এই ব্যবসার জন্যই তাহারা আত্মীয়, স্বজন, কুল, মান, ধর্ম্ম, জাতি, পরকালের চিন্তা ত্যাগ করিয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে। যে নিজে মোহান্ধ, সেই ভাবে, "আহা! সে আমায় কত ভালবাসে।"

পাঁচু এই সমস্ত ভাবিত বটে কিন্তু হৃদয়-দুর্ব্বলতা ও মোহান্ধতার জন্য বারাঙ্গনাকে বিস্মৃত হইতে পারিত না! তিন চার মাস অতীত হইয়া গেল, বেশ্যাকে এক পয়সাও দিতে পারে না, ইহার উপর নিজের শতছিন্ন পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তন করিবে, এরূপ সঙ্গতী নাই। পাঁচু দুঃসময়ের বন্ধুদের নিকট ঋণগ্রহণের চেষ্টা করিল, কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু পাঁচুকে চিনিতেই পারিল না। অনেকে বাটীর মধ্যে থাকিয়াও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার করিল।

একদিন বারাঙ্গনা বলিল, "এরূপ করিয়া আর কেন জ্বালাতন কর, তুমি অন্য স্থানে বাসা কর!"

পাঁচু বারাঙ্গনার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি কি বল্‌চো বুঝিতে পারি না! এ কি রকম ইয়ারকি?"

বেশ্যা।—কচি খোকা আর কি! বুঝ্‌তে পার না। আমি স্পষ্ট বল্‌চি, তুমি আর এখানে এস না।

পাঁচু।—কোথায় তবে যাব? আর আমার কে আছে?

বেশ্যা।—যেখানে ইচ্ছা! তোমার জন্য ত আর মাসে দু'শ টাকা লোকসান করিতে পারিব না!

পাঁচু।—কিসে আমি তোমার দু'শ টাকা লোকসান কর্‌চি?

বেশ্যা।—একজন বাবুর সহিত দুই শত টাকা মাসে চুক্তি হইয়া গিয়াছে, তুমি থাকিলে তিনি আসিবেন না।

ক্রোধ ও অভিমানে পাঁচুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল — কথা বলিতে পারিল না, অনেকক্ষণ বসিয়া নীরবে রোদন করিল।

বহুক্ষণ রোদন করিয়া পাঁচু একটু প্রকৃতিস্থ হইল। ভাবিল, অনেকদিন কিছু দিতে পারি নাই বলিয়া, আমার উপর অভিমান হইয়াছে। মোহান্ধকারপূর্ণ লম্পটের হৃদয়ে এইরূপ নানা ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে।

কিছু অর্থ যোগাড় করিবার জন্য পাঁচু দুই দিন নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইল, কোথাও জুটিল না। তৃতীয় দিন রাত্রিকালে পাঁচু বারাঙ্গনা-গৃহে প্রবেশ করিল। রজনী তখন একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন আহার হয় নাই, সঙ্গে একটি পয়সাও নাই যে, এক পয়সার মুড়ি লইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

পাঁচুর প্রণয়িনী তখন তাহার নব-প্রেমিকের সঙ্গে রসালাপ করিতেছিল। নূতন বাবু বলিলেন, "লোকটাকে দূর করিয়া দাও।" বেহারা আসিয়া বলিল, "বাবু! বিবিজানের হুকুম, আপনি এখনি অন্যত্র চলিয়া যান, আর দেরী করিবেন না।"

পাঁচু সমস্তই শুনিল। অপমান ও অভিমানে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল; আর সহ্য করিতে পারিল না। ক্রোধে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বারাঙ্গনার কেশাকর্ষণ করতঃ বাহিরে টানিয়া আনিল। পাঁচুর ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া বারাঙ্গনার উদ্ধারের জন্য কেহই অগ্রসর হইল না। ইত্যবসরে বাবুর একজন গুণ্ডা বন্ধু আসিয়া পাঁচুকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। পাঁচু অচৈতন্যাবস্থায় রক্তধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল। দুই দিবস পরে যখন জ্ঞান হইল, তখন বুঝিতে পারিল, হাঁসপাতালের খাটিয়ার উপর সে শয়ন করিয়া আছে।

পাঁচুর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইবার কয়েক দিবস পরেই পাঁচু ওয়ারেণ্টে ধৃত হইল এবং জামিন অভাবে হাজত-গৃহই বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। মকর্দ্দমার শেষদিনে পাঁচু বুঝিতে পারিল যে, তাহার পূর্ব্ব প্রণয়িনী ও তাহার বর্ত্তমান বাবুর ষড়যন্ত্রে চুরির অভিযোগে ছয় মাসের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত

কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। পাঁচু নীরবে, বিচারকের মুখের দিকে চাহিয়া দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিল।

পূর্ব্বের বিবিধ অত্যাচারে এবং অতিরিক্ত সুরাপানে কারাগৃহেই নানা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি পাঁচুকে আক্রমণ করিল। চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্যবর্জ্জিত হইয়া পাঁচু কারাগৃহ হইতে বাহির হইবার পর ক্ষুধার যাতনায় রাজপথে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। রক্ত বিকৃত হওয়ায় তাহার শরীরের ক্ষত তাহার পাপ কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শরীরে শক্তি নাই, নানা ব্যাধিতে বল, মেধা, স্মৃতি সকলই তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। পীড়া বৃদ্ধি হইলে ভিক্ষার জন্য রাজপথে বাহির হইতে পারে না, সুতরাং অধিকাংশ দিনই উপবাসে দিনাতিপাত করিতে হয়, পাঠক পূর্ব্বেই ইহা অবগত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে যে ক্রহাম পাঁচুর বাম হস্তটির উপর দিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল, সেই ক্রহামের ভিতর পাঁচুর পূর্ব্বপ্রণয়িনী ও নূতন বাবু ছিলেন, তাহা বোধ হয় বুদ্ধিমান পাঠককে আর বলিতে হইবে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী রঘুনাথ বাবুর পত্রে সুরেন্দ্রনাথ অবগত হইলেন, শশিভূষণের কঠিন পীড়া! তাঁহার আর জীবনের আশা নাই। পত্র পাঠ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পীড়ার প্রথমাবস্থা হইতেই সুরেন্দ্রনাথ উদ্‌গ্রীব হৃদয়ে প্রত্যহ শশিভূষণের সংবাদ লইতেছিলেন, পরের মুখে সংবাদ লইবার সময় অতীত হইয়াছে ভাবিয়া, সুরেন্দ্রনাথ সেই মুহূর্ত্তেই শশিভূষণের গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই দুঃসংবাদ হিরণ্ময়ীকে প্রদান করিলেন না, কেবল শৈলবালাকে আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। শৈলবালা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। যাইবার সময় হিরণ্ময়ী বারবার সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইবে দাদা?

"একথা জানাইবার গুরুদেবের নিষেধ আছে দিদি!"

হিরণ্ময়ীর প্রশান্ত হৃদয়ে কিসের একটা তুফান উঠিল।

শৈলবালা হিরণ্ময়ীকে লইয়া ভগবৎ আরাধনায় বসিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সৌম্যমূর্ত্তি গুরুদেবের পদধ্যান করিতে করিতে নৌকায় উঠিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ তরণীতে বসিয়া গুরুদেবের ধ্যানে তন্ময় হইলেন। প্রভু! অকূলের কাণ্ডারি! শশিভূষণকে রক্ষা কর! শশিভূষণ এ জগৎ ছাড়িলে হিরণ্ময়ী একদিনও বাঁচিবে না! জানি না প্রভু, তোমার কি ইচ্ছা! প্রভু! আমার এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র জীবন দান করিলে কি শশিভূষণ বাঁচিবে না! গুরুদেব একবার এ বিপদে দেখা দাও! শশিভূষণ ও হিরণ্ময়ীর মঙ্গলামঙ্গল তুমি স্বচক্ষে দেখিয়া ব্যবস্থা কর প্রভু!

ঠিক এই সময়ে ধ্যানমগ্না শৈলবালা বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া বলিতেছেন, "কোথায় প্রভু! জানি না, জগতে কিসে মঙ্গল, কিসে অমঙ্গল হয়! তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় বাধা দিবার সাধ্য কাহার নাই! ত্রাসিত হৃদয়ে কম্পিত কণ্ঠে ডাকিতেছি, প্রভু! হিরণ্ময়ীকে রক্ষা কর,—শশি-ভূষণকে রোগমুক্ত কর! আহা! সরলা হিরণ্ময়ী স্বামীগত প্রাণা! অকালে অবলাকে মারিয়া জগতের কি মঙ্গল হইবে দয়াময়? আমার এই ক্ষুদ্র জীবন লইয়া শশি-ভূষণকে হিরণ্ময়ীর বক্ষে ফিরাইয়া দাও প্রভু!" দুই গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা আসিয়া শৈলবালার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল।

শশিভূষণের সর্ব্বাঙ্গ শীতল, মুহুর্মুহু নাভিশ্বাস হই-তেছে, বিকৃত মুখভঙ্গি করিয়া শশিভূষণ বারবার মুখ-

ব্যাদান করিতেছে! জীবন মৃত্যুতে অতি অল্পমাত্রই ব্যবধান আছে—এখনই শশিভূষণের জীবনবায়ু অনন্ত আকাশে মিশিয়া যাইবে! কয়েকজন কর্ম্মচারী ও ভৃত্য ম্লানমুখে প্রভুকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে! ঠিক এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ মুমূর্ষু শশিভূষণের শিয়রে যাইয়া উপবেশন করিলেন। করুণহৃদয় সুরেন্দ্রনাথ শশিভূষণের মৃত্যু সময় উপস্থিত দেখিয়া, ব্যাকুলপ্রাণে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"গুরুদেব! রক্ষা কর! রক্ষা কর! তুমি ভিন্ন হিরণ্ময়ী ও শশিভূষণের আর কেহ নাই! হিরণ্ময়ীর মস্তকে বজ্রপতন হইতেছে, পবিত্র হস্ত হিরণ্ময়ীর মস্তকে দিয়া বজ্রপতনে বাধা দাও প্রভু! দয়াময়! ডাকিবার শক্তি নাই! বড়ই অশুভ মুহূর্ত্ত প্রভু! সকলই ফুরাইল! হিরণ্ময়ী গেল! শশিভূষণ গেল! এদৃশ্য দেখিতে পারিব না প্রভো! আমার হৃদ্‌পিণ্ড লইয়া শশিভূষণকে দাও প্রভু! শশিভূষণের হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হউক। আমার দেহের সমস্ত রক্ত-কণিকা দিয়া শশিভূষণের রক্তহীনতা দূর কর প্রভু! হৃদয় অস্থির,—উদ্বেলিত! কি বলিয়া ডাকিব গুরুদেব? কি করিয়া ডাকিলে তুমি এ সময়ে দেখা দিবে?" গুরুদেব! গুরুদেব! বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ ব্যাকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের অশ্রুধারা গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করিল। "সত্যং শিবং সুন্দরম্ !" প্রাণারাম গম্ভির স্বরে চা'রদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। আবার প্রাণারাম মধুর স্বরে—"সত্যং শিবং সুন্দরম্ !" আজানুলম্বিত বাহু, সৌম্য প্রশান্তমূর্ত্তি, অট্টহাস্যে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া কমণ্ডলু হস্তে মুমূর্ষু শশিভূষণের মস্তক স্পর্শ করিলেন। স্বর্গীয় অমৃতস্বরূপ কমণ্ডলু হইতে পানীয় লইয়া সন্ন্যাসী শশি-ভূষণকে তিনবার পান করাইলেন। সুরেন্দ্রনাথ গুরু-দেবের পদে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। গুরুদেব আবার অট্টহাস্যে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন,—

"উঠ বৎস সুরেন্দ্রনাথ ! চাহিয়া দেখ, ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে ! শশিভূষণের এখনও কাল পূর্ণ হয় নাই। আমি বড়ই অসময়ে যোগাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। আমি চলিলাম, শশিভূষণের প্রাণের আশঙ্কা নাই। আর দ্বাদশ দণ্ড পরে শশিভূষণ নিরাময় হইয়া উঠিবে। শৈলবালা ধ্যানরতা হইয়া কাতর প্রাণে শশি-ভূষণের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে ! আমি শৈলবালাকে শুভ সংবাদ দিয়া এই মুহূর্ত্তেই হিমালয়ে ফিরিয়া যাইব।"

সুরেন্দ্রনাথ অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে, ভক্তিগদ্গদচিত্তে গুরুদেবের চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কোন্ শুভমুহূর্ত্তে চরণ দর্শন পাইব দেব ?"

"সময়ে আবার সাক্ষাৎ হইবে বৎস!"

"হরে মুরারে মধুকৈটব ভারে" এই পবিত্র গম্ভির স্বরে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল! এই পবিত্র মধুর স্বর বায়ুতে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। সুরেন্দ্রনাথ শশিভূষণের শীর্ণ মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

শশিভূষণ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন,—সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে দৃষ্টি নিপতিত হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবার চক্ষু মুদিত করিল। পীড়ার যন্ত্রণার চিহ্ন শশিভূষণের মুখমণ্ডলে আর পরিলক্ষিত হইল না। দ্বাদশ দণ্ড পরে শশিভূষণ শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। সুরেন্দ্র-নাথের আনন্দের সীমা রহিল না। সুরেন্দ্রনাথের দুই গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

শশিভূষণ নির্নিমেষ নয়নে সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ভাই তুমি? তুমি কি সেই দেবতা যাহাকে আমি এতক্ষণে স্বপ্নে দেখিতেছিলাম। কৈ, আপনার সঙ্গিনী সেই দেবী কোথায়? যিনি দুর্গন্ধপূর্ণ অতলস্পর্শ অন্ধকার গহ্বর হইতে আমাকে উত্তোলন করিবার জন্য আপনাকে ইঙ্গিত করিতেছিলেন। ও! কি ভীষণ স্বপ্ন!! না! না! সে

স্বপ্ন নয়! সত্যই আমি দু[illegible] অন্ধকার কূপে পড়িয়া ছটফট্ করিতেছিলাম। কে সেই দেবী? যিনি চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন, উত্তোলন কর! উত্তোলন কর! এখনই প্রাণে মারা যাইবে! উঃ! সেই গহ্বরের ভিতর কি বিষাক্ত কীটের দংশন-যন্ত্রণা! প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে! সে স্থানটা বুঝি জগতের নরক! আমার ন্যায় ঘোরতর পাপীর উপযুক্ত স্থানেই আমি পতিত হইয়াছিলাম! কেন আমায় সেই দেবী উত্তোলন করিতে আদেশ করিলেন? সেই দেবীর পার্শ্বে আর একটি দেবী! কে সেই দেবী? হিরণ্ময়ী? না! না! হিরণ্ময়ী গঙ্গাবক্ষে প্রাণের জ্বালা শীতল করিতেছে!

আহা! সেই মহাপুরুষ কে? যিনি সেই নিবীড় অন্ধকার গহ্বরে কৃষ্ণবর্ণ অজাগরের গ্রাস হইতে আমার এই চক্ষু দুটি রক্ষা করিলেন? কি সেই ভীষণ কৃষ্ণমূর্ত্তি অজাগর! আমার চক্ষু দুটি ভক্ষণ করিতে তাহার এত বাসনা হইয়াছিল কেন? বুঝিয়াছি! এই পাপ চক্ষুই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই পাপ চক্ষুর কলুষিত দৃষ্টি রূপরাশির উপর পতিত হইয়া কত কুলাঙ্গনার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে! এরূপ ঘোর অন্ধকার গহ্বর এই জগতে আছে বলিয়া কখন কল্পনাও করি না। তবে কি সে নরককুণ্ড? না! না! সহস্র সহস্র নরক-কুণ্ড একত্র

করিলেও এরূপ ভীষণ হয় না! কি ভয়ানক অন্ধকার গহ্বর! ঝড় ঝঞ্ঝাবাতপূর্ণ কোটী কোটী অমাবস্থার অন্ধকার একত্র করিলেও সে অন্ধকারের তুলনা হয় না! গহ্বর মধ্যে যে বায়ু বহিতেছে, তাহাতে যেন সহস্র সহস্র অনল-শিখা মাখান রহিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে কি ভয়ানক উত্তাপের দাহন! কি দগ্ধ যন্ত্রণা! আবার সে কথা মনে পড়িলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে! একদিকে ছায়ার ন্যায় অপ্সরি-নিন্দিত যুবতীগণ নৃত্যগীত করিতেছে, সে স্থানটা একটু রমণীয় বলিয়া মনে হইল। আমি মোহঘোরে সেই দিকে দৌড়িয়া যাইতে লাগিলাম, বাসনা তাহাদের সঙ্গলাভ! হরি! হরি! সে কথা মনে হইলে আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে! দৌড়িয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলাম, দূর হইতে যুবতীগণ আমাকে দেখিয়া বিদ্রুপের হাসি হাসিতে লাগিল! কি ভয়ানক হাসি! সে হাসিতে ভয়ে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার আমি দৌড়াইতে লাগিলাম! ছি! ছি! পাপ প্রবৃত্তিকে কিছুতেই দমন করিতে পারিলাম না। মৃত্যু হইলেও মানুষের প্রবৃত্তি বুঝি সূক্ষ্মাত্মাকে ত্যাগ করে না! সেরূপ ভীষণ অবস্থাতেও প্রবৃত্তি আমাকে পাপপথে আকর্ষণ করিতে লাগিল! আরও একটু অগ্রসর হইবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত কাল কুক্কুরের পাল চারিদিকে বেষ্টন করিয়া

আমাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল! প্রত্যেক দংশনেই আমার দেহের মাংস চর্ম্ম উদরস্থ করিয়া তাহারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিল। কি ভীষণ দর্শন ক্ষুধার্ত্ত সারমেয়! হিংস্রক ব্যাঘ্র ও ভল্লুকও তাহাদের ন্যায় নিষ্ঠুর প্রকৃতি নহে। সর্ব্বাঙ্গে শোণিতের ধারা বহিতে লাগিল! উহুঃ, কি ভয়ানক যন্ত্রণা! এমন সময় দেখিলাম, অদূরে একজন সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী! আমার হিরণ্ময়ী সন্ন্যাসীর পদতলে পড়িয়া "আমার স্বামীকে রক্ষা কর প্রভু,—রক্ষা কর প্রভু" বলিয়া ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিতে লাগিল! সন্ন্যাসী আমার দিকে করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"হিরণ্ময়ী তোমাকে রক্ষা করিতেছে! সাবধান! এ পথে কখন আর পদার্পণ করিও না! বারাঙ্গনা-সংসর্গই তোমার কলুষিত হৃদয়কে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে।" সেই মহাপুরু-ষের ইঙ্গিতমাত্র সারমেয় দল অদৃশ্য হইয়া গেল। দংশন যন্ত্রণায় ও অজস্র রক্তধারা দর্শনে চীৎকার করিতে করিতে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন দংশন-যন্ত্রণা তিরো-হিত হইয়াছে, অজস্র রক্তপাত বন্ধ হইয়াছে। যে স্থানে আমি অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম, এ সে স্থান নহে, সে স্থান অপেক্ষাও অন্ধকার, দুর্গন্ধময়, কর্দ্দমপূর্ণ স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি! কি ভয়ানক দুর্গন্ধ! মহামারীর সময়ে

শ্মশান ভূমিতে স্তূপাকারে নরদেহ পচিলে যেরূপ দুর্গন্ধ হয়, তাহা অপেক্ষাও সেই স্থানের দুর্গন্ধের তীব্রতা সহস্রগুণ অধিক! আমি যেন গলিত শবের মধ্যে শয়ন করিয়া আছি। নাসিকা জ্বলিয়া গেল,—দুর্গন্ধে হৃদ্‌পিণ্ড বাহির হইয়া পড়িল—উচ্চৈঃস্বরে পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। হায়! কোন দিকে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। কর্দ্দমে আমার কটীদেশ প্রোথিত—উঠিবার শক্তি নাই,—চীৎকার করিতে করিতে কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। সে যন্ত্রণা বাক্যের অতীত, চিন্তার অতীত, কল্পনার বহির্ভূত! অদূরে তোমায় দেখিতে পাইলাম। তুমি সেই সন্ন্যাসীর পদতলে পড়িয়া আমার উদ্ধারের জন্য ক্রন্দন করিতেছ! সন্ন্যাসী আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

"হিংসা, কুটীলতা, পর-অপকার, মাৎসর্য্য প্রভৃতিতে হৃদয় দুর্গন্ধপূর্ণ হইলেই এই কদর্য্য স্থানে আসিতে হয়। সাবধান! এ পথে আর পদার্পণ করিও না! ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখ, সরল চিত্তে পরোপকার করিয়া যাঁহারা জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন, তাঁহাদের জন্য সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে ঐ প্রাণারাম স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে! তুমি এখন সহস্র যোজন নিম্নে দুর্গন্ধময় কূপে পতিত! ঐ উচ্চ স্থানে সুগন্ধি মলয়ানিল অহরহঃ বহিতেছে, স্বর্গীয় পারিজাত-গন্ধে ও শুভ্র জ্যোৎস্না আলোকে মনে হইবে, বুঝি

কোটী কোটী চন্দ্র এখানে উদিত হইয়াছেন। পারিজাত-গন্ধে ইন্দ্রের অমরাপুরীকেও লজ্জা দিতেছে! অকপট, সরল, পরোপকারী ব্যক্তিকে জীবনান্তে অন্য জীবনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে উর্দ্ধে ঐ স্থানে আসিয়া অপেক্ষা করেন। আর যাহাদের পরোপকারে মতি নাই, হিংসা কুটীলতায় হৃদয় পূর্ণ, পরের অহিতাকাঙ্ক্ষী, কুসংসর্গে, কুচিন্তায়, কুকার্য্যে প্রবৃত্তি, তাহাদের অপেক্ষার জন্য এই স্থানই নির্দ্দিষ্ট!" ভাবিলাম, সংসারে যত প্রকার কুকার্য্য আছে, আমার দ্বারা সকল কুকার্য্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তবে আর আমার পরিত্রাণ নাই। উহুঃ, প্রাণ যায়! কি দুর্গন্ধ!

সন্ন্যাসী বলিলেন, "ইহার সঙ্গ ত্যাগ করিও না! ইনিই তোমায় উদ্ধার করিলেন, ধর্ম্মপথের সহযাত্রীরূপে জীবনের কয়টা দিন ইঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিও, তাহা হইলে আর এই ভীষণ নরকে আসিতে হইবে না।"

সহায়, সম্বল ও ত্রাণকর্ত্তা ভাবিয়া তোমার করুণা লাভের জন্য কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে তোমাকে ধরিতে গেলাম, পারিলাম না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম!

যখন আমার জ্ঞান হইল, দেখিলাম, অন্য এক স্থানে আসিয়া প্রকাণ্ড একটা কুম্ভকারের চক্রের উপর বসিয়া

বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছি! কি সে ভীষণ চক্র! কত যোজন ব্যাপিয়া সে চক্রের পরিধি তাহা উপলব্ধি করিতে পারে কাহার সাধ্য! চক্রের চারিদিক হইতে প্রবল অগ্নিশিখা আসিয়া সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে লাগিল। ঘূর্ণিত অবস্থায় দেহের অণুপরমাণু. দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন বায়ুর সহিত উড্ডীন হইতে লাগিল! তিল তিল করিয়া দেহের সকলই উড়িয়া গেল, রহিল কেবল হৃদ্‌-পিণ্ডটা!—মুহুর্মুহু অনল-শিখা আসিয়া যখন হৃদ্‌পিণ্ডটা দগ্ধ করিতে লাগিল, তখন কি বলিব সে যাতনার কথা!—ক্রন্দন করিয়া যন্ত্রণা লাঘব করিবারও আমার শক্তি রহিল না! ভাবিলাম, দেহের অবসানে মৃত্যু! আমার যদি মৃত্যু হইল, তবে অনুভব-শক্তি আসিল কোথা হইতে? তবে কি যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য মৃত্যুর পরেও আমার এই অনুভব-শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে? কাতরে ভগবানকে স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। জীবনে আর কখন ভগবানকে স্মরণ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না!

আবার সেই সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী অদূরে দাঁড়াইয়া আমার প্রতি সকরুণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। জানি না, কি অফুরন্ত করুণরাশী তিনি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে বলিলেন. "পার্থিব সংসারে অপার্থিব বস্তু ভুলিয়া "আমার" "আমার"

রবে স্বার্থ ও আসক্তি-বশে চিরজীবন ঘুরিয়া মরিলে পর-জীবনে এইরূপ করিয়াই ঘুরিতে হয়! তুমি ভগবানের নাম ভুলিয়াও মুখে আন নাই! প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে কখন ডাক নাই, তাই তোমার এই দুরবস্থা! প্রত্যেক কার্য্যই তাঁহার; তাঁহার প্রীত্যর্থেই সংসারে সমস্ত কার্য্য করিতেছ, এই ভাবিয়া অবশিষ্ট জীবনে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও। ধর্ম্ম ও ভগবানকে বিস্মৃত হইয়া এবং স্বার্থাগ্নি হৃদয়ে জ্বালিয়া অহর্নিশ সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইলেই এই ভীষণ পাপচক্রে পড়িয়া অনল-শিখায় হৃদ্‌পিণ্ড দগ্ধ হইবে। এই যে অনল-শিখা সহস্র জিহ্বা বিস্তার করিয়া তোমার হৃদ্‌পিণ্ডটা দগ্ধ করিতেছে, ইহা কেবল স্বার্থের ভিন্ন মূর্ত্তি! নিজস্বার্থ, সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও কুৎসিৎ আমোদ প্রমোদের জন্যই কেবল নিজেকে লইয়া মত্ত ছিলে, পরের স্বার্থ,—পরের স্বচ্ছন্দতা কখন চিন্তা কর নাই, তাই আজ তোমার এই দুর্দ্দশা! হঠাৎ সেই সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসীর চক্ষু দুটি বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। ভাবিলাম, আর আমার উদ্ধারের উপায় নাই! চিরকাল এই যন্ত্রণা আমায় ভোগ করিতে হইবে! সন্ন্যাসীর ক্রোধ প্রশমিত হইবার নহে। এমন সময় দেখিলাম, কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিয়া তুমি সন্ন্যাসীর পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলে। তোমার কাতর ক্রন্দনে সন্ন্যাসী দয়ার্দ্র চিত্ত

হইয়া করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। পরক্ষণেই আমার জ্ঞান হইল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলাম, তোমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া এই রুগ্নশয্যায় শয়ন করিয়া আছি! "কে ভাই তুমি? তুমি কি কোন দেবতা?"

শশিভূষণ সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া কাতর স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ শশিভূষণের চক্ষু দুটি মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—

"চিন্তা কি ভাই? মহাপুরুষের কৃপায় তুমি আরোগ্য লাভ করিয়াছ।"

"আরোগ্য লাভ করিয়াছি কি না জানি না, ভীষণ নরক-যন্ত্রণা হইতে তোমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া ক্ষণেকের জন্য পরিত্রাণ পাইয়াছি! সেই ভীষণ স্বপ্নের কথা বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না! এখনও আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।"

"ভয় নাই ভাই, প্রাণপণ শক্তিতে ভগবানকে ডাক। তিনিই সকল ভয় নিবারণ করিবার একমাত্র প্রভু!"

শশিভূষণ অনেকক্ষণ সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য করিয়া বল না ভাই! তুমি কি কোন দেবতা? যেই হও তুমি,

তুমি আমার ত্রাণকর্ত্তা! রক্ষা-কর্ত্তা! বল ভাই, পাপী শশিভূষণকে আর তুমি ত্যাগ করিবে না?"

"কেন ভাই, দেবতার নাম করিয়া অধমকে অপরাধী করিতেছ? আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ।"

শশিভূষণ চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। নির্নিমেষ-নয়নে সুরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ সুরেন্দ্রনাথ?"

"ধার্ম্মিক জমিদার পিতার অধুনা দীনহীন সন্তান সুরেন্দ্রনাথ।"

"কি বলিলে ভাই? তুমিই সেই সুরেন্দ্রনাথ? অসম্ভব! এ সময়ে আমাকে পরিহাস করিতেছ কেন ভাই? আমি বিপদাপন্ন,—মৃত্যুশয্যায় শায়িত! এ সময় পরিহাস ভাল নয়! বল ভাই, তুমি কোন্ সুরেন্দ্রনাথ?"

"পরিহাস কেন করিব ভাই? আমি সত্য কথাই বলিতেছি।"

"ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি দেবতা, একথা কেন সত্য হইবে না সুরেন্দ্রনাথ?"

অশ্রুপ্লাবিত বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ করিয়া শশিভূষণ বলিলেন, "দেখ সুরেন্দ্রনাথ! নরকের অগ্নি বক্ষে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে! এ অধম তোমার ক্ষমার অযোগ্য! কিন্তু ভুল হয় নাই ত? তুমি সত্যই সেই সুরেন্দ্রনাথ?

যিনি এই পাপিষ্ঠের ষড়যন্ত্রে দেশত্যাগী হইয়াছেন? যিনি নিরাশ্রয়া বিধবার সতীত্ব রক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই? যিনি এই নরাধমের সহস্র অত্যাচার অকাতরে নীরবে সহ্য করিয়াছেন? যাঁহার দেবোপম মূর্ত্তি এই নারকীকে নরক হইতে উত্তোলন করিবার জন্য স্বপ্ন রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন? আপনি সত্যই কি সেই সুরেন্দ্রনাথ? যাঁহার শুশ্রূষায় এই নূতন জীবন,—যাঁহার পবিত্র ক্রোড়ে এই লুণ্ঠিত মস্তক এখনও সতর্কে রক্ষিত হইতেছে? সুরেন্দ্রনাথ! তুমি কি মানব? সত্যযুগে মানবের মহত্বের কথা শুনিয়াছি, বিশ্বাস করি না! মানুষ কি শত্রুকে,—আমার ন্যায় পাপীকে এরূপ করিয়া ক্ষমা করিতে পারে? কামুক লম্পট আমি,—স্ত্রী-হত্যাকারী, নিরাশ্রয়া অবলার সতীত্ব-ধন-লুণ্ঠনকারী আমি – তুমি কি আমায় ক্ষমা করিবে ভাই?"

শশিভূষণ সুরেন্দ্রনাথের পদতলে পড়িয়া কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ শশিভূষণকে দুই বাহুদ্বারা বক্ষে বেষ্টন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই শশিভূষণ! ভুল সকলেরই হয়। তোমারও ভুল হইয়াছিল! কিন্তু ভাই! কাহার এমন সৌভাগ্য যে, জীবনের ভুল স্বচক্ষে এমন করিয়া দেখিতে পায়? যে অনুতাপাগ্নি তোমার হৃদয়ে

জলিয়া উঠিয়াছে, ইহাতেই তোমার পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে! আর ভয় কি ভাই? ভগবানের নির্দ্দিষ্ট পথে যাইতে চাহে না বলিয়া তিনি পদে পদে মানব-পৃষ্ঠে কষাঘাত করিতেছেন! কষাঘাতে যাঁহার চেতনা হয়, তিনিই তোমার ন্যায় পুণ্যবান্! ভাই! সংসারটা আর কিছুই নহে, কেবল সর্ব্বনিয়ন্তার সমীপে পৌঁছিবার পথ মাত্র! চাহিয়া দেখ শশিভূষণ! অগণিত নরনারী পথিকের বেশে এই সংসার-পথে বিচরণ করিতেছে! সকলেই জানে, সকলকেই একদিন না একদিন যাইতে হইবে। সকলেই জানে, চিরদিন থাকিবার এ স্থান নহে। ইহাও অনেকে জানে যে, চির বিরামের স্থান একটা কোথাও আছে। কিন্তু পথিক হইয়াও কেহ বা চিরদিন এখানে থাকিতে চায়—আসক্তিটা এই পথের উপর ছড়াইয়া দিয়া অঞ্চল বিছাইয়া বসিয়া পড়ে! কেহ বা ভাবে, পথিক আমরা—সম্মুখে গাঢ় অন্ধকার রজনী আগত, দিবালোকে দ্রুতপদে চলিয়া যাই! যাহারা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু সম্বন্ধ পাতাইয়া আসক্তিবশে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া দিবা অবসান করিয়া দেয়, ঘোর অন্ধকার নিশাগমনে তাহারাই বিপদে পড়ে। ঐ দেখ ভাই! সহস্র ঘোর অমানিশা একত্রিত হইয়া মহাকালনিশারূপে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দিবালোক বৃথাকার্য্যে

অপব্যয় করিয়া এই কালনিশা ডাকিয়া আনিয়াছি বলিয়া আমাদিগকে যেন ক্রন্দন করিতে না হয়। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা যাহাদের মুখ চাহিয়া স্বার্থের জন্য দিবালোকে কুপথে ঘুরিয়া নিঃসম্বল নিরাশ্রয় অবস্থায় মানুষ এই মহা-কালনিশার সম্মুখে আসে, তাহাদিগকে কেহই সাহায্য করে না। ধর্ম্ম ও ভগবৎ প্রেমের শুভ্র আলোকই এই আঁধারে তাহাদিগকে পথ চিনাইয়া দেয়!

সুরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে শশিভূষণ নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। বক্ষের উপর দিয়া শতধারা বহিয়া যাইতেছে। শশিভূষণ আজ জীবনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত! শশিভূষণ আজ অন্য জগতে! সুরেন্দ্রনাথের হাত দুটী ধরিয়া অশ্রুপ্লাবিত বক্ষে নির্নিমেষ নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া শশিভূষণ বলিতে লাগিলেন, "ভাই! চিরজীবন তোমার অনিষ্ট সাধন করিয়া আসিয়াছি, আমি তোমার চিরশত্রু! একবার বল ভাই! আমার সকল অপরাধ বিস্মৃত হইয়া আমায় ক্ষমা করিলে?"

"অপরাধ নহে শশিভূষণ, ভুল! ভুল কাহার না হয়? আমি চিরদিন তোমাকে বন্ধু ও সহোদরের ন্যায় ভাবিয়া আসিয়াছি, আজিও তাহাই ভাবি।"

উভয়ের চক্ষেই আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

"ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে দিন দিন যেরূপ ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, এখন হইতেই আমাদিগকে স্থান সঙ্কুলনের জন্য আরও কতকগুলি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে হইবে।"

"ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে কতকগুলি বালক আসিয়াছে?"

"দুই সহস্রেরও অধিক।"

"বড়ই আশা ও আনন্দের কথা! এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দে আমার হৃদয় উথলিয়া উঠিতেছে! বালক ও যুবকগণের পিতা ও অভিভাবকবর্গ এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাদের সন্তানগণকে অগ্রে ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এতদিনে তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, বালকগণ বাল্যকাল হইতে কুশিক্ষা-সলিলে ডুবিয়া থাকিয়া পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় সংসারে বিচরণ করিয়া বেড়ায়; তাহারা ইহকাল পরকাল বিস্মৃত হয়,—ধর্ম্ম ভুলিয়া যায়,—তাহারা যে ফল-মূলাহারী ঊর্দ্ধরেতা যোগী তপস্বীর সন্তান, একথা তাহাদের মনোমধ্যে কখন উদিত হয় না, প্রয়োজনীয় নানা অভাবের সৃষ্টি করে,

স্বার্থই তাহাদের মূলমন্ত্র হয়, অর্থ উপার্জ্জনই তাহাদের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে, সুতরাং জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চিন্তা করিবার অবসর পায় না। ইহারা যে হিন্দুর সন্তান—সে কথা তাহাদের মনে হয় না। ব্রহ্মচর্য্য অভাবেই হিন্দুজাতি অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে,—সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বালকগণকে বাল্যকাল হইতে অর্থকরী শিক্ষাপঙ্কে না ডুবাইয়া সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যাশিক্ষা দিলে তাহারা সুপথ চিনিয়া লইতে পারিবে। পূর্ব্বে সকলকেই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার জন্য গুরু-গৃহে বাস করিতে হইত। এখন সে নিয়ম দেশ হইতে উঠিয়া যাওয়াতেই দেশের এই দুর্দ্দশা!"

একদিন অপরাহ্ণে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বসিয়া শশিভূষণ ও সুরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বোক্তরূপে কথোপকথন করিতেছিলেন।

আমাদের পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের বর্ণিত ঘটনার পর তিন বৎসর দুই মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘ সময়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার স্থানাভাব, সুতরাং সংক্ষেপেই পাঠকবর্গকে শুনাইব।

শশিভূষণ রোগ-শয্যা হইতে উঠিয়া সুরেন্দ্রনাথকে মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ শশিভূষণের স্বাস্থ্য ও মনের উন্নতির জন্য তাঁহাকে সমভি-

ব্যাহারে লইয়া নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই পর্য্যটনে তাঁহাদের এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। শশিভূষণ সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গলাভে এবং নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া নূতন জীবন পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন হইবে না যে, শৈলবালা স্বামীর মনোভাব বুঝিয়া এই এক বৎসর হিরণ্ময়ী ও সুরবালাকে লইয়া ভগবৎ চিন্তায় স্বামীর বিরহ-যাতনা সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ ও শশিভূষণ তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিলে নির্ম্মলকান্তি, বরদাপ্রসাদ এক আনন্দ কৌতুকের আয়োজন করিলেন।—

বরদাপ্রসাদ, নির্ম্মলকান্তি ও সুরেন্দ্রনাথ শশিভূষণকে ধরিয়া বসিলেন, তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে।

বন্ধুত্রয়ের অনুরোধ শুনিয়া শশিভূষণ শিহরিয়া উঠিলেন! অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে বলিলেন,—"হিরণ্ময়ী অনন্তধামে! কয়টা দিন পরে তাহার সহিতই পুনর্ম্মিলন হইবে, আবার বিবাহ!"

বহু তর্ক বিতর্ক হইল। কিন্তু শশিভূষণের প্রতিবাদ বন্ধুত্রয় গ্রাহ্য করিলেন না।

এই বিবাহে শৈলবালা কিছুই আড়ম্বর করিতে দিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ ও শশিভূষণ এখন ব্রহ্মচারীর ন্যায়

জীবন যাপন করেন। সুতরাং নিরামিষাহারি ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ ব্রাহ্মণকুলতিলক কুমার রাজেন্দ্রনাথ এই বিবাহে সভাস্থ হইবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেন। উদারহৃদয় রাজেন্দ্রনাথ এই নিমন্ত্রণে উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

বাসরগৃহে নববধূ অশ্রুনীরে শশিভূষণের পদধৌত করিয়া বলিলেন, "স্বামিন্! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার চরণে অপরাধিনী।"

অদূরে গৌরী আনন্দে শঙ্খধ্বনি করিলেন। শৈলবালা তাড়াতাড়ি আসিয়া নববধূর মুখের বসন উন্মোচন করিয়া দিলেন।

শশিভূষণ যেন নূতন জগতে আসিয়া পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় নির্নিমেষ নয়নে হিরণ্ময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অশ্রুপূর্ণ লোচনে দুঃখানন্দে ভাসিতে ভাসিতে হিরণ্ময়ী কয়েক বৎসরের অতীত কাহিনী স্বামীর চরণে নিবেদন করিলেন।

বিবাহ রাত্রে শশিভূষণ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবশিষ্ট জীবনের কয়টা দিন কি ভাবে অতিবাহিত করিব?"

ব্রাহ্মণ-কুলতিলক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কুমার বলিলেন,—

"আমাদের ব্রহ্মচর্য্য, —আমাদের হিন্দুত্ব,—আমাদের দেশাচার যাহাতে এই ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার চেষ্টা কর! হৃদয়ের মলিনতা এখনও যদি থাকে, তবে ইহা সত্য যে, এই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই অমৃতের পথ দেখিতে পাইবে।"

তিনি আরও বলিলেন, "সমস্তই অবনতির পথে ভাসিয়া চলিয়াছে; "দেশাচার" ত্যাগ করিয়া বিদেশী আচার গ্রহণ করিয়াছে! ফলে দেশের অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। দেশীয় পোষাক পরিচ্ছদে, দেশীয় খাদ্যে আর হিন্দুর রুচি নাই। সকলেই কিম্ভূত-কিমাকারভাবে সজ্জিত হইয়া হিন্দুত্ব লোপ করিতে বসিয়াছে।"

ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ কুমারের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শশিভূষণ তাঁহার জমিদারীর সমস্ত আয় "ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম" স্থাপনের জন্য দান করিলেন।

ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ কুমার রাজেন্দ্রনাথ তারস্বরে দেশবাসীকে যাহা বুঝাইতেছেন সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়া শশিভূষণকে বলিলেন,—

"এক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভিন্ন দেশবাসীর আচার ব্যবহার অনুকরণ করিলে তাহাকে Traitor বা বিশ্বাসঘাতক বলা যায়। যে দেশের গগন পবনে আমি নিশ্বাস

প্রশ্বাস ফেলিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, যাহার ফল শস্তে আমি উদর পূর্ণ করিয়া সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি, যে দেশের অঙ্কে আমি আজীবন লালিত পালিত, সে দেশের সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যদি আমি দেশান্তর নীতির অনুসরণ করি, তাহা হইলে আমার ন্যায় মহাপাতকী মূর্খ আর কে আছে?" *

এই কয় মাসের মধ্যেই "ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম" ছাত্র সংখ্যায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই সুরেন্দ্রনাথ শশিভূষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে কতকগুলি বালক আসিয়াছে?"

শশিভূষণ বলিলেন, "দুই সহস্রের অধিক।"

শশিভূষণের এখন প্রধান কার্য্য যাহাতে সকলেই প্রকৃত হিন্দু হইয়া দেশাচার প্রতিপালন করে। তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত সম্পত্তি এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। নিরাশ্রয়া বিধবাগণ যাহারা এই "ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের" অন্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে, তাহাদের সেবা শিক্ষার ভার হিরণ্ময়ী ও শৈলবালা গ্রহণ করিয়াছেন। বিদেশীভাবাপন্ন উচ্ছৃঙ্খল হিন্দুগণ এখন বুঝিয়াছে, বিধবা বালিকাকে ব্রহ্মচারিণীরূপে প্রস্তুত করিলেই তাহাদের

* "দেশাচার" শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত।

ঐহিক ও পারত্রিক সুখ লাভ হয়। দৈহিক সুখের জন্য "বিধবা বিবাহের" সোর গোল করা কর্ত্তব্য নহে।

সুরেন্দ্রনাথ, শশিভূষণ, হিরণ্ময়ী ও শৈলবালা এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে ভগবৎ চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া অমৃত-পথের পথিক হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের আদর্শ ও চেষ্টায় হিন্দুজাতির মতি-গতিও দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

সুরবালা এখন প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী! শশিভূষণ সুর-বালাকে আপন জননীর ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন।

পাঠক! শান্তির আলয় হিন্দুর প্রকৃত শিক্ষাস্থল—যদি দেখিতে চাও, এই "ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের" কথা হৃদয়ে কল্পনা কর।

সুরেন্দ্রনাথের ম্যানেজার রঘুনাথ এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে যোগীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। শশিভূষণের ম্যানেজার শিবকালীর কথা একটু বিশদভাবে বলা আবশ্যক। যে দিন শশিভূষণ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সেই দিন শিবকালী প্রভুর মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া বড় বড় জমিদারীগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য দলিলাদি লইয়া জেলা কোর্টে যাইবার জন্য যাত্রা করিল। ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র ট্রেন ছাড়িয়া দিল। সেই ট্রেনে না যাইলে কার্য্যের সুবিধা হইবে না, সুতরাং শিবকালী প্রাণপণ

শক্তিতে দৌড়িয়া ট্রেনে উঠিতে গেল। ট্রেন তখন হুস্ হুস্ শব্দে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ছাড়িয়া দিল। শিবকালী গাড়ীর নিম্নে পড়িয়া অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত হইল। এদিকে পাঁচু কয়েক বৎসর অসহনীয় রোগ-যাতনা ও অব্যক্ত দুঃখ-দৈন্য ভোগ করিবার পর তাহার মৃত্যু হইল। পাঁচু আরও দুইচারি দিন জীবিত থাকিত, কিন্তু ভীষণ অসহনীয় ক্ষতযন্ত্রণা ও ক্ষুধার তাড়না এবং ক্ষতোপরি মক্ষিকার দংশন আর সহ্য করিতে পারিল না। একদিন প্রত্যূষে অতি কষ্টে হাঁটু গাড়িয়া আসিয়া একটী বড় লোকের দ্রুতগামী ব্রুহামের নিম্নে গলা বাড়াইয়া দিল। পাঁচুর কৃশ মস্তক শকটতলে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়া রহিল। জমিদার বাবু অশ্বের পৃষ্ঠে কষাঘাত করিয়া নিমিষের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন, একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

"মানবচিত্র" এইখানেই শেষ হইল।

উপসংহার

পাঠক! আমার জীবনের অবশিষ্ট কথা "মানব-চিত্রে"র উপসংহারে আপনাদিগকে শুনাইব প্রতিশ্রুত ছিলাম। "মানবচিত্রে" অনেক চিত্র দেখিয়াছেন। আমার জীবনের অবশিষ্ট কথায় বিশেষ কিছু লাভ নাই। কেবল প্রতিশ্রুত পালনের জন্য দুই একটি কথা বলিব।

আমার জীবনের দুঃখের কাহিনী আপনারা পড়িয়াছেন কিন্তু সুখও পর জীবনে যথেষ্ট ভোগ করিয়াছি। কিন্তু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পার্থিব দুঃখেও সুখ নাই—সুখেও সুখ নাই! হা অন্নেও সুখ নাই—অতুল ধনৈশ্বর্য্যেও সুখ নাই! একটি পয়সার জন্য লালাইত হইয়া পথে পথে বেড়াইলে যেরূপ সুখ পাওয়া যায় না, অগণিত স্বর্ণমুদ্রা হাতে থাকিলেও প্রকৃত সুখ তদ্রূপ সুদুর্লভ। আমি কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় লক্ষপতি ক্রোড়-পতিকে—দেশের রাজা মহারাজাকে সুখী ভাবিতাম, কিন্তু এখন বুঝিয়াছি, সেটা আমার দারুণ ভ্রম। তাঁহাদেরও আত্মা প্রকৃত সুখ লাভের জন্য হাহাকার করিতেছে—প্রকৃত সুখ লাভের জন্য তাঁহাদের পিপাসিত আত্মা—

শান্তিবারির আশায় ঊর্দ্ধপানে অহরহঃ চাহিয়া আছে! অবস্থা সকলেরই সমান! কপর্দ্দকহীন দুঃখ দৈন্যগ্রস্থ নিরাশ্রয় পথের ভিখারী অপেক্ষা ইহাঁদের দীর্ঘশ্বাস আরও ভীষণ!

প্রকৃত সুখ ভগবানে আত্মনির্ভর,—প্রকৃত সুখ ভগবদ্ চিন্তা,—প্রকৃত সুখ—অমৃতের সন্ধান! অর্থ সম্পদে সুখ-লাভ কাহারও কখন হয় না,—হইবেও না!

এস "মানবচিত্রের" পাঠক আমরা প্রকৃত সুখলাভের জন্য অমৃতের পথে যাত্রা করি।

সাতকড়ি শর্ম্মা।

যেন কি নূতনত্বের আস্বাদ পাইলেন। ইহা এক ধারে গল্প উপন্যাস ইতিহাস শিক্ষা উপদেশ—এক ধারে সতীধর্ম্ম এক নিষ্ঠা নিষ্কাম ব্রত ও ভক্তির জয়। ইত্যাদির উজ্জ্বল চিত্র।

বর্ত্তমান স্রোত না ফিরাইলে বাঙ্গালী পৃথিবীর ইতিহাস হইতে লোপ পাইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। "জীবন সংগ্রামের" নায়ক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণমোহন আমাদের আদর্শ হওয়া উচিৎ। সংসারী অথচ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী অথচ মত্তহস্তীর ন্যায় বলশালী—পাপীর দণ্ডবিধানদাতা সতীর সতীত্বরক্ষক প্রগাঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা পরায়ণ পরের বিপদে নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া তাহাকে রক্ষা করা—ইহাই কৃষ্ণমোহনের চরিত্র। তখন বাঙ্গালী কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, দানবীর তেজস্বী, ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ ছিল। তখন বাঙ্গালীর পরোপকার প্রবৃত্তি অতি প্রবল ছিল। সভ্যতা জানিত না অথচ তাহাদের সভ্যতা এখন জগতের সকলে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। স্থুল কথায় বলিতে গেলে ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি আছে।

কি কি আছে ?

১। একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর সমাজ ও সংসার কিরূপ ছিল।

২। তেজস্বী নায়ক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ মোহন কিরূপ বীর্য্যবান কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মচেতা ছিলেন।

৩। বাঙ্গালী যে এক সময়ে মহা বলবান ও পরাক্রমশালী ছিল তাহা কৃষ্ণমোহন চরিত্রে সম্যক বুঝিতে পারা যায়।

৪। সন্ন্যাসী দয়ানন্দ, কৃষ্ণমোহন, দয়ানন্দের গুরু, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের শঙ্কর দেব, রামানন্দ ও সুখানন্দের পরোপকার প্রবৃত্তি, বিপদে অকুতোভয়তা, নিরাশ্রয় নিরন্ন ব্যক্তির জন্য জ্বলন্ত ত্যাগস্বীকার পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে তখন বাঙ্গালী কি ছিল এবং এখন কি হইয়াছে।

৫। মূর্খ ও নীচ জাতি রামতনু বাগদীর প্রভুভক্তি ও পরোপকারিতার কথা পাঠ করিলে কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন না।

৬। দেবীপ্রতিমা ব্রাহ্মণের বিধবা ষোড়শী শরৎকুমারীর অচলা পতি ভক্তি, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা, ম্যালেরিয়া বৎসরে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া নিরাশ্রয় ও আর্ত্তের সেবাব্রত ইত্যাদি পাঠ করিলে ভাবিবেন যে সার্থক এই বঙ্গভূমি— যিনি শরৎকুমারীর ন্যায় কন্যা বক্ষে ধারণ করিয়া ছিলেন। এই প্রকার সন্তান আবার আসিবে কি!

৭। ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃ প্রেমের সত্য ঘটনা পূর্ণ দুইটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইহাতে আছে। এই প্রকার উপন্যাস জগতে অতি দুর্লভ।

পুস্তকের পরিচয়।

(১) সুন্দর কাগজ। (২) উৎকৃষ্ট কালীতে ছাপা। (৩) চামড়ার স্বদেশী বাইণ্ডিং, বাঁধান ঠিক বিলাতীর মত (৪) সাইজ রয়েল ১৬পেজী—২৮ফর্ম্মা ৪৪৬ পৃষ্ঠা। (৫) প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে বাঁধান। (৬) পুস্তকে অন্যান্য ছবি ব্যতিত নায়ক নায়িকা ও গ্রন্থকারের হাফ্‌টোন চিত্র আছে। (৭) সোণার জলে নাম লেখা। (৮) এই সুবৃহৎ পুস্তক ৪৪৬ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ অথচ মূল্য অতি সুলভ মাত্র এক টাকা চারি আনা। ভিঃ পিঃতে লইলে ৵৹ অধিক পড়ে।

প্রকাশক—মণিলাল এণ্ড কোং।

জুয়েলার্স এণ্ড গোল্ডস্মিথ।

৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রকাশকের নিকট লইলে ভিঃ পিঃ ব্যয় লাগিবে না।

প্রশংসা পত্র।

জীবন সংগ্রাম সম্বন্ধে যে সমস্ত বিখ্যাত বিখ্যাত সংবাদ পত্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন স্থানাভাবে আমরা তন্মধ্যে কয়েকখানি উদ্ধৃত করিলাম।

বঙ্গের বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংবাদ পত্র তাহা কেনা জানেন? ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট এই পত্রের সম্মানের কথা সকলেই অবগত আছেন। ধার্ম্মিক চুড়ামণি স্বর্গীয় শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের অনুজ শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় অমৃতবাজারে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"JIVAN SANGRAM.—This is a story in Bengali by Babu Rampada Banerjee. The book is nicely bound and is priced at Re 1 annas 4 only. We are told that the story is drawn from actual life. But, whether it is a fact or not, it is quite natural and life-like. The characters are delineated in such a ma-

nner as to make them not only. attractive but highly instructive to the reader The author himself seems to be a man of piety and has shewn in his book quite successfully how a really good man with honest intentions to serve himself and others is bound to he rewarded by God with fulfilment of his object. It is a book of 446 pages every page being replete with usful matters which every body will find both interesting and instructive. We recommend it to all house-holders, as it is books of this nature which may produce real good to society, In a short narrative which forms an off-shoot of the main story the author has held up to the gaze of the reader four brothers who shew the ideal of brotherly love in a family which was doomed but is saved by love alone. We wish the publication every success,

Amaita azar Patrika 7th August 1910,

ইহার বঙ্গানুবাদ।

জীবন সংগ্রাম—শ্রীযুক্ত বাবু রামপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ইহার লেখক। পুস্তকখানির বাঁধাই অতি সুন্দর এবং মূল্য ১।৹ মাত্র। আমরা শ্রুত হইলাম পুস্তকখানি একটী সত্য ঘটনার অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে, যদি

তাহা না হইয়াও থাকে ইহার ঘটনা বড়ই স্বাভাবিক এবং সমগ্র জীবনের ছায়া প্রত্যেক চরিত্রে পূর্ণ প্রতিভাত। কেবল যে ইহার বর্ণনা অতি মধুর তাহা নহে প্রত্যেক পাতায় শিক্ষা লাভ করিবার অনেক জিনিস আছে। লেখা দেখিয়া বোধ হয় গ্রন্থকার একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি—কারণ এই উপন্যাসে ধর্ম্মপথের পথিক হইলে ভগবান কি করিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন—তাহা অতি বিশদরূপে দেখান হইয়াছে। পুস্তকখানির ৪৪৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠা নীতিপ্রদ শিক্ষাপ্রদ এবং কৌতুহলময়ী। আমরা প্রত্যেক হিন্দু পরিবারকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি; কারণ এই প্রকার পুস্তক দ্বারা সমাজের শিক্ষা করিবার অনেক বিষয় আছে। মূল আখ্যায়িকা ছাড়া গ্রন্থকার একটী সুন্দর ভাতৃ প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। এই গল্পটী অতি শিক্ষাপ্রদ এবং প্রাঞ্জল। আমরা রামপদবাবুর সম্পূর্ণ উন্নতি কামনা করি।

অমৃত বাজার পত্রিকা।—৭ আগষ্ট ১৯১০।

সাপ্তাহিক ও বাইউইকলি অমৃত বাজারের মতামত স্থানাভাবে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। ক্ষমা করিবেন।

বঙ্গমাতার সুযোগ্য সন্তান—তেজস্বী কর্ম্মবীর অসাধারণ বাগ্মী দেশপূজ্য দেশ নায়ক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁহার

সম্পাদিত ইংরাজি দৈনিক বেঙ্গলীতে জীবন সংগ্রাম সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন—

JIVAN SANGRAM. The above is the title of a book from the pen of abu Rampada Bandopadhya, author of Manab Chitra, etc. It ls stated that the story is not a fiction but based on real facts. The object of the author in placing this book before the public is to show how one can attain the great object of life by constantty treading the path of duty combating the difficulties that lie on the way. How farhe has succeedee in his object it is for the readers to judge. One may find in it many things instructive and interesting. It is well gotup and nicely bound in cloth. We can safely recommend it to all lovers of Bengali literature as it is the book which may bring real good to the society. We wish Rampada Babu every success.

বঙ্গানুবাদ।

জীবন সংগ্রাম।—মানবচিত্র ইত্যাদি পুস্তক প্রণেতা বাবু রামপদ বন্দোপাধ্যায় ইহার গ্রন্থকার। পুস্তকে বর্ণিত আছে যে ইহা উপন্যাস নহে—বাস্তব

ঘটনার সমষ্টি লইয়া উপন্যাস ছলে ইহা বিবৃত। পুস্তকের এই উদ্দেশ্য যে কি প্রকারে জীবনের পথে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কর্ত্তব্য নিষ্ঠা পরিচালনাকরা যায়। ইহাই গ্রন্থকার নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন। এই পুস্তকে শিক্ষা করিবার চিত্তাকর্ষক অনেক জিনিস আছে। ইহার মুদ্রাঙ্কণ এবং বাঁধাই অতি সুন্দর। অনেক গুলি ছবি আছে। আমরা নিঃসন্দেহচিত্তে ইহা বাঙ্গালী উপন্যাস প্রিয় পাঠক-দিগকে পড়িতে অনুরোধ করি। কারণ এই প্রকার পুস্তক পাঠেই সমাজের অনেক মউন্নতি হইয়া থাকে। আমরা রামপদ বাবুর সাফল্য কামনা করি।

মুসলমান সমাজের মুখপত্র ইংরাজী সাপ্তাহিক মুসলমান কি লিখিয়াছেন দেখুন :

Jiban Sangram—This is a novel written by Rampada Banerjee published by Messrs Mani Lal & Co of 40 Garanhatta Street, Calcutta Price Rs. 1-4. It purparts to give a true picture of the social life of the Bengalee Hindus and we have no hesitation in saying that he has spared no pains to avail himself of every possible opportunity in making the book up to the mark. The book is really worth reading. The distinguishing feature of the book is its easy style. The printing and get up are all that is desirable.

বঙ্গানুবাদ।

জীবন সংগ্রাম—উপন্যাস—বাবু রামপদ বন্দোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা এবং ৪০ নং গরাণহাটার জুয়েলার মণিলাল এণ্ড কোং প্রকাশক। মূল্য ১।০ মাত্র। হিন্দু সমাজের ছবি লইয়া ইহা গঠিত এবং আমাদের বলিতে কোন বাধা নাই যে গ্রন্থকার পুস্তকাখানি উচ্চ শ্রেণীর করিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন। পুস্তকখানি বাস্তবিকই পাঠের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। ইহার বিশেষত্বঃ ইহার প্রাঞ্জল এবং সরল ভাষা। মুদ্রাঙ্কন অতি সুন্দর।

মুসলমান সমাজের একমাত্র বাঙ্গলা সাপ্তাহিক মোহাম্মাদী কি লিখিয়াছেন:—

জীবন সংগ্রাম। শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত জীবন সংগ্রাম পুস্তক সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। হিন্দু নায়ক নায়িকার চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া পুস্তকখানি মুসলমানের অপাঠ্য নহে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে গভীর শিক্ষা লাভ করা যায়। এইরূপ শিক্ষাপূর্ণ পুস্তকই দেশে ও সমাজে বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। জীবন সংগ্রাম বাস্তবিক জীবন সংগ্রামেরই পথ প্রদর্শক। পাঠক! যদি আপনার জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, একবার জীবন সংগ্রাম পাঠ করুন। পুস্তকে যেমন ভাষার লালিত্য তেমনি ভাবে পরিপূর্ণ। ছাপা এবং কাগজ

অতি সুন্দর। এক কথায় বলিতে গেলে, এই বলা যাইতে পারে যে পুস্তক খানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যে পুস্তক খানি প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য। শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার গ্রন্থকার। মূল্য ১।০ সিকা মাত্র।

"বসুমতি" "রঙ্গালয়" "নায়ক" প্রভৃতি সংবাদ পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও নানাবিধ গ্রন্থ প্রণেতা এবং বর্ত্তমান লব্ধপ্রতিষ্ঠ "হিতবাদী" সংবাদ পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত ভারত বিখ্যাত "হিতবাদী" সংবাদ পত্রে "জীবন সংগ্রাম" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"জীবন সংগ্রাম"—শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ১।০ সিকা মাত্র। সুন্দর লেখা—চরিত্র চিত্রণ উৎকৃষ্ট। ব্রাহ্মণ কৃষ্ণমোহনের চরিত্র, দেবতার আশ্রমের শঙ্করদেব, রামানন্দ ও সুখানন্দের চরিত্র, অশিক্ষিত রামতনু বাগ্দী ও বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা শরৎ কুমারীর চরিত্র গ্রন্থকার যেরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে গ্রন্থকারকে শতমুখে প্রশংসা করিতে হয়। তেজস্বী স্বধর্ম্মরত, জ্ঞানী, সংযমী, কৃষ্ণমোহনের ন্যায় ব্রাহ্মণ আজকাল বিরল, তাই গ্রন্থকার আকুল কণ্ঠে

আমাদের দেশের যুবকগণকে কৃষ্ণমোহনের ন্যায় প্রতিভা-শালী হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় গ্রন্থকারের এই ব্যাকুল প্রার্থনা একবারে ব্যর্থ হইবে না। "জীবন সংগ্রাম" খানি বালক ও যুবক এবং তাহা-দের অভিভাবক বর্গকে আমরা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থকার এই পুস্তক খানি দীনদুঃখির সেবার্থে "আশ্রম" প্রতিষ্ঠার জন্য দান করিয়াছেন। আমরা জানি বাঙ্গালীর এখনও মনুষ্যত্ব আছে সুতরাং "জীবন সংগ্রামের আদর হইবে এবং জীবনের উন্নতির জন্য সকলেই ইহা ক্রয় করিবেন। "হিতবাদী"

অমৃতবাজার অফিস হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণব সমাজের মুখপত্র বাঙ্গলা সাপ্তাহিক আনন্দ বাজার পত্রিকা, কি লিখিয়াছেন একবার দেখুন :—

সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত ও আনন্দ বাজারের সুলেখক শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "জীবন সংগ্রাম" নামক একখানি পুস্তক সমালোচনার জন্য আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি সুন্দর। ইহাতে গ্রন্থকারের একখানি হাফটোন ছবি আছে। পুস্তকখানি ৪৪৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। আজকাল যে ধরণের নাটক নভেল বাহির হইতেছে "জীবন সংগ্রাম" সে ধরণের পুস্তক নহে। ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে শস্যশ্যামলা

সামর্থ্য, ধর্ম্মভাব, পরোপকার প্রবৃত্তি বঙ্গভূমির কিরূপ অবস্থা ছিল, বঙ্গবাসীর কিরূপ বলবীর্য্য ছিল, তাহার সুন্দর চিত্র গ্রন্থকার অঙ্কিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠকবর্গকে একবার পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ইহা পড়িবার জিনিষ, কন্যা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্রকে পড়াইবার জিনিষ। ইহাতে শিক্ষার বিষয় অনেক আছে। এই পুস্তকের আয় "দরিদ্র আশ্রম" প্রতিষ্ঠার জন্য দান করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ কৃষ্ণমোহনের চরিত্র, "দেবতার আশ্রমের" শঙ্করদেব, রামানন্দ, সুখানন্দ, অশিক্ষিত রামচন্দ্র বাগ্দী, ও বিধবা-ব্রাহ্মণ কন্যা শরৎকুমারীর চরিত্র গ্রন্থকার সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। একদিকে কৃষ্ণমোহন যেরূপ তেজস্বী, স্বধর্ম্মরত, পরোপকারী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, সংযমী, অপর দিকে তাহার প্রিয় শিষ্য ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের যুবকত্রয় রামানন্দ, শঙ্করদেব ও সুখানন্দও সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ, সংযমী, স্বার্থত্যাগী, কর্ম্মী। ইহাদিগের পদানুসরণ করিবার জন্য গ্রন্থকার দেশের যুবকগণকে সকাতরে আহ্বান করিয়াছেন। বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা শরৎকুমারী, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সেই কথাগুলি বারবার আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে রামপদ বাবু এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া দেশ ও সমাজের বহু উপকার করিয়াছেন। বালক, যুবক

এবং তাঁহাদের অভিভাবকবর্গকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে আমরা বারবার অনুরোধ করিতেছি।

"আনন্দ বাজার" পত্রিকা ১৯শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার সন ১৩১৭ সাল।

হিন্দু সমাজের মুখপত্র সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গবাসী পত্রিকা কি লিখিয়াছেন দেখুন :—

জীবন সংগ্রাম। মানবচিত্র প্রণেতা শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট হইতে মণিলাল এণ্ড কোং জুয়েলার্স দ্বারা প্রকাশিত। মূল ১৷০ সিকা। আলোচ্য গ্রন্থখানি উপন্যাস।

বেশ তক্তকে ঝক্‌ঝকে বাঁধান। কাগজ ছাপা সুন্দর গ্রন্থ প্রণয়ের উদ্দেশ্য সাধু। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের উপসত্ব স্বর্গীয় পিতৃদেবের একটী স্মৃতি নিদর্শনের প্রতিষ্ঠার সংকল্পী। গ্রন্থ নানা চরিত্রে ও ভাষা ভাব বৈচিত্রে হৃদয় গ্রাহী। পড়িতে ২ অশ্রুজল সম্বরণ করা যায় না। ব্রাহ্মণ নায়ক কৃষ্ণমোহন চরিত্র অতি সুন্দর অতি মনোহর অথচ অতিরঞ্জিত নহে। নায়িকা ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণা বালবিধবা শরৎকুমারীর পতিভক্তি ম্যালেরিয়া বৎসরে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পীড়িত ও মুমূর্ষ ব্যক্তির সেবাব্রত, দেবতার আশ্রমের সেবাব্রত, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বিচার ইত্যাদি কাহিনী পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া পড়ে।

গ্রন্থকার শরৎ কুমারীর মুখ দিয়া বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হিন্দু সমাজের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। বিধবার বিবাহ যে শাস্ত্রমতে অসঙ্গত—এবং কেন তাহা বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পুস্তকখানি হিন্দুসমাজের অনেক কল্যাণ সাধন করিবে। আমরা গ্রন্থকারের দীর্ঘ জীবন লাভ প্রার্থনা করিতেছি।

সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকা কি লিখিয়াছেন দেখুন।

জীবন সংগ্রাম। শ্রীরামপদ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১।০ সিকা মাত্র। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বেঙ্গল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। আজকাল শিক্ষিত সমাজ বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও তদানীন্তন সামাজিক তথ্যানুসন্ধানে অবহিত হইয়াছেন। ইহা আশার বিষয়; আনন্দের বিষয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গ্রন্থকার রামপদ বাবু আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রাচীন বঙ্গের অবস্থা এবং তদানীন্তন বাঙ্গালীর সংসার ও সমাজ সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে একশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালীর সংসার, সমাজ, শিক্ষা দীক্ষা, সাধনা ও বল বীর্য্যের পরিচয় আছে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কৃষ্ণমোহনের চরিত্র আদর্শ স্থানীয়। বাঙ্গালী যে এক সময়ে মহা

বলবান ছিলেন। বাঙ্গালীর বাহুতে যে মত্ত হস্তীর বল ছিল, পাপীর দমনের জন্য নারীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য লম্পটের দণ্ড বিধানের জন্য যে সে হস্ত সদাই উত্থিত হইত গ্রন্থকার কৃষ্ণমোহনের চরিত্রে তাহার সম্যক পরিচয় দিয়াছেন। সন্ন্যাসী দয়ানন্দের শিক্ষায় সাধনা, আশ্রম-ধারী রামানন্দ ও সুখানন্দের পরোপকারিতা এবং নিরক্ষর অশিক্ষিত নীচজাতি রামতনু বাগ্দীর প্রভুভক্তির কথা পাঠ করিলে মনে হয়—এই পরিবর্ত্তন এক্ষণে কেন ঘটিয়াছে। সব আছে—কেবল বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব এক্ষণে ইউরোপীয় ভাবের নকল করিতে গিয়া এই শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। লেখকের লিখিবার ক্ষমতা অতি সুন্দর। ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ও ঘটনাবলী এই প্রকার সামঞ্জস্য করিয়া লিখিত যে পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। তাঁহার নায়িকা শরৎকুমারীর চরিত্র চিত্রণ অতি সুন্দর হইয়াছে। এই বিধবা বিবাহ আন্দোলিত বঙ্গ সমাজে শরৎকুমারীর ন্যায় কন্যার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। সংস্কারত্যাগিনী সাবিত্রী সতী ব্রহ্মচর্য্যাপরায়ণা আতুর ও দীনজনের জননী শরৎকুমারীর চরিত্রে পড়িতে পড়িতে মনে হয় কবে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই প্রকার দেবীর আবির্ভাব হইবে পুস্তক খানির আকার সুবৃহৎ ৪৪৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত; কাগজ ও ছাপা বাঁধাই অতি সুন্দর

"জীবন সংগ্রাম" সম্বন্ধে বঙ্গের একমাত্র বাঙ্গলা দৈনিক—"নায়ক" কি লিখিয়াছেন দেখুন—

"জীবন সংগ্রাম"।—শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও কলিকাতা ৪০নং গরাণহাটা ষ্ট্রীটস্থিত মণিলাল কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ সিকা মাত্র। "জীবন সংগ্রাম" উপন্যাসজাতীয়, উপন্যাস হইলেও ইহা ঠিক আধুনিক উপন্যাস নহে। এই পুস্তকে একশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বঙ্গসমাজ কিরূপ ছিল তাহার সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। পুস্তকে লিখিত ঘটনাবলী মনোরম ও চিত্তাকর্ষক পরন্তু শিক্ষাপ্রদ। ভাষা সরল ও আড়ম্বরশূন্য। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বড়ই তৃপ্ত হইয়াছি। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত। ১৪ই ভাদ্র, ১৩১৮ সাল।

স্কটিসচার্চ্চ কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল মিঃ এম, এম, বসু লিখিয়াছেন—

"আমি শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত জীবন-সংগ্রাম পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় ভক্ত ও ভাবুক, তিনি সে কালের বাংলার যে মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি

বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি নাই। এই দুর্দ্দশার দিনে গ্রন্থকার আমাদের সম্মুখে সেই পুরাতন মহান্ আদর্শ ধরিয়া বাস্তবিকই আমাদের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। আমি বঙ্গের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের প্রত্যেক নরনারীকেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

ভারতবিখ্যাত "জন্মভূমি" মাসিক পত্রিকা "জীবন সংগ্রাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"জীবন সংগ্রাম"।—শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১।০ সিকা।

শতাব্দ পূর্ব্বে বঙ্গদেশবাসীগণের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সংসার-পালন এবং সুখশান্তি রক্ষণ প্রভৃতি বিশেষগুণ পরিলক্ষিত হইত, গ্রন্থকার মহাশয় পুরাতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া কল্পনা মিশ্রনে তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ বিপ্রসন্তান কৃষ্ণমোহন এবং সাধক রামানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ চরিত্রে তাহা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। সংসারে সুখ দুঃখের সহিত কিরূপে সংগ্রাম করিতে হয়, পুস্তকের প্রধান প্রধান নায়কেরা প্রকৃষ্টরূপে তাহা দেখাইয়াছেন। "জীবন সংগ্রামে" সংসারের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া বহুদর্শী রামপদ বাবু বর্ত্তমান বঙ্গসন্তান-

গণকে "জীবন সংগ্রামের" উপদেশ দিয়াছেন। পুস্তক-খানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। পুরাতত্ত্বদর্শী উপযুক্ত পণ্ডিতের হস্তে এইরূপ দুই চারিখানি পুস্তক প্রস্তুত হইলে বর্ত্তমান বঙ্গের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। আমরা সকলকেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।—পৌষ, ১৩১৭ সাল।

হিন্দু সমাজের মুখপত্র—

আলোচনা।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী—

"জীবন-সংগ্রাম" সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন—

জীবন-সংগ্রাম। শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৷৹ সিকা মাত্র। রামপদ বাবু সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত, তৎপ্রণীত "মানব-চিত্র" পাঠে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য পুস্তকখানি ভাল কাগজে সুন্দর বাঁধাই, ১০০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গবাসীর খাঁটী চরিত্র ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে, লেখা বেশ সুন্দর, চরিত্র চিত্রনে গ্রন্থকার যে বিশেষ পারদর্শী, তাহা কৃষ্ণ-মোহনের চরিত্র পাঠ করিলে বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মাঘ, ১৩১৭।